দুই নায়ক

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

অনন্য প্রকাশন ৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭৩

মুখবন্ধ

বছর কয়েক আগে সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠির একটি বাক্য যেন নতুন করে ধাক্কা মারে—জওহরলাল নেহরু ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং আমাদের আদর্শের যত ক্ষতি করেছে আর কেউ তা করেনি।

রাজনৈতিক ইতিহাসের যে-কোন ছাত্রের মতোই জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে উৎসাহিত ছিলাম। অতঃপর আরও একটু বিশদভাবে অনুসন্ধান শুরু করি। এক দিন অগ্রজপ্রতিম অমিতাভ চৌধুরীর কাছে জানতে চাই, জওহর-সুভাষকে নিয়ে একটি বই লিখলে কেমন হয়? উনি খুবই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং অবিলম্বে কাজ শুরু করে দেওয়ার পরামর্শ দেন। কিছু দিন পরে প্রফুল্ল রায়ের কাছে কথাপ্রসঙ্গে বিষয়টির কথা তুললে তিনি যুগান্তর সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের প্রস্তাব করেন।

এই ভাবেই 'দুই নায়ক' শুরু। যুগান্তর সাময়িকীতে বেশ কিছুটাই প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ করা যায় নি। এই বইয়ে দুই নায়কের কাহিনীকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হল। বিষয়টি মোটেই সামান্য নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আরও নানা দিক থেকেই নিশ্চয় এই দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার করা সম্ভব। ভবিষ্যতে সুযোগ হলে এই লেখকও আরও কিছু পরিবর্ধন করতে পারে। অন্য কোন লেখকও হয়ত উৎসাহিত বোধ করতে পারেন।

যেহেতু দুটি মানুষের কাহিনী পাশাপাশি তুলে ধরবার চেষ্টা হয়েছে তাই তুলনাও স্বাভাবিকভাবে এসে গেছে। পক্ষপাতিত্ব থেকে যাওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে রচনাটিকে একপেশে না-করতে। নিছক সন-তারিখ-উদ্ধৃতির সমাবেশ না-করে কাহিনীর আকারে সাজাতে চেয়েছি দুই নায়কের সম্পর্কের ইতি[illegible]কে, কিন্তু কোথাও কল্পনার আশ্রয় নিই নি। নানা বইপত্র

ঘেঁটেই তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। তা না বললেও চলে। কিন্তু পাতায় পাতায় পাদটীকা দিয়ে পাঠকের অসুবিধা ঘটাতে চাই নি। শেষে দিয়েছি গ্রন্থপঞ্জী।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার লাইব্রেরি, নেতাজি রিসার্চ বুরো প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বই ও অন্যান্য নথির সাহায্য ছাড়া এই সামান্য রচনাটি লেখা হয়ে উঠত না। ব্যক্তিগতভাবে বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন জয়ব্রত মুখোপাধ্যায়, শংকর ঘোষ, বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রুফ দেখায় সহায়তা পেয়েছি তন্ময় শঙ্কর ভট্টাচার্যের। শ্যামল মিত্র ও বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জুগিয়েছেন দুষ্প্রাপ্য ছবি। সর্বদাই উৎসাহ জুগিয়েছেন সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায়। সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

প্রয়াত পিতৃদেব
পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
স্মরণে

জওহর ও সুভাষ ১৯৩৮

গান্ধীজি ও মৌলানা আজাদের সঙ্গে জওহর
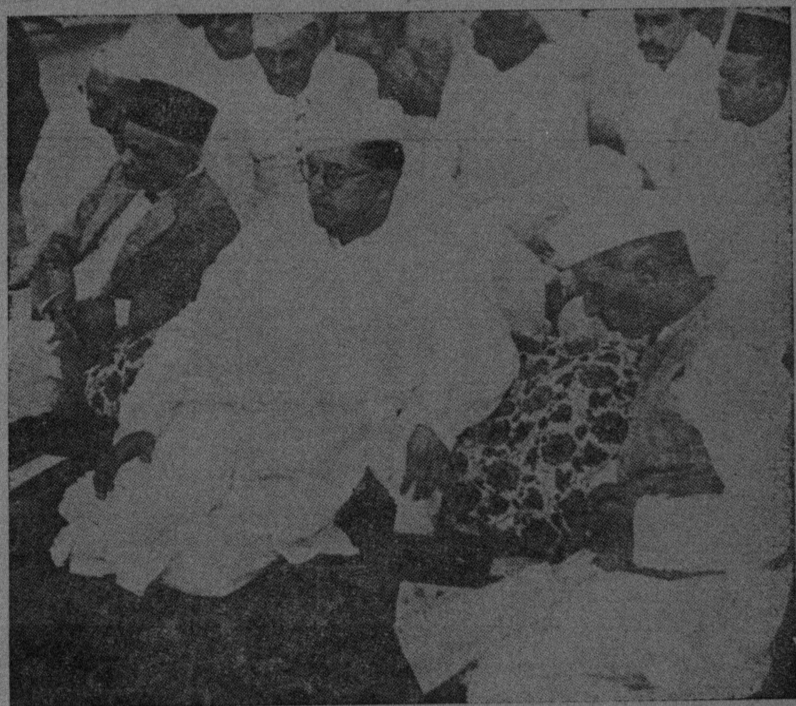
কংগ্রেস অধিবেশনে জওহর ও সুভাষ
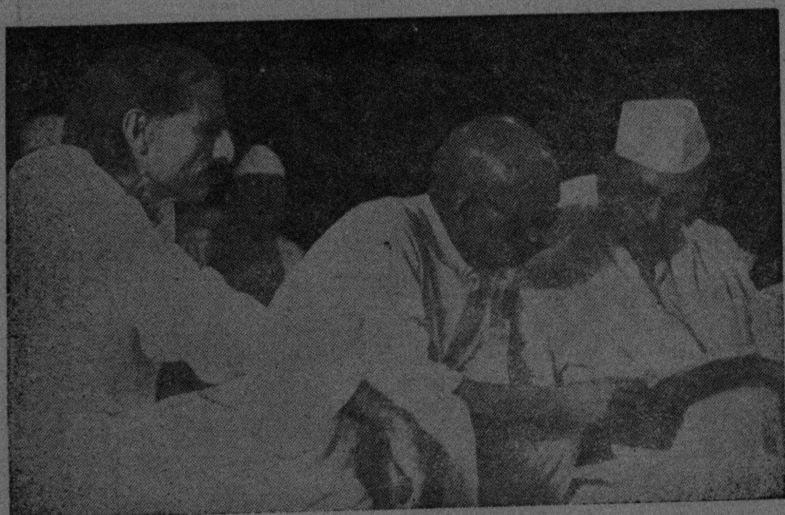
করাচি কংগ্রেসে আচার্য কৃপালনি, বল্লভভাই প্যাটেল ও সুভাষ ১৯৩০

সুভাষচন্দ্র. হরিপুরা ১৯৩৮

জওহর ও সুভাষ
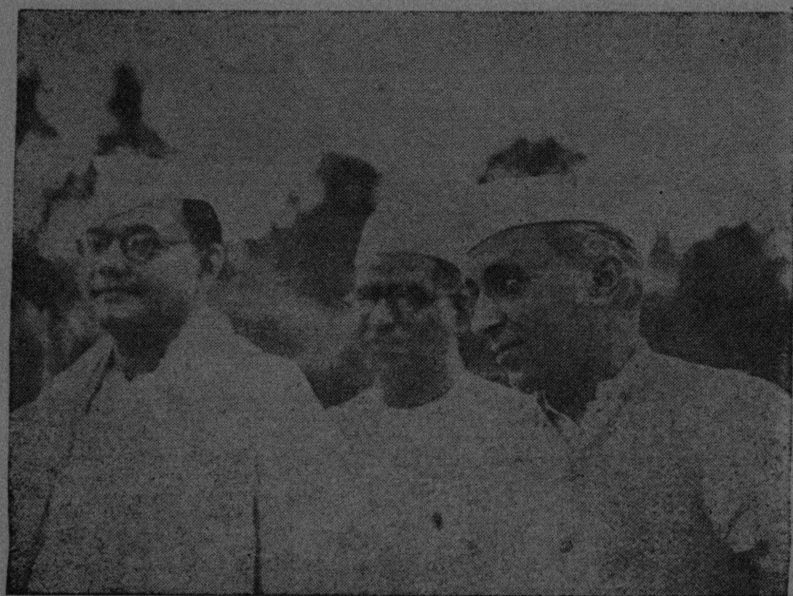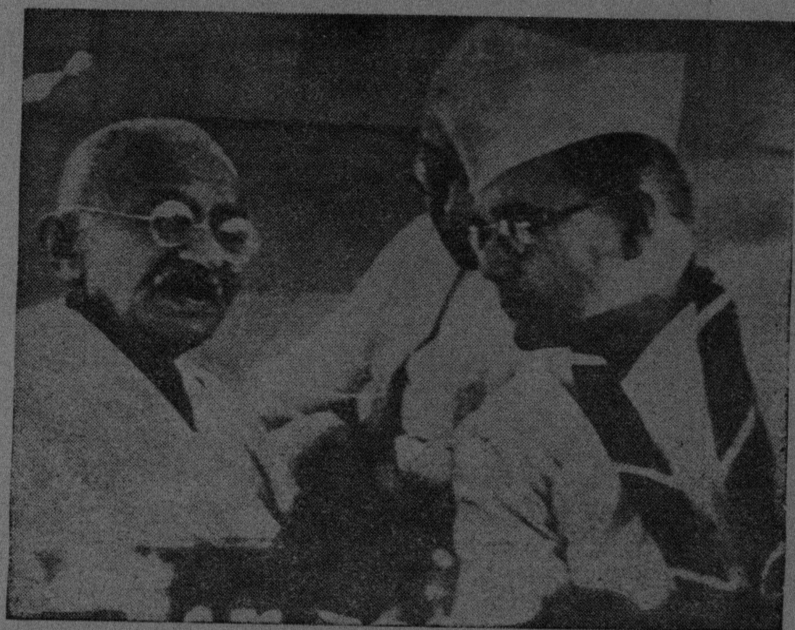
গান্ধিজী ও সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসে

এমিলি শেঙ্কলের সঙ্গে সুভাষ, কার্লসবার্ড ১৯৩৫

এক

বিমান সিঙ্গাপুরের মাটিতে নামল ঠিক দুপুর বেলায়। ছেচল্লিশ সালের ১৮ মার্চ। বিমান থেকে নামলেন জওহরলাল নেহরু। নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে জনতার জয়ধ্বনি। বহু ভারতীয় এসেছে জওহরলালকে সংবর্ধনা জানাতে।

আর এসেছেন ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি। তিনিই গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন জওহরলালকে। বিমানবন্দর থেকে গভর্মেণ্ট হাউস। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির সর্বাধিনায়ক। তিনি এসে পৌঁছেছেন ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা আগে। জওহরলালের সিঙ্গাপুর সফরের সব ব্যবস্থাও করেছেন তিনি। হোটেলে যাবেন জওহরলাল। যাওয়ার পথে স্ত্রী এড্‌উইনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন।

জওহরলাল এসেছিলেন বর্মা মালয় সিঙ্গাপুরে প্রবাসী ভারতীয় নাগরিক ও সেনাদের সঙ্গে পরিচিত হতে। একটা অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট ছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের নিহত সৈনিকদের স্মৃতিসৌধে মালা দেবেন জওহরলাল। তখনও এক বছরও হয় নি এই এলাকায় ভারতের মুক্তির জন্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে লড়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজ। প্রাণ দিয়েছে বহু মানুষ।

কিন্তু জওহরলাল শেষ পর্যন্ত গেলেন না সেই অনুষ্ঠানে। মাউণ্টব্যাটেন তাঁকে বললেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের স্মৃতি-সৌধে গিয়ে মালা দেওয়াটা এখন তোমার পক্ষে ভালো দেখাবে না। একই পরামর্শ দিলেন এড্‌উইনা। সেই পরামর্শই মেনে নিলেন জওহরলাল।

আগের বছর জুলাই মাসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল এই স্মৃতিসৌধের। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে গড়ে উঠেছিল স্মৃতিসৌধটি।

কিন্তু জাপানের আত্মসমর্পণের পর ইংরেজরা আবার দখল করল সিঙ্গাপুর। ভেঙে দেওয়া হল স্মৃতিসৌধ। ভাঙার আদেশ দিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন।

মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে স্মৃতিসৌধে মালা দিতে গেলেন না জওহরলাল। অথচ কয়েক মাস আগেই ভারতের মানুষ দেখেছিল এক আশ্চর্য দৃশ্য।

স্থান: দিল্লির লালকেল্লা। সেখানে শুরু হচ্ছে এক ঐতিহাসিক বিচার। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের বিচার। তাঁদের অপরাধ, ভারতের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, অর্থাৎ দেশদ্রোহ। তাঁদের পক্ষ সমর্থনে হাজির দেশের বাঘা বাঘা সব আইনজীবী। সার তেজবাহাদুর সপ্রু, ভুলাভাই দেশাই, হাইকোর্টের তিন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি—আর জওহরলাল নেহরু। অন্তত গত তিরিশ বছরের মধ্যে তিনি আর কখনও ব্যারিস্টারের গাউন পরেন নি।

এই কি সেই জওহরলাল যিনি কিছুদিন আগে বলেছিলেন, সুভাষ যদি জাপানি সেনাদের নিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে তবে তিনি নিজে গিয়ে বাধা দেবেন? পঁয়তাল্লিশ সালের সেপ্টেম্বরে, দীর্ঘদিন পরে, বোম্বাইয়ে যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসল তখন তিনিই কি সুভাষচন্দ্রকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'বিপথচালিত দেশপ্রেমী' বলে?

অথচ আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বগাথা যখন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল, উত্তাল হল জনমন তখন জওহরলাল বললেন: যে-কোন সময়েই আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের কঠোর সাজা দেওয়া অন্যায় হত। কিন্তু এখন ভারতে বড় রকমের পরিবর্তন আসন্ন, এই সময় তাঁদের প্রতি সাধারণ বিদ্রোহী হিসেবে আচরণ করলে বড় ভুল করা হবে, পরিণাম হবে সুদূরপ্রসারী। তাঁদের সাজা দিলে গোটা ভারত আর ভারতবাসীকেই সাজা দেওয়া হবে, লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে দারুণ আঘাত লাগবে।

আবার বললেন, লালকেল্লায় শাহনাওয়াজ খান, জি এস ধীলন

এবং প্রেম সায়গলের বিচার তো নিছক বিচার নয়, এ হল ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতীক। এ তো সেই ভারত বনাম ইংলণ্ডের পুরানো লড়াইয়ের নাটকীয় রূপ। এ তো ভারতের মানুষ আর যারা ভারত দখল করে আছে তাদের মধ্যে মানসিক শক্তির পরীক্ষা।

জওহরলাল নেহরুর এইসব পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা বা আচরণকে খুব সহজেই তাঁর সুপরিচিত হ্যামলেট-সুলভ দোলা-চলচিত্ততার নজির হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়। অথবা বলা যেতে পারে জওহরলালের বিভিন্ন মুডের প্রকাশ, তাঁর চারিত্রিক স্ববিরোধিতার উদাহরণ। কিন্তু অন্তত এক্ষেত্রে বোধহয় আমাদের আর একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা করতে হবে। দেখতে হবে, সুভাষচন্দ্র বসু আর জওহরলাল নেহরু—আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দুই অগ্রগণ্য নায়কের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতার মধ্যে এই রহস্যের সূত্র লুকিয়ে আছে কিনা। এই কথা আরও মনে হবার কারণ, জওহরলাল সম্পর্কেও সুভাষচন্দ্রের মনোভাব বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন ভাষায় ও ভঙ্গিতে।

জওহরলাল সেবার দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি। ১৯৩৬ সাল। সুভাষ নির্বাসিত অস্ট্রিয়ায়। বাডগাস্টাইন থেকে জওহরকে চিঠি লিখলেন সুভাষ : কংগ্রেসকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য একমাত্র তোমার দিকেই আমরা তাকিয়ে থাকি। সাধারণ মানুষের মনে তোমার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, এমন কি মহাত্মা গান্ধীও অন্য কারো সঙ্গে যতটা মানিয়ে নেবেন তোমার সঙ্গে মানিয়ে নেবেন তার চেয়েও বেশি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তোমার শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে বলে আমি আন্তরিকভাবে আশা করি। যদি ভারত সরকার আমাকে দেশে ফিরতে দেয় তবে আমার সব সাহায্য সর্বদাই তুমি পাবে।

কিন্তু জওহরলালের প্রগতিশীল চিন্তাধারা এবং বামপন্থা সম্পর্কে সব সময়েই কি নিঃসন্দেহ ছিলেন সুভাষ? অস্ট্রিয়া থেকে ঐ চিঠি লেখার বছর দেড়েক আগেই লিখেছেন তাঁর প্রথম বই 'দ ইণ্ডিয়ান

স্লোগান্'। সেখানে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের কথা বলতে গিয়ে সুভাষ লেখেন: পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অবস্থা কিছুটা বিচিত্র। মতাদর্শের দিক থেকে তিনি র‍্যাডিক্যাল। নিজেকে তিনি বলেন পুরোদস্তুর সমাজবাদী, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর অনুগত অনুচর। বোধ হয় একথা বলাই ঠিক যে, তাঁর মস্তিষ্কটি রয়েছে বামপন্থীদের সঙ্গে আর হৃদয়টি তিনি দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধীকে।

এক দিন বন্ধু দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল সুভাষের। আলোচনার বিষয়: জওহরলাল। সুভাষ বললেন, যে মানুষ জওহরলালের মতো খ্যাতি অর্জন করেছে সে খুব সাধারণ ধাতে গড়া নয়। এ বিষয়ে কোন ভুল নেই। এ বিষয়ে কারোরই সন্দেহ নেই যে তাঁর মতো ধীশক্তি, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, লেখার ক্ষমতা বিরল।...তবে মহাত্মার প্রতি তাঁর এই অন্ধ আনুগত্যের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি না। আমাকে যতটা বোকা মনে হয় আমি ততটা বোকা নই। তবে একজন বোকাও বুঝতে পারে যে সে (জওহরলাল) তার বুদ্ধি দিয়ে পুজো করে মস্কোর, আর হৃদয় থেকে ভক্তি করে মহাত্মাকে।...দেখ দিলীপ, যদি তুমি লোককে নেতৃত্ব দিতে চাও (স্বাধীনতা আন্দোলনে) তা হলে একই সঙ্গে তুমি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা আর অহিংসার ভজনা করতে পারো না। একটা বিষয়ের উপর আমি জোর দিতে চাই: নেহরু যদি সত্যিই রাজনীতির মধ্য দিয়ে ভারতের সেবা করতে চায় তবে তার নিজের ভিতটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে, কারণ যদি পায়ের তলায় শক্ত মাটি খুঁজে না নেয় তা হলে ভবিষ্যতে সেটা পিছল হয়ে পড়বে, ও আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

এই আলোচনার সময় সম্ভবত ১৯৩৭-৩৮ সাল। কিছু পরেই রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন সুভাষ। আর প্রথমবার এই গৌরবমণ্ডিত আসনে বসেই তিনি নিযুক্ত করলেন জাতীয় যোজনা কমিটি। উদ্দেশ্য, সমাজবাদী পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নয়নের নকশা তৈরি করা। সেই কমিটির নেতৃত্বে বসালেন আর কাউকে নয়, স্বয়ং জওহরলাল নেহরুকে।

কিন্তু কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের পরই এল ত্রিপুরী অধিবেশন। তার কিছুদিন পরে সুভাষ লিখছেন ভাইপো অমিয়নাথ বসুকে:

ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং আমাদের সংগ্রামের আর কেউই এতটা ক্ষতি করেনি যতটা করেছে জওহরলাল নেহরু।

অথচ দেশ ছেড়ে গিয়ে বিদেশের মাটিতে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়লেন সুভাষ তখন একটি ব্রিগেডের নাম রাখলেন নেহরু ব্রিগেড। এই কি সেই জওহরলাল যাঁর সম্পর্কে সুভাষ মাত্র কিছুদিন আগে বলেছেন: কিছুদিন ধরে দেখছি আমার সম্পর্কে তোমার প্রচণ্ড বিরাগ জন্মেছে। এই কথা বলছি কারণ দেখছি আমার বিরুদ্ধে যত কিছু কথা তা তুমি সাগ্রহে লুফে নাও; আমার স্বপক্ষে যা কিছু যায় সে দিকে তাকাও না। রাজনৈতিক দিক থেকে যারা আমার বিরোধী তারা যা বলে তা তুমি মেনে নাও। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যা বলার আছে সে ব্যাপারে তুমি চোখ বুঝে থাকো।

ক্ষোভ আর অভিমানে ভরা দীর্ঘ চিঠি লেখার সময়েও সুভাষ লিখলেন: আমি তোমাকে রাজনৈতিক দিক থেকে বরাবরই বড় ভাইয়ের মতো দেখে এসেছি। উত্তরে লিখলেন জওহর: তুমি যা কর তা যে সব সময় আমি পছন্দ করি তা নয়, তবে বরাবরই ব্যক্তিগত-ভাবে আমি তোমাকে স্নেহ করেছি, শ্রদ্ধা করেছি।

জওহরলাল নেহরু আর সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে এই যে সম্পর্ক একে কি আমরা মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলব একই সঙ্গে অনুরাগ-বিরাগের সম্পর্ক? জওহরলালের এক জীবনীকার মাইকেল ব্রেশার এই সম্পর্কের রহস্য উদ্ধারে সচেষ্ট হয়ে আভাস দিয়েছেন ঈর্ষার। কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য দুই নেতার মধ্যে কি ছিল অঘোষিত কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা? মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা কি প্রভাবিত করেছিল কোনভাবে এই সম্পর্ককে? নাকি দিলীপকুমার রায় যাকে বলেছেন দু'টি মানুষের মানসিক গড়নের অন্তর্নিহিত অমিল, তাই দায়ী এর জন্য?

এই সব প্রশ্নের উত্তর যাই হোক, এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দুই নায়ক শেষ পর্যন্ত পথ চলতে পারেননি এক সঙ্গে। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁদের আবির্ভাব প্রায় একই সময়ে। বিশ আর তিরিশের দশকে জওহরলাল আর সুভাষচন্দ্রই ছিলেন জ্বলন্ত আদর্শবাদ দেশপ্রেম বামপন্থা ও তারুণের প্রতীক—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পরে তাঁরাই ছিলেন জনগণের নয়নের মণি।

জওহর আর সুভাষের পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। পাশ্চাত্ত্য ধারার শিক্ষা পেয়েছিলেন দু'জনেই। এক জন ব্যারিস্টার, একজন আই সি এস। দু'জনেরই প্রথম কারাবরণ অসহযোগ অন্দোলনে। পাশাপাশি চলতে শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু থাকতে পারেননি পাশাপাশি।

১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। ভারত সরকারের একটি গোপন সার্কুলারে দেখা গেল একই সঙ্গে উঠেছে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নাম। ঐ সার্কুলারে প্রকাশ পেল ব্রিটিশ সরকারের উদ্বেগ। তারা উদ্বিগ্ন এই কারণে যে, তাদের ধারণা "ভবিষ্যতে কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণ করবেন তরুণ নেতারা—বিশেষত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও বাবু সুভাষচন্দ্র বসু।"

অন্তত গত বছর দুয়েকের ঘটনাবলী নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সরকারের মনে এই ধারণা গড়ে তুলেছিল।

দুই

লখনউয়ে বসেছে সর্বদল সম্মেলন। ১৯২৮ সালের আগস্ট মাস। সকলেরই নজর তখন এই সম্মেলনের দিকে। কিন্তু সেখানে দেখা দিল রীতিমতো মতবিরোধ। সম্মেলন বুঝি ভেঙে যায়। কিন্তু তা তো হতে দেওয়া যায় না। তাই এগিয়ে এলেন জওহরলাল নেহরু আর সুভাষচন্দ্র বসু।

গোপন বৈঠকে বসলেন কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা বামপন্থী বলে পরিচিত তাঁরা। জওহর আর সুভাষই তাঁদের মধ্যমণি। তাঁরা বললেন, সম্মেলন বানচাল হতে দেওয়া উচিত হবে না। আমাদের যা প্রতিবাদ তা আমরা জানাব, তার বেশি কিছু করব না। তবে সেই সঙ্গে আমাদের নিজস্ব মতবাদ প্রচারের জন্য গড়ে তুলব পৃথক সংগঠন।

বামপন্থীরা মেনে নিলেন এই দুই নায়কের যুক্তি। ডোমিনিয়ন স্টেটাস বনাম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে তরুণ বামপন্থী গোষ্ঠীর মত কী, তা সম্মেলনে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন জওহর ও সুভাষ। তারপর দু'জনে মিলে গড়ে তুললেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেস লিগ।

আগের বছর মাদ্রাজে বসেছিল জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। ৪২ বছর বয়সের এই সংগঠনের গায়ে যেন লাগতে শুরু করেছিল নতুন হাওয়া। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর থেকে ঝিমিয়ে পড়েছিল সব কিছু। গান্ধীজি গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নেই, মোতিলাল নেহরু বিদেশে। কিন্তু দেশের যুবজনচিত্ত ক্রমশ অধীর হয়ে উঠছে। তারা চাইছে নতুন আন্দোলন, খুঁজছে নতুন পথ। একের পর এক প্রদেশ কংগ্রেস সম্মেলনে দাবি উঠছে, ডোমিনিয়ন স্টেটাস নয়, চাই পূর্ণ স্বাধীনতা।

মাদ্রাজ কংগ্রেসে এসে লাগল নতুন চেতনার ঢেউ। জওহরলাল সবে ফিরেছেন ইউরোপ থেকে। তাঁর এই দ্বিতীয়বার ইউরোপ যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অসুস্থ স্ত্রী কমলার স্বাস্থ্য উদ্ধার। কিন্তু এই সফরের সময় জওহরের মানসিক জগতেও ঘটেছিল বড় রকমের রদবদল।

তিনি নিজেও কিছুদিন ধরে চাইছিলেন দেশের বাইরে যেতে। ভাবছিলেন, বাইরে থেকে গিয়ে দেশের দিকে তাকালে বোধ হয় সমস্যাগুলি বুঝতে পারবেন ভালো করে, স্বচ্ছ হবে দৃষ্টিভঙ্গি। দেশের মধ্যে উৎসাহজনক কিছু চোখে পড়ছিল না। সুইজারল্যাণ্ডে পৌঁছে প্রথম প্রথম অবশ্য কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন দেশের ঘটনাবলী থেকে। কিন্তু ক্রমে সেখানে পরিচিত হতে লাগলেন প্রবাসী

বিপ্লবীদের সঙ্গে। শ্যামাজি কৃষ্ণবর্মা, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৭ সালের গোড়ায় ব্রাসেলসে বসল কংগ্রেস অব অপ্রেস্ড্ ন্যাশনালিটিজ। জওহর তাতে যোগ দিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে। যুক্ত হলেন লিগ এগেইনস্ট ইম্পিরিয়ালিজমের সঙ্গে।

জওহরের মনে হল যেন নতুন করে চোখ খুলছে তাঁর। পরাধীন, নির্যাতিত দেশের সমস্যা যেন বুঝতে পারছেন নতুন করে। কম্যুনিজম সম্পর্কে জাগছে নতুন আগ্রহ। সোভিয়েত রাশিয়ায় ঘটছিল বিশাল পরিবর্তন। সে সম্পর্কেও উদাসীন ছিলেন না জওহর। আর এর পরেই ঘটল এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালে মোতিলাল নেহরু এলেন ইউরোপে। পিতা-পুত্র কয়েক মাস একত্রে কাটালেন নানা দেশে। তারপর নবেম্বরে সকলে মিলে গেলেন মস্কোয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে তখন চলছে নবেম্বর বিপ্লবের দশম বর্ষপূর্তি উৎসব। সেই উৎসবে যোগ দিতে আমন্ত্রিত হলেন মোতিলাল আর জওহর। পিতার যে খুব একটা আগ্রহ ছিল তা নয়। কম্যুনিস্ট শাসন সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ছিল সীমিত। তা ছাড়া ছিল দেশে ফেরার তাড়াও। কিন্তু ছোট বোন কৃষ্ণার স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানতে পারি, মস্কো যেতে কত আগ্রহী ছিলেন জওহর। তাই আরও অনেক বারের মতো পুত্রের ইচ্ছার কাছে হার মানতে হল পিতাকে। তাই সকলে মিলে গেলেন মস্কো—মোতিলাল, জওহর, কমলা আর কৃষ্ণা। বার্লিন থেকে ট্রেনে চেপে পোলাণ্ডের মধ্যে দিয়ে রাশিয়া। ক্রেমলিনের অতিথি হয়ে এসেছেন তাঁরা। যোগ্য সমাদরই পেলেন।

ছিলেন মাত্র চার দিন। তাও প্রধানত মস্কোয়। কিন্তু এই ক' দিনেও যা দেখলেন, যা শুনলেন তাতে অভিভূত হলেন আটত্রিশ বছরের জওহরলাল। গড়ে উঠল নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। সেই বয়সে এক পরাধীন দেশের প্রতিনিধি হয়ে সোভিয়েতের নবীন সমাজের মুখোমুখি হয়ে ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হওয়া মোটেই

অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু সবটুকুই নিছক ভাবাবেগ ছিল না নিশ্চয়ই। সবচেয়ে জওহরকে যা আকৃষ্ট করল তা হল মানুষে মানুষে ভেদের সীমারেখা মুছে যাওয়া। চরম বিলাসিতার পাশে চরম দারিদ্র্য নেই, নেই শ্রেণী বা জাতের ভেদ।

ইউরোপ থেকে ফিরলেন এক নতুন জওহরলাল। শরীর তো তাজাই, তার চেয়ে বেশি তাজা মন। চোখ খুলে গেছে নতুন করে। বুঝতে পারছেন, যতই হোক নিছক জাতীয়তাবাদ আদর্শ হিসেবে সংকীর্ণ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা, সমাজ আর রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক কাঠামো ছাড়া দেশ বা মানুষের যথার্থ বিকাশ সম্ভব নয়।

মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনের মুখে দেশে ফিরলেন এই নতুন জওহরলাল। স্বভাবতই খুশি যুব-তরুণের দল, খুশি কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠী, খুশি সুভাষচন্দ্র বসু। এই নতুন জওহরলালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগদানকে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছেন সুভাষ। তিনি লিখেছেন: দেশে ফিরে এসে এক নতুন আদর্শবাদের কথা বলতে লাগলেন জওহর, নিজেকে ঘোষণা করলেন সমাজতন্ত্রী হিসেবে। কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠী, দেশের যুব সংগঠন স্বাগত জানাল এই ঘটনাকে। জওহরলালের রাজনৈতিক জীবনের নতুন অধ্যায়ের প্রথম প্রকাশ ঘটল কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে।

কংগ্রেসের ইতিহাসে মাদ্রাজ অধিবেশন দিকচিহ্ন অনেক কারণে। কিছুদিন আগেই গঠিত হয়েছে সাইমন কমিশন। উদ্দেশ্য: ভারতের জন্য নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি। কিন্তু খুশি হয়নি দেশের মানুষ। সব দাবি উপেক্ষা করে জন সাইমনের নেতৃত্বে শুধু ইংরেজদের নিয়ে ইংরেজ সরকার তৈরি করেছে এই কমিশন। তাই মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত হল দেশবাসীর নতুন সংকল্প: সব রকমে বর্জন করো সাইমন কমিশন।

সেই সঙ্গে গৃহীত হল আর এক প্রস্তাব। দেশের সব দলের

কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা করতে হবে আর তার জন্য বসবে সর্বদল সম্মেলন। (এই সম্মেলন প্রথম বসেছিল দিল্লিতে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন নিয়ে দেখা দিল গুরুতর মতবিরোধ।' তখন গান্ধীজি বললেন, সম্মেলন ব্যর্থ হতে দিয়ে তো লাভ নেই, তার চেয়ে একটা ছোট কমিটি গঠন করা হোক। তাই হল। কমিটির সভাপতি হলেন মোতিলাল। অন্যতম সদস্য সুভাষচন্দ্র।)

কিন্তু মাদ্রাজ কংগ্রেসে ঘটল আরও তাৎপর্যপূর্ণ দুটি ঘটনা। দলের মধ্যে বামপন্থী গোষ্ঠীর শক্তিসামর্থ্য যে বাড়ছে তা স্বীকৃত হল। সেবার কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ এম এ আনসারি। তাঁর ওয়ার্কিং কমিটিতে ঠাঁই পেলেন বামপন্থীদের প্রতিনিধিরা। সাধারণ সম্পাদক হলেন জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র এবং সাহিব কুরেশি।

পূর্ণ স্বাধীনতার যে দাবি ক্রমশ দেশে জোরালো হয়ে উঠেছিল তারও অনিবার্য প্রতিফলন দেখা গেল মাদ্রাজে। প্রস্তাব আনলেন জওহরলাল।

প্রস্তাবে বলা হল: কংগ্রেস ঘোষণা করছে ভারতের জনগণের লক্ষ্য হল পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা। প্রস্তাবটি যখন গৃহীত হল তখন জওহর নিজেও যেন কিছুটা অবাক হলেন। শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের মতো নেত্রীও সমর্থন করলেন সেই প্রস্তাব।

কিন্তু যে-মানুষটির মতের দাম সবচেয়ে বেশি সেই গান্ধীজি কী ভাবছেন এই প্রস্তাব সম্পর্কে? সরকারিভাবে কংগ্রেসের ঘোষিত লক্ষ্য অবশ্যই 'স্বরাজ'। কিন্তু সেই স্বরাজের চেহারা কী হবে তা নিয়ে মতবিরোধ চলছিল কয়েক বছর ধরেই। ভারত কি হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই একটি ডোমিনিয়ন, অথবা ব্রিটেনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র? পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা করে প্রস্তাব আনার চেষ্টা আগের কয়েকটি কংগ্রেস অধিবেশনেও হয়েছিল, কিন্তু গান্ধীজির সমর্থন পান কি উদ্যোক্তারা।

মাদ্রাজেও গান্ধীজি উপস্থিত, কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনেও

তিনি যোগ দিয়েছেন। কিন্তু নীতি নির্ধারণে কোন ভূমিকা তিনি নেন নি। জওহরের অনুমান করতে ভুল হয় নি যে, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি গান্ধীজির মনঃপূত হয় নি। কিন্তু গান্ধীজি এতটা ক্ষুব্ধ হবেন তা বোধ হয় জওহরও বুঝতে পারেন নি।

ক্ষোভ ঢেকে রাখতে চেষ্টাও করলেন না গান্ধীজি। বললেন: যখন জানাই আছে যে এই ধরনের প্রস্তাব কার্যকর করার ক্ষমতা নেই তখন বছরের পর বছর তা বারবার উত্থাপন করে লাভ কী? এইসব প্রস্তাব গ্রহণ করে আমরা শুধু আমাদের বীর্যহীনতারই প্রমাণ দিই। আমরা প্রায় নেমে যাচ্ছি স্কুলের ছাত্রদের বিতর্ক সভার স্তরে।

সবরমতীতে ফিরে গিয়েই চিঠি লিখলেন জওহরকে (৪ জানুয়ারি ১৯২৮):

তুমি বড় দ্রুত এগোচ্ছ। তোমার উচিত ছিল ভাববার আরও একটু সময় নেওয়া, পরিবেশের সঙ্গে আর একটু খাপ খাইয়ে নেওয়া। তুমি যে সব প্রস্তাব রচনা করেছ এবং যেগুলি গৃহীত হয়েছে তার অধিকাংশই এক বছর পিছিয়ে দেওয়া যেত। আমি তোমার এই সব কাজে ততটা ভাবিত নই, আমি ভাবিত হচ্ছি তুমি গুণ্ডা-বদমায়েসদের উৎসাহ দিচ্ছ দেখে। নির্ভেজাল অহিংসায় তুমি এখনও বিশ্বাস কর কিনা আমি জানি না। কিন্তু তোমার যদি মত বদল হয়েও থাকে তবু নিশ্চয়ই একথা মনে করতে পার না যে বলগাহীন হিংসার মধ্যে দিয়ে দেশের মুক্তি আসবে।

আবার ক' দিন বাদেই লিখলেন গান্ধীজি: তোমার সঙ্গে আমার মতপার্থক্য এতই বিরাট যে আর কোন মিলনের আশা আছে বলে মনে হয় না। তোমার মতো একজন সাহসী বিশ্বস্ত দক্ষ ও সৎ সহকর্মীকে হারাবার যে দুঃখ তা আমি তোমার কাছ থেকে গোপন করতে চাই না। কিন্তু আদর্শের জন্য লড়তে গেলে বন্ধুত্বকে অনেক সময়ই বিসর্জন দিতে হয়।

গান্ধীজির এই ধরনের কথা থেকে মনে হয় যেন তার প্রিয় শিষ্যের

সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের বিরোধ যে এই প্রথম বা শেষ তাও নয়। কিন্তু আমরা বারবারই দেখতে পাই যে তাঁদের সম্পর্কে গুরুতর টান পড়লেও শেষ পর্যন্ত তাতে সত্যিই ভাঙন ধরে নি। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে আমরা দেখতে পাব যে এইখানেই গান্ধী-জওহর সম্পর্কের সঙ্গে গান্ধী-সুভাষ সম্পর্কের পার্থক্য। এই পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের প্রশ্নেই আবার মতবিরোধ ঘনিয়ে উঠতে দেখা যাবে মাদ্রাজ কংগ্রেসের পর কলকাতা কংগ্রেসে। সেখানে অবশ্য প্রধান ভূমিকা সুভাষচন্দ্রের, তার পাশে আছেন জওহরলাল।

কিন্তু তার আগে দেখা যাক কী হল সর্বদল সম্মেলনে।

মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে যে কমিটি গড়া হল তার কাজ মোটেই সহজ ছিল না। এক দিকে ছিল নানা ধর্ম নানা সম্প্রদায়ের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের সমস্যা। অন্যদিকে সেই ডোমিনিয়ন স্টেটাস বনাম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্ন। এই শেষের প্রশ্নটিতে সব সদস্য একমত হতে পারলেন না। ডোমিনিয়ন স্টেটাসের সুপারিশ যাঁরা মানতে অপারগ তাঁদের অন্যতম সুভাষ। সে-কথা নেহরু কমিটির রিপোর্টের মুখবন্ধেই বলে দেওয়া হল। জওহরলাল এই কমিটির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি তখন কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পুরোপুরি নির্লিপ্ত থাকবেন কী করে? তাছাড়া ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রস্তাবের বিরোধিতায় তিনি সর্বদাই সরব।

এখানে জওহরের সামনে দেখা দিল এক সংকট। তাঁর পিতা কমিটির সভাপতি। ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রস্তাবের তিনি ঘোরতর সমর্থক। পিতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই যাবেন তাঁর একমাত্র পুত্র? কিন্তু এই প্রশ্ন যদি জওহরের মনে দেখা দিয়েও থাকে তবু তা শেষ পর্যন্ত দমিয়ে রাখতে পারে নি তাঁকে। সর্বদল সম্মেলনে তিনি খোলাখুলিই ঘোষণা করলেন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন। বললেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এক অংশ শোষণ

করে আর এক অংশকে। ডোমিনিয়ন হওয়ার অর্থ বড় জোর শোষিত থেকে শোষকের স্তরে উন্নীত হওয়া। ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নই ওঠে না।

তবু যে জওহর ও সুভাষ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির প্রশ্নে সর্বদল সম্মেলন বানচাল হতে দিলেন না তার কারণ নেহরু কমিটি বহু বিতর্কিত সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে মোটের উপর একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে পেরেছিল। সেদিনের অবস্থায় এই সাফল্য ছিল রীতিমতো উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কিন্তু এই সর্বদল সম্মেলন নিয়ে দেখা দিল আর এক সংকট।

এই সম্মেলন যে সংবিধান রচনার সুপারিশ করল তাতে যুক্ত হল এমন একটি ধারা যাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন জওহর। অযোধ্যার তালুকদারদের কায়েমি স্বার্থ মেনে নেওয়া হল ঐ ধারায়। প্রস্তাবিত সংবিধানের ভিত্তি অবশ্যই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানা। সেই মালিকানা উচ্ছেদের কোন প্রস্তাবও ছিল না। তবু আধা-সামন্ততান্ত্রিক কিছু অধিকারকে একেবারে সংবিধানের মধ্যেই স্বীকৃতি দেওয়াটা খুবই বাড়াবাড়ি মনে হল জওহরের। এ-কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর ও তাঁর মতো আরও অনেকের কাছে যে কংগ্রেস নেতৃত্ব বেশি করে ঝুঁকছে জমিদার-জোতদারের দিকে।

এ অবস্থায় তিনি কেমন করে থাকতে পারেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে? তিনি ইস্তফা দিলেন। কারণ হিসেবে বললেন, তিনি ইণ্ডিপিণ্ডেন্স ফর ইণ্ডিয়া লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, তাই কংগ্রেসেব সাধারণ সম্পাদক পদে থাকা তাঁর শোভা পায় না।

শুধু জওহর নয়, ইস্তফা দিলেন সুভাষও একই কারণে।

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব এই দুই তরুণ নেতাকে ছাড়তে রাজি হল না। ওয়ার্কিং কমিটির তরফ থেকে বলা হল, জওহর আর সুভাষের ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ফর ইণ্ডিয়া লিগের কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার কোন বাধা নেই, ঐ কাজের সঙ্গে কংগ্রেসের নীতির তো কোন সংঘর্ষ ঘটছে না। মাদ্রাজে কংগ্রেসও তো ঘোষণা করেছে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য।

ইস্তফা দেওয়া হল না। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে জওহর-সুভাষের দ্বন্দ্ব যে এত সহজেই মেটবার নয় তা স্পষ্ট হয়ে উঠল আর কয়েক মাস পরেই।

তিন

দেশের নানা প্রান্তে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগের শাখা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র। উদ্দেশ্য: পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে জোরদার করে তোলা। ১৯২৮ সালের নবেম্বরে দিল্লিতে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল লিগের। কংগ্রেসের সক্রিয় বিরোধিতার জন্য এই লিগ গড়ে তোলেননি জওহর ও সুভাষ। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই দলের নীতিকে প্রভাবিত করতে চাইছিলেন তাঁরা। পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের পাশাপাশি আরও একটি মতবাদকে জনপ্রিয় করে তুলতে চাইছিল লিগ। এই সংগঠনের উত্তরপ্রদেশ শাখার খসড়া কর্মসূচীতে স্পষ্ট ভাষাতেই বলা হল:

সমাজবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলাই লিগের লক্ষ্য, লিগ চায় উৎপাদন ও বণ্টনের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ।

১৯২৮ সালের ২ অক্টোবর লিগের বাংলা শাখার তরফে সুভাষচন্দ্র যে ইশতেহার প্রকাশ করেন তাতেও বলা হয় এই ধরনের কথা। ঘোষিত মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত হয়: অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা, সম্পত্তির সমবণ্টন, সকলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। আরও বলা হয়: মূল শিল্পগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে।

সংগঠন হিসেবে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগ তেমন একটা দানা বাঁধতে পারেনি। সংগঠনের সর্বভারতীয় পরিষদের সাধারণ সচিব ছিলেন জওহরলাল। তিনিই স্বীকার করেছেন সে-কথা। ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস ঘোষণা করল পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য,

ফলে স্বভাবতই লিগের প্রয়োজনও ফুরিয়ে এল।

কিন্তু এই স্বল্পায়ু সংগঠনটি যে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল ব্রিটিশ সরকারকে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গোয়েন্দা বুরোর প্রধান ছিলেন ডেভিড পেট্রি। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে গোপন রিপোর্ট দেন তাতেই ধরা পড়ে এই উদ্বেগের চিহ্ন। তিনি লেখেন: ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগ পূর্ণ স্বাধীনতার যে লক্ষ্য প্রচার করছে তাতে তরুণ সমাজ রীতিমতো প্রভাবিত হচ্ছে, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের প্রবক্তারা তাদের কাছে আর পাত্তা পাচ্ছে না।

তরুণ আর যুব সমাজের মধ্যে যে নতুন চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছিল বিশের দশকের শেষের দিকে তা অনুভব করতে পারছিলেন জওহর ও সুভাষ দু'জনেই। আত্মচরিতে তাই দু'জনেই লিখেছেন সেই কথা, প্রায় একই ভাষায়। দিকে দিকে গড়ে উঠছিল যুব সংগঠন। চরিত্রের দিক দিয়ে সেই সব সংগঠন ছিল নানা ধরনের। কিন্তু তারা সকলেই চাইছিল সমাজের আমূল পরিবর্তন।

ছাত্র আন্দোলনও জোরদার হচ্ছিল। সাইমন কমিশন বয়কটের আন্দোলন এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিল খুব বেশি। আর ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলায় প্রথম সারির যে দু'জন নেতা উৎসাহ দিতে এগিয়ে এলেন তাঁরা হলেন জওহরলাল আর সুভাষচন্দ্র। দেশের নানা প্রান্তে ছাত্র-যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছেন, ভাষণ দিচ্ছেন জওহর ও সুভাষ। আঠাশ সালের আগস্টে কলকাতায় সারা বাংলা ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি জওহর। এদিকে সারা ভারত যুব কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুভাষ। সর্বত্রই তাঁরা বলতে লাগলেন পূর্ণ স্বাধীনতার কথা, সমাজতন্ত্রের কথা, নতুন কর্মোদ্যোগের প্রয়োজনের কথা। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে সুভাষ তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন সবরমতী আর পণ্ডিচেরি আশ্রমের চিন্তাধারাকে। তাঁর বক্তব্য: এই দুই আশ্রমের চিন্তাধারা তরুণ সমাজকে করে তুলছে কর্মবিমুখ, আন্দোলনবিমুখ।

নতুন চেতনা যে শুধু তরুণদের মধ্যেই দেখা দিচ্ছিল তা নয়।

শ্রমিক মহলেও আসছিল জাগরণ। জওহর আর সুভাষ দু'জনেই অগ্রণী ভূমিকা নিলেন এই জাগরণে। অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল কয়েক বছর আগেই। কিন্তু এই সংগঠনের চেহারা ক্রমশ জঙ্গি হয়ে উঠছিল। বোম্বাইয়ের গিরনি কামগার ইউনিয়ন এবং জি আই পি রেলওয়ে ইউনিয়ন তখনই বেশ শক্তিশালী। হরতাল-ধর্মঘটের সংখ্যা বাড়তে লাগল। খড়গপুরে রেল কর্মীদের ধর্মঘট, বোম্বাইয়ে সুতো কল শ্রমিক ধর্মঘট, জামশেদপুরে টাটা স্টিলে ধর্মঘট। টাটার এই ধর্মঘটেই শ্রমিক আন্দোলনে সুভাষের হাতে-খড়ি। ধর্মঘট যখন প্রায় ভেঙে যাচ্ছিল তখন শ্রমিকদের কাছ থেকে অনুরোধ এল সুভাষের কাছে—আপনি আমাদের নেতৃত্ব দিন। সুভাষ রাজি হলেন। ধর্মঘট আবার জোর কদমে চলতে লাগল। শেষে হল সম্মানজনক মীমাংসা। সেটা আঠাশ সালের কথা। ঐ বছরেই ঝরিয়ায় বসল এ আই টি ইউ সির সম্মেলন। তাতে যোগ দিলেন জওহরলাল। নির্বাচিত হলেন পরবর্তী সভাপতি। সুভাষ এই সম্মান পান আরও তিন বছর পরে।

ঝরিয়া থেকে জওহর এলেন কলকাতায়। কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে। উঠলেন বসু-বাড়িতে। এলগিন রোডের কাছেই উডবার্ণ পার্কে নতুন বাড়ি করেছেন শরৎচন্দ্র বসু। সেখানেই উঠলেন জওহরলাল।

কলকাতা অধিবেশনে সভাপতি কে হবেন, তা নিয়ে কিছুদিন ধরে চলছিল আলাপ-আলোচনা। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতার পদের জন্য জওহরের নাম উঠেছিল মাদ্রাজ অধিবেশনের সময়েই। গান্ধীজিও প্রস্তাবটি বিবেচনা করেছিলেন (জওহরলাল নেহরুকে লিখিত পত্র, ২৫ মে ১৯২৭)। কলকাতা অধিবেশনের মুখে গান্ধীজিকে চিঠি লিখে মোতিলাল সরাসরিই জানালেন (১১ জুলাই ১৯২৮): বল্লভভাই প্যাটেলের নামই তখন সকলের মুখে মুখে, তাই তাঁর মাথাতেই 'মুকুট' পরানো উচিত। আর তা যদি না হয় তবে জওহরকেই বেছে নেওয়া ভালো হবে। তিনি নিজে এখন পুরানো, বাতিলের

দলে। জওহরের ভাবনাচিন্তায় যারা বিশ্বাসী তাদেরই হাতে এখন সংগ্রামের নেতৃত্ব থাকা দরকার।

মোতিলাল কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণে অরাজি, এই খবরে যাঁরা উদ্বিগ্ন হলেন তাঁদের মধ্যে সুভাষ অন্যতম। মোতিলালকে চিঠি লিখলেন সুভাষ (১৮ জুলাই): আপনি যদি কোন কারণে কংগ্রেস সভাপতি হতে রাজি না হন তবে গোটা বাংলা কতটা হতাশ হবে তা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।...এখন দেশের যা অবস্থা এবং ১৯২৯ সালটা আমাদের ইতিহাসে যে রকম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, তাতে আপনার চেয়ে উপযুক্ত লোকের কথা আমরা ভাবতেও পারি না। কয়েকটি যে বিকল্প নামের প্রস্তাব করা হয়েছে তা আমরা শুনেছি, অন্য সময় হলে সেগুলি বিবেচনা করা যেত। কিন্তু যখন সব দলের মধ্যে একটা সমঝোতার চেষ্টা হচ্ছে এবং একটা সর্ব-সম্মত সংবিধানের খসড়া রচনার চেষ্টা হচ্ছে, তখন ঐ সব নামের কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়।...এখন আমরা একটা গুরুতর সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছি, আমরা কি আশা করতে পারি না যে দেশের ডাকে আপনি সাড়া দেবেন?

মোতিলালের জন্য সুভাষের মনে ছিল বরাবরই বিশেষ শ্রদ্ধার আসন। বর্মার মান্দালয় জেলে সুভাষ যখন বন্দী তখন উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠি লেখেন মেজদা শরৎচন্দ্রকে (১৬ জানুয়ারি ১৯২৬): শুনছি পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু খুবই অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাবেন। এ-কথা কি সত্যি? শরৎ আশ্বস্ত করেন সুভাষকে: মোতিলালের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তুমি যা শুনেছ তা ঠিক নয়। তিনি বেশ ভালোই আছেন।

রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলে সুপারিনটেনডেণ্টের নির্যাতনের প্রতিকার চেয়ে যখন ব্যর্থ হচ্ছেন সুভাষ, তখন দিল্লিতে প্রথমে টেলিগ্রাম ও পরে চিঠি (২৩ মার্চ ১৯২৭) পাঠান মোতিলালকে: রেঙ্গুন জেল থেকে আমাকে বদলির জন্য স্বরাষ্ট্র সদস্যের (ভারত সরকারের) সঙ্গে অনুগ্রহ করে কথা বলুন।

মোতিলাল সর্বভারতীয় প্রবীণ নেতা তো ছিলেনই, তা ছাড়া সুভাষের রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী হিসেবেও তাঁর একটি বিশেষ স্থান ছিল সুভাষের কাছে। মোতিলালও সুভাষকে দেখতেন স্নেহের চোখে। ১৯৩০ সালে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসতে চান মোতিলাল। চিঠি লিখলেন সুভাষকেই (১৪ নভেম্বর—জওহরের জন্মদিন)। মোতিলাল আসছেন, সঙ্গে আসছে ছোট মেয়ে কৃষ্ণা। চিকিৎসা করবেন সার নীলরতন সরকার। একটা নিরিবিলি জায়গায় থাকতে চান মোতিলাল। সুভাষকে বললেন সব ব্যবস্থা যেন করে রাখেন সুভাষ।

বাংলার আর এক নায়ক দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তও মোতিলালকে চিঠি লিখলেন প্রায় একই ভাষায়। দু'জনকে একই সঙ্গে উত্তর দিলেন মোতিলাল। জানালেন, কেন তিনি জওহরের নাম প্রস্তাব করেছেন। গান্ধীজিকে যে-কথা লিখেছিলেন সেই কথাই লিখলেন যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষকে। বললেন, পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে ঐ আসনে বসবেন সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা হল দেশের পক্ষে কোন্‌টা ভালো হবে।

গান্ধীজি স্থির করলেন, পুত্র নয়, পিতাই এই মুহূর্তে কংগ্রেসের হাল ধরে থাকুন।

মোতিলালকে কী অভূতপূর্ব শোভাযাত্রা আর সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে সুভাষ নিয়ে এসেছিলেন অধিবেশন মণ্ডপে তা এখন সুপরিচিত ইতিহাস। কিন্তু মোতিলালের মতো প্রবীণ নেতাকে কংগ্রেস সভাপতির পদে চাইলেও সুভাষ কিন্তু নীতির প্রশ্নে আপসে রাজি ছিলেন না কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে। আর এখানে তিনি পাশে পেলেন জওহরকে। পিতার সঙ্গে আবার প্রকাশ্য সংঘর্ষে নামলেন পুত্র।

বিষয় আবার সেই 'নেহরু রিপোর্ট' যার অন্যতম সুপারিশ পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, ডোমিনিয়ন স্টেটাসই হবে ভারতের সংগ্রামের লক্ষ্য। ডিসেম্বরের ২৭ তারিখে (১৯২৮) স্বয়ং গান্ধীজি প্রস্তাব তুললেন 'নেহরু রিপোর্ট' সমর্থন করে। কিন্তু বেঁকে বসলেন তরুণ দুই

নায়ক। পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য প্রস্তাবে তাঁরা রাজি নন। তাঁরা আনলেন সংশোধনী প্রস্তাব। আবেগদৃপ্ত ভাষণে জওহর বললেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের প্রস্তাব মেনে নেওয়া হবে চরম বোকামি। এর দ্বারা আমরা সাম্রাজ্যবাদের মানসিকতাকেই মেনে নেব। মাত্র আগের মাসেই ওয়ার্কিং কমিটি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তা হলে এখন আবার অন্য কথা কেন?

গান্ধীজি দেখলেন অবস্থা ভালো নয়। রাজনৈতিক কুশলতায় তিনি অনন্য। সন্ধ্যায় বসল জরুরি বৈঠক। সেখানে গান্ধীজি ও মোতিলাল অনেক বোঝালেন জওহর ও সুভাষকে। বললেন, দলের ঐক্য বজায় রাখা কত দরকার।

পরদিন গান্ধীজি আগের প্রস্তাব তুলে নিয়ে আনলেন নতুন প্রস্তাব। তাতে বলা হল, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য ব্রিটেনকে মাত্র এক বছর সময় দেওয়া হবে। তার মধ্যে যদি ব্রিটেন এই দাবি না মানে তবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবে। এই প্রস্তাবে জওহর ও সুভাষ কেউই খুশি নন। তবু ঐক্যের খাতিরে চুপ করে রইলেন দু'জনেই। গান্ধীজির প্রস্তাব গৃহীত হল ১১৮–৪৫ ভোটে। জওহর ও সুভাষ ভোট দিলেন না। সুভাষ একটি বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে প্রকাশ্য অধিবেশনেও তিনি গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন না।

তরুণ সমাজের সকলেই যে জওহর ও সুভাষের এই আচরণে খুশি হল তা নয়। কেউ কেউ বললেন, এ কাপুরুষতার পরিচয়।

কিন্তু তখনও বিস্ময়ের বাকি ছিল। ২৮ তারিখের পরবর্তী দু'দিনে নিশ্চয়ই কিছু বড় ধরনের আলোড়ন ঘটে যায়। তাই প্রকাশ্য অধিবেশনে গান্ধীজি যখন প্রস্তাবটি তুললেন তখন অনেককে অবাক করে দিয়ে সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন সুভাষ। বললেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাস কংগ্রেস মানতে পারে না। জওহরও এগিয়েও এলেন সুভাষের সমর্থনে। তবে জওহরের নিজের স্বীকৃতিতেই জানা যায়, সর্বান্তঃকরণে তিনি সুভাষের সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করেননি।

সুভাষের সংশোধনীটি অবশ্যই অগ্রাহ্য হয়ে যায় (১৩৫০--৯৭৩ ভোটে)। কারণ এই ব্যাপারটিকে গান্ধীজি করে তোলেন তাঁর প্রতি আস্থার প্রশ্ন। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী শক্তি যে ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে তার প্রমাণও মেলে। তবে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই দেখা দেয়। বিষয় নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরোধিতা না করার সম্মতি জানিয়ে প্রকাশ্য অধিবেশনে সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন কেন সুভাষ?

জওহরের এক জীবনীকার মাইকেল ব্রেশার এই বিষয়ে একটি কাহিনী শুনিয়েছেন। সুভাষ তাঁর এক বন্ধুকে বলেন, এটা তিনি করেছিলেন কৌশল হিসেবে। প্রথমত, জওহরলালকে তিনি আর বেশি বিব্রত করতে চাননি। দ্বিতীয়ত, বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে যদি তাঁর মত অগ্রাহ্য হত, তবে প্রকাশ্য অধিবেশনে আবার প্রশ্নটি তোলা অস্বস্তিকর হত। তৃতীয়ত, সুভাষের বিশ্বাস ছিল প্রকাশ্য অধিবেশনে জওহরের সমর্থন তিনি পাবেন।

সুভাষের কোন্ বন্ধু ব্রেশারকে বলেছিলেন এই কৌশলের কাহিনী? ব্রেশার জানাচ্ছেন, সেই বন্ধুটি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জওহর ও সুভাষের আচরণকে কিছুটা দার্শনিকের উদারতায় দেখতে চেয়েছিলেন মোতিলাল। তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে বললেন: সুভাষ ও জওহর দু'জনেই আপনাদের বলেছে যে তাদের মতে আমরা বুড়ো মানুষেরা কোন কাজের নই, শক্ত নই, সময়ের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছি। এটা নতুন কোন কথা নয়। পৃথিবীর এটাই নিয়ম, অল্প-বয়সীরা মনে করে বৃদ্ধরা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। আমি আপনাদের একটা পরামর্শ দেব। আমাদের লক্ষ্যের আমরা যে নামই দিইনা কেন, আসুন, আমরা সকলে স্বরাজের জন্য কাজ করি।

গান্ধীজি কিন্তু ব্যাপারটাকে এত সহজভাবে নিতে পারেননি। কথা দিয়েও যারা তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করল না, তাদের কঠোর সমালোচনা করলেন তিনি। বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই যাদের মত বদলে যায় তারা যেন আর স্বাধীনতার কথা না বলে। মুসলমানরা

যেমন আল্লার নাম করে অথবা হিন্দুরা করে কৃষ্ণ বা রামের নাম, তেমনই আপনারা মুখে স্বাধীনতার নাম জপতে পারেন, কিন্তু তার পিছনে যদি কোন সম্মানবোধ না থাকে তবে সবটাই হবে ফাঁকা আওয়াজ। স্বাধীনতা জিনিসটা আরও কঠোর ধাতুতে তৈরি, কথার মারপ্যাঁচে স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না।

প্যারেলালের বিবরণ থেকে এই সময়ের একটি আকর্ষক সংলাপের কথা আমরা জানতে পারি। গান্ধীজিকে জওহর বলেছিলেন: বাপু, আপনার আর আমার মধ্যে পার্থক্য হল এই—আপনি ধাপে ধাপে কাজ করায় বিশ্বাস করেন, আমি চাই বিপ্লব।

উত্তরে গান্ধীজি বলেছিলেন: শোন হে ছোকরা। অন্যেরা বিপ্লব-বিপ্লব বলে শুধু চীৎকার করেছে, আর আমি নিজে হাতে বিপ্লব করেছি। যখন তোমাদের দম ফুরিয়ে আসবে, সত্যিই বিপ্লব চাইবে, তখন তোমরা আমার কাছেই আসবে। তখন আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব বিপ্লব কী করে করতে হয়।

গান্ধীজির তীব্র ভর্ৎসনার কারণ নিশ্চয়ই শুধু এই নয় যে, প্রকাশ্য বিরোধিতায় খুবই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছিলেন গান্ধীজি। জওহর ও সুভাষকে সামনে রেখে কংগ্রেসের মধ্যে বামশক্তি যে ক্রমশ দানা বাঁধছিল, তাতেও তিনি নিশ্চয়ই কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। আর এই শক্তিকে কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তার ভাবনাচিন্তাও শুরু করে দিয়েছিলেন তার পর থেকেই। এর ফল আমরা দেখতে পাই পরের বছরেই। যখন তিনি কংগ্রেস সভাপতির মুকুটটি পরিয়ে দিলেন জওহরের মাথায়।

কলকাতা কংগ্রেসেই জওহর-সুভাষ ঐক্য হয়ে উঠেছিল উজ্জ্বলতম। কিন্তু এই অধিবেশনেই যেন ধরা পড়ল জওহরের দোদুল্যমানতা। সুভাষের সংশোধনী প্রস্তাব তিনি সমর্থন করলেন ঠিকই, কিন্তু কিছুটা দ্বিধা নিয়ে। কয়েক বছর পরে আত্মচরিতে তিনি লিখলেন, গান্ধীজির প্রস্তাবটি একেবারেই নরম, কারণ পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে আমরা পিছিয়ে এলাম, তবু ঐ মুহূর্তে ঐ প্রস্তাবটিই

ছিল উপযুক্ত। সুভাষের সঙ্গে নীতির প্রশ্নে একমত হয়েও মনের দিক থেকে গান্ধীজির প্রতি তাঁর যে অমোঘ আকর্ষণ তার কিছুটা আভাস এখানেই মিলল।

তা আরও স্পষ্ট হল পরের বছরের ঘটনায়।

॥ চার ॥

গান্ধীজির সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হল তখন জওহরের বয়স সাতাশ। উপলক্ষ লখনউ কংগ্রেস। ১৯১৬ সাল। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেছেন বছর চারেক আগে। কাজ শুরু করেছেন এলাহাবাদ হাইকোর্টে। রাজনীতিতে আগ্রহ জাগছে। প্রথম বার কংগ্রেস অধিবেশনে গেলেন বাঁকিপুরে (১৯১২)। কোন তরুণের পক্ষে উদ্দীপিত হওয়ার মতো কোন ব্যাপার সেখানে ছিল না। কেতাদুরস্ত ইংরেজি আবহাওয়া। ভালো-ভালো কথা। সামাজিক মেলামেশা। দেশের রাজনীতি তখন নিস্তরঙ্গ। বাল গঙ্গাধর টিলক জেলে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বাংলাও শান্ত। দীর্ঘ প্রবাসের (১৯০৫ থেকে সাত বছর) পর দেশে ফিরে ঠিক যেন খাপ খাওয়াতে পারছেন না জওহর। নিজেই লিখেছেন, আমার দো-আঁশলা শিক্ষাই হয়ত দায়ী এর জন্য। গোপালকৃষ্ণ গোখলের সার্ভেন্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। কিন্তু রাজনীতিতে যে সংগ্রামী চরিত্রের সন্ধান করছেন, তা পাচ্ছেন না।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যেন কিছুটা নাড়া পড়ল। টিলক জেল থেকে বেরোলেন। গড়লেন হোম রুল লিগ। শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তও গড়লেন একই সংগঠন। জওহর যোগ দিলেন দুটিতেই। এই সময়েই ঘটল স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গান্ধীজির আবির্ভাব।

জওহরের সঙ্গে গান্ধীজির প্রথম দেখার পাঁচ বছর পরে সুভাষের

সঙ্গে মহাত্মার প্রথম দেখা। আকস্মিকভাবে নয়। আই সি এস থেকে পদত্যাগ করে দেশে ফিরে বোম্বাইয়ে নেমে প্রথমেই তিনি সোজা গেলেন গান্ধীজির কাছে (জুলাই ১৯২১)। উদ্দেশ্য : দেশের সেবায় কীভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারেন তার পথসন্ধান।

গান্ধীজি-জওহরলালের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ কেউ-ই রেখে যাননি—না গান্ধীজি, না জওহর। মহাত্মার আত্মকথায় জওহরের নাম একবারও নেই। আছে মোতিলালের নাম। জওহরের আত্মচরিতেও কিন্তু এই সাক্ষাতের বিবরণ মেলে না। তবে জওহরের এক জীবনীকার ফ্র্যাঙ্ক মোরেস চেষ্টা করেছেন এই সাক্ষাতের দৃশ্য কল্পনা করতে।

গান্ধীজি বসে আছেন। পরনে মোটা ধুতি, লম্বা কোট, মাথায় গুজরাতি কায়দায় পাগড়ি। জওহরের পরনে ইউরোপীয় পোশাক। বিলেত-ফেরত যুবকের সলজ্জ ভাব, আর তা চাপা দিতেই যেন চোখে মুখে একটা ঔদ্ধত্যের ভাব আনার চেষ্টা। কী কথা হয়েছিল দু' জনে জানা যায় না। কিন্তু প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় কি খুব বেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন জওহর? বুঝতে কি পেরেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এবং ভবিষ্যৎ ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কটির সূচনা হল?

মনে তো হয় না। নিজেই লিখেছেন : দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর বীরের মতো লড়াইকে আমরা তারিফ করেছি, কিন্তু আমাদের তরুণদের অনেকের কাছেই তিনি ছিলেন দূরের মানুষ, অরাজনৈতিক এক পুরুষ। অথচ এই 'দূরের মানুষটিই' ক্রমে হয়ে দাঁড়ালেন জওহরের জীবনে সবচেয়ে প্রভাবশালী পুরুষ।

সুভাষ নিজেই লিখে গেছেন গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ। মহাত্মা তখন ছিলেন বোম্বাইয়ে লেবারনাম রোডের 'মণি ভবনে'। জুলাইয়ের সেই অপরাহ্ণে একটি কার্পেট-মোড়া ঘরের মাঝখানে বসে আছেন তিনি। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে দেশকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছেন তখন, হয়ে উঠেছেন স্বাধীনতা

সংগ্রামের নবনায়ক। তাঁকে ঘিরে তাঁর সঙ্গীরা, সকলের পরনেই খাদি। সুভাষ সেদিনই ফিরেছেন বিদেশ থেকে, পরনে ইউরোপীয় পোশাক। তাই কিছুটা অস্বস্তি।

হেসে স্বাগত জানালেন গান্ধীজি। অস্বস্তি কাটিয়ে দিলেন। কথাবার্তা শুরু হল। চলল ঘণ্টাখানেক। একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন সুভাষ। ধৈর্য ধরে প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে থাকলেন গান্ধীজি। অসহযোগ আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে—কর দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে। কিন্তু তার আগে বিভিন্ন পর্বের মধ্যে দিয়ে কীভাবে পৌঁছানো হবে সেই চূড়ান্ত পর্যায়ে? কর দেওয়া বন্ধ অথবা আইন অমান্য হলেই কি ব্রিটিশ সরকার সব ছেড়ে পালাবে, আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে দেবে? শেষ প্রশ্ন: মহাত্মা কী করে বলছেন, এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে খুশি সুভাষ। গান্ধীজি বোঝালেন, এক কোটি স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহ আর এক কোটি টাকার তহবিল গড়ার জন্য তাঁর আবেদনে বেশ সাড়া মিলেছে। এবার বিদেশী বস্ত্র বর্জন আর খাদির পক্ষে প্রচার অভিযান। সরকার যখন বুঝবে কংগ্রেসের গঠন-মূলক কাজে লোকে সাড়া দিচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই আঘাত হানার চেষ্টা করবে। তখনই আইন অমান্য করে জেলে যাওয়ার পর্ব শুরু হবে। তারপর কর দেওয়া বন্ধ।

কিন্তু পরের দুটি প্রশ্নের উত্তরের সুস্পষ্ট জবাব পেলেন না সুভাষ। তাঁর প্রথমে মনে হল, তিনিই কি বুঝতে ভুল করছেন? কিন্তু যতই ভাবতে থাকেন ততই মনে হতে থাকে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কোন সুস্পষ্ট রূপরেখা যেন গান্ধীজির চোখের সামনে নেই, কীভাবে স্বাধীনতা আসবে তা নিজেই যেন ঠিকমতো জানেন না গান্ধীজি।

হতাশ হয়েই ফিরলেন সুভাষ। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর এই প্রথম সাক্ষাৎটিকে মনে হয় যেন ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। বছর কুড়ি পরে সুভাষ যখন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এবং ভারতের রাজনীতির এক সংকটময় মুহূর্তে মহাত্মার কাছে ছুটে যান শেষবারের মতো, তখনও

হতাশ হয়েই ফিরতে হয়েছিল তাঁকে।

তবে চব্বিশ বছরের এক তরুণকে গান্ধীজি সেদিন এক দিক থেকে হতাশ করলেও একটি সঠিক পথ নির্দেশ করেছিলেন। এখন তা হলে আমি কী করব?—সুভাষের এই জিজ্ঞাসার জবাবে গান্ধীজি বললেন, কলকাতায় গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা কর। সুভাষ তাই-ই করলেন। আর দেশবন্ধুর সঙ্গে কথা বলেই তাঁর মনে হল: এই তো সেই মানুষ যাঁকে আমি খুঁজছিলাম। তিনি জানেন তিনি কী চান। দেশের যুবসমাজের তিনি বন্ধু। আমি অবশেষে একজন নেতা খুঁজে পেলাম।

জওহরলাল গান্ধীজির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার প্রথম সুযোগ পেলেন জালিয়ানওয়ালা বাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর (১৯১৯)। এই মর্মান্তিক ঘটনা জওহরের মনে এমনিতেই বিরাট নাড়া দিয়েছিল। বিলেতে থাকার সময় ইংরেজের সভ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল, তা প্রায় ভেঙে পড়ল। হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য কংগ্রেস তৈরি করল একটি কমিটি। গান্ধীজি, মোতিলাল, দেশবন্ধু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সেই কমিটির সদস্য। জওহর প্রধানত দেশবন্ধুকে সাহায্য করছিলেন তদন্তের কাজে। এই সুযোগে গান্ধীজিকে দেখতে পেলেন খুব কাছ থেকে।

গান্ধীজি যে-সব কথা বলতেন, যে-সব প্রস্তাব দিতেন তা অনেক সময়েই তদন্ত কমিটির সদস্যদের কাছে মনে হত বিচিত্র। মতেও সব সময়ে মিলত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের মতে রাজি করাতেন অন্যদের। পরবর্তী ঘটনায় প্রমাণ হত তাঁর অভিমতের মূল্য। তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিতে ক্রমশ আস্থা বাড়তে লাগল জওহরের।

কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে জওহরের সম্পর্কের রহস্য বুঝতে গেলে মোতিলালের সঙ্গে মহাত্মার সম্পর্কটিও আমাদের বুঝতে হবে। গান্ধীজি যদিও বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার এবং মোতিলালও সফল আইনজীবী, তবু দু'জনে ছিলেন একেবারেই দু'ধরনের মানুষ। বিলেত-ফেরত হয়েও গান্ধীজি ছিলেন মনেপ্রাণে সনাতন ভারতীয়। মোতিলাল

বিলেত ভ্রমণের আগেই, পেশায় সাফল্য আসার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে উঠেছিলেন সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত। মোতিলাল বয়সে আট বছরের বড়। গান্ধীজি প্রকৃতিতে সাধুসন্তের মতো, ধর্মানুসারী, জীবনের নানা আকর্ষণকে হেলায় অস্বীকার করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদীদের চ্যালেঞ্জ জানাতে।

আর মোতিলাল? স্বভাবে তাঁর রাজকীয়তা। অসামান্য সফল ব্যবহারজীবী, জীবন-সম্ভোগী। পরে কী হবে তা নিয়ে চিন্তা না করে উপভোগ করেছেন জীবনকে। মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় একজন অন্তর্মুখী, অন্যজন বহির্মুখী। তবু দুই বিপরীত মেরুর মতোই আকৃষ্ট হয়েছেন পরস্পরের প্রতি। তারপর পাশাপাশি কাজ করতে গিয়ে গড়ে উঠেছে যোগাযোগের সূত্র, একে অপরকে ভালোবেসেছেন।

মোতিলাল অচিরেই বুঝে ফেলেছেন যে, গান্ধীজির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন জওহর, গান্ধীজির সংগ্রামের ডাক পছন্দ হয়েছে ছেলের। কিন্তু একমাত্র ছেলের মঙ্গলকামনায় উদ্বিগ্ন হয়েছেন পিতা। রাজনীতির দিক দিয়ে জওহরকে ক্রমশ চরমপন্থী হয়ে উঠতে দেখে তাকে সংযত করার জন্য মোতিলাল সাহায্য চেয়েছেন গান্ধীজির। মোতিলালের ভয় হয়েছিল, ছেলেটা আবার বাংলার বিপ্লবীদের পথে না যায়। জওহর-লাল অবশ্য ঐ দিকে আকৃষ্ট হননি কোন দিনই।

রওলাট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবেন গান্ধীজি। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন জওহর। তিনিও যোগ দেবেন গান্ধীজির সত্যাগ্রহ সভায়। কিন্তু বেঁকে বসলেন মোতিলাল। তাঁর ছেলে আইন অমান্য করবে? জেলে যাবে? সেখানে মেঝেয় শুয়ে রাত কাটাবে? মোতিলাল নিজের বাড়িতেই মেঝেয় শুয়ে একদিন দেখলেন কতটা কষ্ট হতে পারে ছেলের। তারপর একদিন গান্ধীজিকে ডেকে পাঠালেন এলাহাবাদে। বললেন, জওহরকে সামলান। গান্ধীজি জওহরকে বললেন, এমন কিছু করো না যাতে বাবা আঘাত পান।

আরও কয়েক বছর পর। ১৯২৪ সাল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে নিয়ে মোতিলাল গেছেন বোম্বাইয়ে গান্ধীজির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে।

কথায় কথায় উঠল জওহর-প্রসঙ্গ। মোতিলাল বললেন, কষ্ট স্বীকার *আত্মত্যাগ সবই আমি বুঝি, কিন্তু মুড়ি-ছোলা খেয়ে থাকবে জওহর, ট্রেনে থার্ড ক্লাসে চড়বে? এ তো আদিম ব্যাপার। আমি এতে কষ্ট* পাই। জওহর আপনার কথা শোনে। ওকে বুঝিয়ে বলুন।

গান্ধীজি বললেন, আপনি যা বলছেন তাই-ই করব।

জওহর বেশ কিছুদিন যেন দাঁড়িয়েছিলেন পিতা আর রাজনৈতিক গুরুর মাঝখানে। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ডাক তাঁকে ফেলে দিল এক দোটানায়। একদিকে পিতার প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা, অন্যদিকে গান্ধীজির নেতৃত্বে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আকর্ষণ। এই সংকট অংশত নিরসন করে দিয়েছেন পিতা নিজেই। পুত্রকে সংযত করার বাসনায় তিনি পুত্রের পথেই চলতে শুরু করে দেন। অবশ্য ১৯১৯ সালের ঘটনাবলী, বিশেষ করে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড দেশের রাজনৈতিক পরিবেশটাই বদলে দিয়ে যায়। মোতিলালও আরও অনেকের মতো তাই নরমপন্থী থাকতে পারেননি।

মোতিলালের মৃত্যুর পর একটা গভীর শূন্যতা অনুভব করতে থাকেন জওহর। সেই অভাব অনেকটা পূরণ করে দেন গান্ধীজি। একথা বললে বেশি বলা হবে না যে, পাশাপাশি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গান্ধীজি আর জওহরের মধ্যে যেমন গড়ে উঠেছে বিশেষ বন্ধন, তেমনই গান্ধীজি জওহরের চোখে হয়ে দাঁড়িয়েছেন রাজনৈতিক গুরু আর পিতার বিচিত্র সংমিশ্রণ। ভবিষ্যতে আমরা তাই দেখতে পাব, গুরুতর মতভেদ সত্ত্বেও জওহর পুরোপুরি বিদ্রোহ করতে পারছেন না গান্ধীজির বিরুদ্ধে।

সুভাষের সঙ্গে গান্ধীজির সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন টানাপোড়েন ছিল না। তাই মহাত্মার বিরুদ্ধে মত প্রকাশে তিনি অনেক বেশি কুণ্ঠাহীন, অনেক বেশি আপসহীন। ১৯২১-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গেই আমরা এর প্রমাণ পেয়ে যাই।

জওহর আর সুভাষের প্রথম গ্রেপ্তার ও কারাবরণ এই অসহযোগ

আন্দোলনের সময়েই। প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতে পৌঁছানোর দিন (১৭ নভেম্বর ১৯২১) হরতালের ডাক দিয়েছিলেন গান্ধীজি। তাকে কেন্দ্র করেই উত্তাল হয়ে উঠেছিল দেশ। হাজারে হাজারে মানুষ শুরু করল আইন অমান্য করে কারাবরণ করতে। এলাহাবাদে আনন্দভবন থেকে গ্রেপ্তার হলেন মোতিলাল, জওহরলাল ও তাঁর দুই জ্ঞাতিভাই মোহনলাল আর শ্যামলাল ডিসেম্বরের ৬ তারিখে। কলকাতায় ১০ তারিখে গ্রেপ্তার হলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষ। জওহরের জেল হল ছ'মাস। সুভাষেরও তাই। তবে মাস দুয়েকের বিচারের প্রহসনের পর সুভাষের কারাদণ্ড শুরু হল পরের বছর ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে। একদিকে একই সঙ্গে জেলে গেলেন পিতা-পুত্র, অন্যদিকে গুরু-শিষ্য।

ফেব্রুয়ারিতেই ঘটে গেল একটা বড় ঘটনা। চার তারিখে আইন অমান্যের ডাক দিয়েছিলেন গান্ধীজি। প্রায় সর্বত্রই আন্দোলন ছিল অহিংস। কিন্তু উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় পুলিশের গুলি-চালনার পর ক্ষিপ্ত জনতা আগুন দিল থানায়, নিহত হল ছয় পুলিশ। এই ঘটনার পরই বরদৌলিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিশেষ বৈঠক ডেকে আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন গান্ধীজি।

মহাত্মার এই সিদ্ধান্তে হতবাক সব নেতা। হতবাক মোতিলাল, দেশবন্ধু। জওহরলাল তখন জেলে। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন: জেলে বসে বিস্ময় আর ক্ষোভের সঙ্গে জানলাম গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আমাদের (অর্থাৎ আন্দোলনকারীদের) অবস্থা যখন ভালো হচ্ছে, সব দিকে যখন এগিয়ে চলেছি, ঠিক তখনই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্তে আমরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। বিশেষ করে ক্ষুব্ধ হল তরুণ সমাজ। আমাদের ক্রমবর্ধমান আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল, তাই এই ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া তো হবেই।

যে কারণ দেখিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন গান্ধীজি তাতেই ক্ষোভ দেখা দিল বেশি। জওহরের ভাষায়: চৌরিচৌরার

ঘটনা নিন্দনীয় হতে পারে, হয়ত তা অহিংসা-নীতিরও বিরোধী। কিন্তু দূরবর্তী এক গ্রামের একদল উত্তেজিত কৃষকের আচরণ কি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবসান ঘটাবে? একটি বিচ্ছিন্ন হিংসাত্মক ঘটনার এই যদি হয় অনিবার্য পরিণাম, তবে তো বলতে হবে অহিংস আন্দোলনের আদর্শ আর কৌশলের মধ্যেই কোন ত্রুটি আছে।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে সুভাষ কী চোখে দেখেছিলেন? তাঁর মনোভাবও জওহরেরই মতো। ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থে তিনি লিখলেন: কংগ্রেস শিবিরে দেখা দিল রীতিমতো বিদ্রোহ। চৌরিচৌরার বিচ্ছিন্ন ঘটনার অজুহাতে সারা দেশে গান্ধীজি কেন আন্দোলন স্তব্ধ করে দিলেন কেউ-ই তা বুঝতে পারলেন না। ক্ষোভ আরও বেশি হল এই কারণে যে, বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করাও মহাত্মা প্রয়োজন মনে করলেন না, তা ছাড়া সারা দেশে আইন অমান্য আন্দোলন সফল হওয়ার মতো চমৎকার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। সাধারণ মানুষের উদ্দীপনা যখন চরমে পৌঁছেছে, ঠিক তখনই পিছিয়ে আসার আদেশ দেওয়া বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

জওহর কিন্তু সেই মুহূর্তে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেও বছর তের পরে আত্মচরিত রচনার সময় গান্ধীজির সিদ্ধান্তের সমর্থনে কিছু যুক্তি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। তখন আন্দোলন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, চৌরিচৌরার অজুহাত দেখিয়ে তা প্রত্যাহার করে না নিলে সবটাই হাতের বাইরে চলে যেত। কারণ আপাতদৃষ্টিতে যত উৎসাহ-উদ্দীপনাই থাক না কেন, আন্দোলনের মধ্যে না ছিল কোন শৃংখলা, না ছিল কোন সংগঠন।

তা ছাড়াও জওহর দিয়েছেন আর একটি যুক্তি। তাঁর ভাষায়: গান্ধীজিই তো এই অহিংস আন্দোলন আদর্শের জনক। এর সম্পর্কে তাঁর চেয়ে ভালো আর কে বুঝবেন? আর তাঁকে বাদ দিয়ে আমাদের আন্দোলনই বা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

অবশ্য আন্দোলন প্রত্যাহারের মুহূর্তে মোতিলাল আর জওহরলালের ক্ষোভের কথা জানতে পেরে তাঁদের শান্ত করতে চেয়েছিলেন গান্ধীজি। বিজয়লক্ষ্মীর (পণ্ডিত) হাত দিয়ে বরদৌলি থেকে জওহরকে পাঠিয়েছিলেন চিঠি (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২)। তাতেই বিস্তারিত জানিয়েছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অহিংস আন্দোলন কেমন সহিংস হয়ে উঠছিল। লিখেছিলেন: এই মুহূর্তে পশ্চাদপসরণে আমাদের আদর্শেরই লাভ হবে। আমাদের আন্দোলন সঠিক পথ থেকে সরে গেছে।

আত্মচরিতে যে-কথাই লিখুন জওহর, সেই মুহূর্তে মহাত্মার চিঠিতে তাঁর ক্ষোভ বিশেষ প্রশমিত হয়নি। তাই মার্চ মাসে যখন জেল থেকে ছাড়া পেলেন, তখন তিনি বিষণ্ণ, মনমরা।

উনিশ শ' তিরিশের আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারে গান্ধীজির সিদ্ধান্তেও এমনই হতাশ হয়েছিলেন জওহর। অবশ্যই সুভাষও।

কিন্তু আরও এগোবার আগে আমরা একটু পিছন ফিরে তাকাই।

॥ পাঁচ ॥

জানকীনাথ বসু ও প্রভাবতীর নবম সন্তান ও ষষ্ঠ পুত্র সুভাষ যখন কটক শহরে ভূমিষ্ঠ হল (২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭) সেই দুপুরে সুদূর এলাহাবাদে মোতিলাল নেহরু ও স্বরূপরাণীর জ্যেষ্ঠ সন্তান ও একমাত্র পুত্র জওহর খুবই সম্ভবত একা একা খেলা করছিল অথবা ঘুরে বেড়াচ্ছিল আপন মনে। তখনও পর্যন্ত এক সন্তানের জনক হলেও মোতিলালের বাড়িতে লোকজনের অভাব ছিল না। সেকালের আরও পাঁচটা হিন্দু পরিবারের মতো সেই বাড়িতেও ছিল আত্মীয়-স্বজনের ভিড়। তবু আট বছরের বালক (জন্ম ১৪ নভেম্বর, ১৮৮৯) জওহর ঐ বয়সে এবং পরে আরও কিছুদিন ছিল নিঃসঙ্গ। তার জ্যাঠতুতো ভাই-বোনেরা সকলেই ছিল বয়সে বড়, স্কুল-কলেজে পড়ত,

ছোট ভাইটিকে পাত্তা দিত না। আর জওহরের নিজের বোন স্বরূপার (বিজয়লক্ষ্মী) যখন জন্ম হল তখন তার বয়স এগার, কৃষ্ণার জন্ম তো আরও পরে।

তবু যদি জওহর স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেত তবে কয়েকজন সঙ্গী জুটতে পারত। কিন্তু ষোল বছর বয়সের আগে মোতিলাল ছেলেকে কোন স্কুলে ভর্তি করেননি। বাড়িতে বসে প্রাইভেট টিউটরের কাছেই হয়েছে হাতেখড়ি। তাঁদের মধ্যে খোদ সাহেবও ছিলেন, ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। বাবা ব্যস্ত আইনজীবী। ছেলের জন্য সময় দিতে পারেন না খুব বেশি। যতটুকু সঙ্গ মেলে তা মা স্বরূপরাণী, মেজ জ্যাঠাইমা (মোতিলালের মেজদা নন্দলালের স্ত্রী) অথবা বাড়ির মুন্সি মুবারক আলির। মা-জ্যাঠাইমার কাছে শোনা হত রামায়ণ-মহাভারতের গল্প আর বুড়ো মুবারক আলি বলত আরব্য রজনীর অথবা সিপাহী বিদ্রোহের আমলের কাহিনী।

কয়েক বছর পরে কটকে ফিরে এসে যদি আমরা সুভাষের খোঁজ করি, তবে অন্য ছবি দেখতে পাই। জানকীনাথের নিজের পরিবারই অবশ্য যথেষ্ট বড় ছিল। সুভাষের আগেই এই পৃথিবীতে এসেছে তিন মেয়ে—প্রমীলা, সরলা আর তরুবালা। আর পাঁচ পুত্র—সতীশ, শরৎ, সুরেশ, সুধীর ও সুনীল। (পরে আরও তিনটি মেয়ে মলিনা, প্রতিভা, কনকলতা এবং দুটি ছেলে শৈলেন ও সন্তোষের জন্ম হয়।) তা ছাড়া, আত্মীয়স্বজন আশ্রিতজন আর পরিচারক-পরিচারিকার বাহিনী। জানকীনাথও ব্যস্ত আইনজীবী, প্রভাবতী ব্যস্ত বিরাট সংসার সামলাতে। ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে দেওয়ার মতো সময় তাঁর ছিল না। সুভাষ চাইত মা-বাবাকে আরও কাছে পেতে। ভরসা বলতে ছিল পরিচারিকা সারদা। সে সুভাষকে ডাকত 'রাজা' বলে। কিন্তু এত লোকজনের মধ্যে সুভাষের নিজেকে মনে হত নিতান্ত তুচ্ছ। বড় পরিবারের মধ্যে থাকায় সুভাষের মনে কোন সংকীর্ণতা ঠাঁই পায়নি, কিন্তু শৈশবে তাকে আমরা দেখি লাজুক আর আত্মমুখী হিসেবে।

অবশ্য বাড়ির আর পাঁচ জন ছেলের মতো সুভাষ স্কুলে ভর্তি হয়েছিল অল্প বয়সেই। বছর পাঁচেক বয়স হওয়ার পর এক মিশনারি স্কুলে, আরও কয়েক বছর পরে র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলে। সেখানে আত্মমুখী মনোভাব পুরোপুরি কাটাতে না পারলেও সুভাষের অবশ্যই কিছু সঙ্গী জুটেছিল।

ভবিষ্যতে যে দুটি পরিবার ভারতের রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থান নেবে এবং হয়ে উঠবে ঘনিষ্ঠ, তাদের তৎকালীন অবস্থার মধ্যে সাদৃশ্যের অভাব ছিল না। আত্মজীবনীতে জওহরলাল নিজেদের পরিবারকে সমৃদ্ধিশালী বলে বর্ণনা করেছেন। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন : আমাদের পরিবার ধনী ছিল না, ছিল সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবার, অভাব-অনটন কাকে বলে আমরা জানিনি।

মোতিলাল ও জানকীনাথ দু'জনেই ছিলেন সফল আইনজীবী। তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যেও মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। কাশ্মীর থেকে দিল্লি আগ্রা হয়ে নেহরু পরিবার এসে পৌঁছান এলাহাবাদে। মোতিলালের জন্ম আগ্রায় ১৮৬১ সালে। জানকীনাথের তার এক বছর আগে।

মোতিলালের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পদস্থ সরকারি কর্মী অথবা আইনজীবী। পিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন উকিল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। পিতা গঙ্গাধর দিল্লি পুলিশের কোতোয়াল। বড় ভাই বংশীধর ব্রিটিশ সরকারের বিচার বিভাগে। মেজ ভাই নন্দলাল এক সময় ছিলেন রাজপুতানার ক্ষেত্রীর দেওয়ান, পরে শুরু করেন আইন ব্যবসা। তাঁরই অনুপ্রেরণায় মোতিলাল একদিন প্রবেশ করেন আইনের আঙিনায়।

জানকীনাথের পূর্বপুরুষদের বাস ছিল চব্বিশ পরগণার মহীনগর-কোদালিয়া এলাকায়। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন মহীপতি বসু। বাংলার নবাবের তিনি যুদ্ধ আর অর্থমন্ত্রী হয়েছিলেন, পেয়েছিলেন জায়গির। মহীপতির পুত্র ও পৌত্ররাও রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হননি। আর এক বিখ্যাত পূর্বপুরুষ গোপীনাথ

হয়েছিলেন সুলতান হোসেন শাহের নৌ-সেনাপতি।

জানকীনাথেরা ছিলেন চার ভাই। মোতিলালের মতো তিনিও ছিলেন কনিষ্ঠ। বড় ভাই যদুনাথ সরকারি চাকরি করতেন। মেজ ভাই কেদারনাথ কোদালিয়া ছেড়ে পাকাপাকি চলে আসেন কলকাতায়। সেজ দেবেন্দ্রনাথ সরকারি এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেন, যথাসময়ে হন অধ্যক্ষ। জানকীনাথ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কিছুদিন করেন শিক্ষকতা, তারপর কটকে গিয়ে শুরু করেন আইন ব্যবসা।

জওহরলালের যখন জন্ম হল তখন মোতিলালের পসার সবে বাড়তে শুরু করেছে। তখনও তিনি এলাহাবাদের যে অঞ্চলে থাকতেন তা ছিল ঘিঞ্জি। মোটেই বড়লোকের পাড়া নয়। মেজদা নন্দলাল হঠাৎ মারা গেছেন। গোটা পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়েছে তাঁর ওপর। দিনরাত পরিশ্রম করে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছেন তিনি। জওহরের বয়স যখন তিন তখন মোতিলাল উঠে এলেন এক শৌখিন পাড়ায়। সেখানে প্রধানত সাহেবসুবোর বাস। আরও সাত বছর পরে কিনলেন একটা বাড়ি। আনন্দভবন।

সুভাষের নিজের জবানিতেই আমরা জানি, জানকীনাথও বড় হয়েছিলেন নিজের চেষ্টায়। আইন ব্যবসায়ে পসার জমার আগে তাঁর দিন কেটেছে রীতিমতো আর্থিক সংকটে। কিন্তু কটকে ওকালতি শুরু করার পর তাঁর কপাল খুলে গেল। কিছুদিনের মধ্যে হলেন পাবলিক প্রসিকিউটর। আরও কিছুদিন পরে গভর্মেণ্ট প্লিডার।

মোতিলাল প্রথম জীবনে স্বাধীনতা আন্দোলন বা জাতীয় কংগ্রেসের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন না। নিজের কাজ, সাহেবসুবো বন্ধুবান্ধব নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ক্রমে রাজনীতির জগতে এসে তিনি হয়ে দাঁড়ালেন সর্বভারতীয় নেতা, জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। পিতা আর পুত্রকে আমরা পাশাপাশি দেখলাম আন্দোলনে, দেখলাম একই সঙ্গে কারাবরণ করতে।

জওহরলালের জীবনকথা বলতে গিয়ে বারবার এসে যায় মোতিলালের কথা।

জানকীনাথ অবশ্যই সেই অর্থে রাজনীতিক ছিলেন না। কিন্তু জনজীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিতও তাঁকে বলা যাবে না। তাঁকে আমরা দেখতে পাই কটক পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে। জাতীয় কংগ্রেসের কাজে তাঁর সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল বরাবর। সরকারি উকিল থাকার সময়ও তাঁকে দেখা গেছে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে। তাতে যে সাহেবকর্তারা সব সময়ে খুশি হয়েছেন তা নয়। স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন সক্রিয়ভাবে। ১৯৩০ সালে দেশে যখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছে তখন ইংরেজের নির্যাতনের প্রতিবাদে তিনি ত্যাগ করলেন রায়বাহাদুর খেতাব। ছেলেরা যখন কংগ্রেসে যোগ দিল অথবা ছেড়ে দিল লোভনীয় সরকারি চাকরি তখন তিনি শেষ পর্যন্ত বাধা দেন নি। দুই ছেলে শরৎ ও সুভাষকে দেখেছেন একই সঙ্গে জেলে যেতে।

জওহর ও সুভাষ দু'জনেই তাঁদের আত্মজীবনীতে লিখেছেন বাবার কথা। অবশ্য জওহর যত বিশদভাবে এবং বারম্বার লিখেছেন সুভাষ ততটা নয়।

সুভাষের আঁকা বাবার ছবিতে আমরা যে-জানকীনাথকে দেখি তিনি ছেলেমেয়েদের চোখে যেন কিছুটা দূরের মানুষ। নিজের পেশা আর সমাজসেবার কাজে ব্যস্ত। সুভাষ বাবার পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণেও সচেষ্ট হয়েছেন। বলেছেন, বাবা ছিলেন কিছুটা গাম্ভীর্যের আবরণে মোড়া। ছেলেমেয়েরা তাঁকে যেন একটু ভয়ই পেত। এই সঙ্গে সুভাষ বাবার রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পিছপা হন নি। জানকীনাথের 'হিরো' ছিলেন প্রধানত কেশবচন্দ্র সেন আর কিছু পরিমাণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এঁরা কেউই রাজনীতিক ছিলেন না। তাঁর চেয়ে বড় কথা, ছিলেন না ইংরেজ বিরোধী। জানকীনাথও সরকার-বিরোধী ছিলেন না। তাই তিনি রাজী হন

সরকারি উকিল হতে, রায় বাহাদুর খেতাব গ্রহণেও আপত্তি হয়নি তাঁর। সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখেছেন, এই ব্যাপারে তাঁর পিতা যে বিশেষ ব্যতিক্রম ছিলেন তা নয়। তখন সাধারণ পরিবেশ ছিল তাই। সুভাষের ভাষায়, 'রাজনৈতিক অপরিপক্কতার' যুগ ছিল সেটা।

আর জওহরের আঁকা মোতিলালের ছবিতে আমরা কী দেখি? সেখানেও আমরা দেখি এক ব্যস্ত আইনজীবীকে। সংসারের অন্য কোন কাজে তো বটেই, বাইরের অন্য কোন কাজে যোগ দেওয়ার মতোও তাঁর সময় নেই। রাজনীতি তাঁকে আকর্ষণ করে না। কংগ্রেসের অধিবেশনে মাঝে মাঝে যাচ্ছেন, মানসিক দিক দিয়ে সমর্থন জানাচ্ছেন। এই পর্যন্ত। যত পসার বেড়েছে তত সাহেব-সুবোদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। বাড়িতে ছিল তাদের নিয়মিত যাতায়াত। পসার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারাও বদলেছে, ক্রমশ এসেছে বেশি পরিমাণে সাহেবিয়ানা। একমাত্র ছেলের জন্য রেখেছেন ইংরেজ গবর্নেস ও টিউটর। পরে পাঠিয়েছেন বিলেতে। মোতিলাল বরাবরই পছন্দ করতেন ইংরেজদের, তাঁর ভালো লাগত ইংরেজি আদবকায়দা। সেই ধারা ছেলেতে বর্তানোও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। জওহর তাই লেখেন: মনে মনে আমি ছিলাম বরং ইংরেজের গুণগ্রাহী।

সুভাষচন্দ্র এক সময় বাংলায় খুব সংক্ষেপে বাবার জীবনকথা লিখেছিলেন। জানকীনাথের চরিত্রের গুণাবলী তাঁকে যে মুগ্ধ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পিতা যেভাবে নিজের প্রচেষ্টায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন পুত্রকে তা অনুপ্রাণিত করেছিল। জানকীনাথের সমাজসেবা, দুস্থদের উদার হাতে সাহায্য, সত্যপ্রিয়তা, কর্তব্যপরায়ণতা যে সকলের অনুকরণীয় সে কথাও সুভাষ লেখেন। কিন্তু যাকে বলা যায় 'হিরো ওয়ারশিপ' বাবার সম্পর্কে সুভাষের মনোভাব ঠিক সেই ধরনের ছিল বলে মনে হয় না। আমি বড় হয়ে বাবার মতো হব—এমন কথাও শিশু বয়সে তিনি মনের মধ্যে লালন করেন নি।

জওহর কিন্তু কুণ্ঠাহীনভাবেই কবুল করেন যে তাঁর হিরো ছিলেন বাবা। শৈশবে জওহরও ভয় করতেন বাবাকে, কিন্তু ভালোও বাসতেন খুব। একমাত্র পুত্রের চোখে মোতিলাল ছিলেন শক্তি সৌন্দর্য আর বিচক্ষণতার প্রতীক। দারুণ মেজাজ ছিল তাঁর, ছিল উদ্ধত গর্ব। জীবনের যা কিছু উপাদেয় জিনিস তা উপভোগে অকুণ্ঠিত মোতিলাল। জওহরের মনে হয়েছে চেহারায় চালচলনে মোতিলাল ছিলেন রোমের সম্রাটদের মতো।

পরবর্তী জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রাম আর কংগ্রেসের কাজে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কিভাবে মোতিলাল জওহরলালের সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে তা আমরা সহজেই দেখতে পাই। সুভাষের জীবনে বাবার সঙ্গে এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ আসে নি। সুভাষের সঙ্গে অনেকটা একই ধরনের সম্পর্ক যেন গড়ে উঠেছিল তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্রের। শরৎ ছিলেন সুভাষের চেয়ে আট বছরের বড়, জওহরের সমবয়সী। কিন্তু তিনি ছিলেন সুভাষের কাছে দাদার চেয়ে অনেক বেশি। বন্ধু ও পরামর্শদাতা তো বটেই, সেই সঙ্গে যেন পিতৃস্থানীয়ও। আই সি এস থেকে ইস্তফা দেওয়া থেকে শুরু করে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সবচেয়ে সংকটের মুহূর্তেও আমরা শরৎকে দেখি সুভাষের পাশে। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হতে পারেন নি শরৎ কিন্তু সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদও পেয়েছিলেন। স্ত্রী বিভাবতীকেও নামতে হয়েছিল দেশের কাজে—তা অবশ্যই প্রধানত তাঁর রাঙা ঠাকুরপো অর্থাৎ সুভাষের আগ্রহে। বসুবাড়ির রাজনৈতিক ঐতিহ্য গড়ে তোলায় শরৎ-বিভাবতীর দানও কম ছিল না।

অন্তত ফ্র্যাঙ্ক মোরেস দেখাতে চেয়েছেন মোতিলাল যে আইন ব্যবসা আর সাহেবিয়ানা ছেড়ে ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিলেন, রাজনীতিতে নরমপন্থাকেও পিছনে ফেলে এগিয়ে চললেন, তার মূলে ছিল পুত্র জওহর। মোতিলাল আর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মাঝে যেন দাঁড়িয়েছিলেন জওহরলাল। গান্ধীজি যখন

অসহযোগ আন্দোলনের ডাক নিয়ে উদিত হলেন রাজনৈতিক দিগন্তে তখন এক গভীর দ্বন্দ্বে দীর্ণ হতে শুরু করলেন জওহর। এক দিকে পিতার প্রতি ভালোবাসা আর আনুগত্য, অন্য দিকে গান্ধীজির ডাকে সাড়া দেওয়ার আকুতি। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে দিলেন পিতাই। একমাত্র পুত্রের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সেই ছেলে যখন রাজনীতিতে চরমপন্থার দিকে পা বাড়ায় তখন উদ্বেগ বেড়ে যেতেই পারে। ছেলেকে সংযত করতে না পেরে মোতিলাল তাই অনেক ক্ষেত্রেই পা বাড়িয়েছেন ছেলের পথে।

সুভাষ ও শরতের ক্ষেত্রেও আমরা যেন একই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখি। অগ্রজ ও অনুজ সংগ্রাম করেছেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, কিন্তু অনেক সময়েই অনুজকে অনুসরণ করেছেন অগ্রজ। যেন দামাল ভাইকে সামাল দিতে পাশে থেকেছেন দাদা।

শিশিরকুমার বসুর ভাষায়ঃ রাঙাকাকাবাবুর (সুভাষের) প্রতি তাঁর (শরতের) মনের ভাব সম্বন্ধে আমরা দু'ধরনের কথা শুনতাম। এক, সুভাষকেই তিনি নিজের বড় ছেলের স্থান দিয়েছিলেন এবং তাঁর দাবি ছিল অনস্বীকার্য। দুই, নিজের ছেলেদের চেয়েও তিনি সুভাষকে বেশি ভালোবাসতেন। আমাদের কিন্তু এতে হিংসা হত না, গৌরবই হত।···রাঙাকাকাবাবুর নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, রাজনৈতিক প্রতিভা ও অতুলনীয় আত্মত্যাগের তুলনা তিনি সমসাময়িক কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখেন নি। বড় ভাই ছোট ভাইকে বুক ফুলিয়ে নেতা বলে স্বীকার করছেন—এ নজির ইতিহাসে আর আছে কিনা সন্দেহ।

ছয়

১৯২৮-২৯ সালটা ইংরেজ শাসকদের পক্ষে যে মোটেই স্বস্তিকর ছিল না তা সেই সময়ের গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট। গোয়েন্দা

বুরোর ডিরেক্টর ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মকালে এক রিপোর্টে লিখলেন : গত বিশ বছর ধরে আমি এ দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা দেখে আসছি, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা আর কখনও দেখিনি। বিপ্লবীদের সংখ্যা বাড়ছে, অনুগামীদের সংখ্যা বাড়ছে। জাতীয়তাবাদী নেতাদের কথাবার্তায় তারা উৎসাহ পাচ্ছে। কংগ্রেস, স্বরাজ্য দল, ইণ্ডিপেণ্ডেস পর্টির মতো সংগঠনে যে সব যুবক জড়িত রয়েছে তাদের মধ্যে সরকার-বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত জোরালো। এখন হিংসাত্মক কার্য-কলাপকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে।

লাহোরে বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়েছেন ইংরেজ পুলিশ ইন্সপেক্টর সনডার্স, দিল্লিতে আইন সভায় বোমা ছুঁড়েছেন ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত। ছাত্র যুব সমাজে দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য। ওদিকে বোম্বাই কলকাতায় সুতোকল আর চটকলে হাজার হাজার শ্রমিক নেমেছে ধর্মঘটে। সরকার ৩২ জন বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেপ্তার করলেন। কিছুদিন পরে শুরু হল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। জেলে রাজবন্দিদের অনশন আর যতীন দাসের মৃত্যুবরণ বাড়িয়ে তুলল উত্তেজনা।

সুভাষের এই বিশ্লেষণের মধ্যে কোন ভুল ছিল না যে, ১৯২৯ সালেই দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু করার মতো পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। তা হলে ছাত্র-যুব-শ্রমিক মহলে যে জাগরণ দেখা দিয়েছিল তাকে কাজে লাগানো যেত। আসলে ১৯২৮ সালের মে মাসেই সুভাষ ছুটে গিয়েছিলেন সবরমতী আশ্রমে গান্ধীজির কাছে। বলেছিলেন : সাইমন কমিশন বয়কটকে কেন্দ্র করে দেশে দেখা দিয়েছে নতুন উদ্দীপনা। আপনি আর সরে থাকবেন না, সামনে এসে দাঁড়ান, নতুন করে নেতৃত্ব দিন।

কিন্তু কংগ্রেস ১৯৩০ সালের আগে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিতে পারে নি। কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশের মানুষের নাড়ির স্পন্দন ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও ইংরেজ সরকারের অবশ্য অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে ভুল করেন নি। ১৯২৯ সালের অক্টোবরে লণ্ডন গেলেন

ভাইসরয় লর্ড আরউইন। ফিরে এসে ঘোষণা করলেন, ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন নিয়েই তিনি জানাচ্ছেন যে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়াই যাবতীয় সাংবিধানিক সংস্কারের লক্ষ্য। আরও ঘোষণা করলেন আরউইন: সাইমন কমিশনের সুপারিশ বিবেচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠক বসবে, তাতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা।

খুশির জোয়ার বয়ে গেল এই ঘোষণায় লিবারেল, মুসলিম লিগ, রাজরাজড়াদের মধ্যে। এমন কি কংগ্রেসের অনেক নেতাও খুব খুশি। হিন্দু মহাসভা, লিবারেল আর কংগ্রেসের কিছু নেতা সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকে বসে তৈরি করে ফেললেন যুক্ত ইস্তাহার। স্বাগত জানালেন বড়লাটের ঘোষণাকে, গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতেও যে তাঁরা রাজি সে কথা জানাতেও ভুললেন না। সেই ইস্তাহারে সই করলেন মহাত্মা গান্ধী, মোতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য, ডাঃ এম এ আনসারি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, তেজবাহাদুর সাপ্রু, অ্যানি বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ।

কিন্তু সুভাষ আর জওহর কী করলেন? প্রথমে ঠিক হল, তাঁরা কিছুতেই সই করবেন না, বরং প্রচার করবেন পাল্টা ইস্তাহার। কারণ ঐ যুক্ত ইস্তাহারের বক্তব্যে ঘোরতর আপত্তি দু'জনেরই। ইস্তাহারটিকে বামপন্থী গোষ্ঠীর কাছে কিছুটা গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য চারটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হল। গোলটেবিল বৈঠকে যাবতীয় আলোচনার ভিত্তি হবে ভারতকে পূর্ণ ডোমিনিয়নের মর্যাদা দান, কংগ্রেসের প্রতিনিধি থাকবে বেশি, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে আর এখন থেকেই ডোমিনিয়নের ধাঁচে চালাতে হবে দেশের শাসনকাজ।

এই সব শর্ত জুড়ে দেওয়ার ব্যাপারে অন্যতম প্রধান উদ্যোগী জওহর। কিন্তু তাতেও মন থেকে অস্বস্তি যাচ্ছে না। সব দল মিলে একটা মতৈক্যে পৌঁছনো গেছে বটে, কিন্তু কংগ্রেস যে পিছিয়ে আসছে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি থেকে, মেনে নিচ্ছে ডোমিনিয়ন

স্টেটাসের স্তোতবাক্য। একবার মনে হল, কংগ্রেসের ঐক্য বজায় রাখার কথা। বড় সংগ্রাম আসন্ন। এখন কি দলকে ভাঙতে দেওয়া উচিত? পরক্ষণেই আবার মনে হল, এই যুক্ত ইস্তাহার একটা অত্যন্ত তেতো বড়ি। কাগজে-কলমে সাময়িকভাবেও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ছেড়ে দেওয়া ভুল, বিপজ্জনক। স্বাধীনতার দাবি কি শুধুই একটা রাজনৈতিক রণকৌশলের প্রশ্ন, এ নিয়ে কি দর কষাকষি করা যায়, এই দাবি কি অনিবার্য নয়?

দ্বিধায় দীর্ণ হতে থাকলেন জওহর। তবু শেষ পর্যন্ত সই করলেন। আত্মচরিতে তাঁর সরল স্বীকারোক্তি: 'আমাকে বোঝাবার পর আমি শেষ পর্যন্ত সই করলাম। আমার এই রকমই স্বভাব।' এই বোঝানোর কাজটা নিয়েছিলেন প্রধানত গান্ধীজি, কিছু পরিমাণে মোতিলাল।

সুভাষকে কিন্তু কিছুতেই বোঝানো গেল না। লাহোরের সৈফুদ্দিন কিচলু, পাটনার আবদুল বারি আর সুভাষ মিলে প্রচার করলেন পাল্টা ইস্তাহার। বললেন, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য, গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাবও মেনে নেওয়া যায় না। সত্যিকার গোল টেবিল বৈঠক যদি করতে হয় তবে ভারতীয় প্রতিনিধিদের বাছাই করবে ভারতের মানুষ, ইংরেজ সরকার কেন? বড়লাটের প্রস্তাব একটা ফাঁদ ছাড়া কিছু নয়।

জওহর আর সুভাষের পথ কি পৃথক হতে শুরু করল এবার? এই যুক্ত ইস্তাহারের ঘটনায় সেই রকম আভাসই মেলে। কিন্তু এই নবেম্বর মাসেই আবার অন্য ঘটনা ঘটতেও দেখতে পাই। বড়লাটের স্তোকবাক্য যে নিছক স্তোকবাক্যও নয় তা বোঝা গেল বিলেতের পার্লামেন্টে ভারত নিয়ে আলোচনার সময়। রক্ষণশীল দলের মুখপাত্রেরা তো একের পর এক বক্তৃতায় বড়লাটের বক্তব্যকে উড়িয়ে দিলেন। এমন কি শ্রমিক দলভুক্ত প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের কথাতেও কোন আশ্বাস মিলল না।

১৬ নবেম্বর এলাহাবাদে বসল বিশেষ সর্বদল সম্মেলন। বড়লাটের ফাঁকা প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করার জন্য নেতাদের কঠোর সমালোচনা

করলেন জওহর আর সুভাষ। এমন কি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ইস্তফাও দিতে চাইলেন দু'জনে।

তবু মোহ কাটে না নরমপন্থীদের। তেজবাহাদুর সাপ্রু প্রস্তাব দিলেন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে আর একবার তাঁর বক্তব্য শোনা যাক। যেদিন আরউইনের সঙ্গে দেখা করার কথা ঠিক তার আগের দিন (২২ ডিসেম্বর) তাঁর ট্রেন বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। তবু বৈঠক হল। মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা তো বটেই, কংগ্রেসেরও নরমপন্থীরা বড়লাটের স্তোকবাক্য মেনে নিতে আবার রাজি। কিন্তু জওহর আর সুভাষ প্রবল বিরোধী, তাই শেষ পর্যন্ত গান্ধীজিও দাবি করলেন, অবিলম্বে ডোমিনিয়ন স্টেটাস ঘোষণার আরও নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি চাই।

লর্ড আরউইন তখন বললেন, তিনি আগে যা বলেছেন তার বেশি একটি কথাও বলতে পারবেন না। তারপর বৈঠক ভেঙে গেল।

জওহর যখন দ্বিধায় দুলছেন তখন গান্ধীজি যে তাঁকে যুক্ত ইস্তাহারে সই করাতে রাজি করাতে পেরেছিলেন তার কারণ ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছিল একটা বড় ঘটনা। কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি হিসেবে পাকা হয়ে গিয়েছিল জওহরের নাম। উদ্যোগী ছিলেন গান্ধীজিই। তিনি জওহরকে বললেন, তুমি কংগ্রেসের সভাপতি হতে যাচ্ছ, তুমি যদি এখন এই ইস্তাহারে সই না কর তবে এর দাম অনেক কমে যাবে। রাজি হয়ে গেলেন জওহর।

কিন্তু জওহরের এই স্বাক্ষরের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। লিগ এগেইনস্ট ইম্পিরিয়ালিজমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন জওহর ১৯২৬-২৭ সালে ইউরোপে থাকার সময়। জওহর সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের পথ নিয়েছেন, এই খবরে দারুণ ক্ষুব্ধ লিগ। তারা চাইল সই প্রত্যাহার করে নিন জওহর। চিঠি দিলেন লিগের সাধারণ সচিব বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্রিটিশ শাখার সচিব রেজিনাল্ড ব্রিজম্যান। সরোজিনী নাইডুর ভাই বীরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ দিন প্রবাসী। জওহর যখন হ্যারোয় পড়াশুনা করতেন বীরেন্দ্রনাথ

তখন অক্সফোর্ডে। জওহর নিজেই লিখেছেন: ইউরোপে যে দু'জন ভারতীয় রাজনৈতিক কর্মী তাঁর মনে রেখাপাত করতে পেরেছিলেন তাঁদের একজন বীরেন্দ্রনাথ (অন্যজন মানবেন্দ্রনাথ রায়)।

বার্লিনে লিগের আন্তর্জাতিক সচিবালয় থেকে জওহরকে চিঠি লিখলেন বীরেন্দ্রনাথ (৪ ডিসেম্বর ১৯২৯)। বললেন: যে বিশ্বাসঘাতকেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আপস আলোচনা চালাচ্ছে তাদের কাছে আত্মসমর্পণের ব্যাখ্যা হিসেবে তুমি অনেক কারণ দেখিয়েছ, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এর চেয়ে তুমি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগের পথ বেছে নিলে না কেন। তাতে দেশের মধ্যে তোমার স্থান আরও শক্তিশালী হত, সব যুব-শ্রমিক-কৃষক তোমার পাশে এসে দাঁড়াত আর তুমিও কংগ্রেসের মধ্যে আপস রক্ষার সব উদ্যোগকে পরাস্ত করতে পারতে।

আরও লিখলেন বীরেন্দ্রনাথ: জনগণের স্বার্থের চেয়ে কংগ্রেসের ঐক্য রক্ষা আরও বড় এ কথা ভাবার মধ্যে রয়েছে মূলগত রাজনৈতিক ভ্রান্তি। দেশের যুবসমাজের অবিসম্বাদী নেতা হয়ে উঠেছ তুমি, এমন কি শ্রমিক শ্রেণীর আস্থাও তুমি অর্জন করেছ, তবু এক দুর্বোধ্য দুর্বলতা আর মানসিক বিভ্রান্তির মুহূর্তে তুমি তোমার অনুগামীদের একেবারে পথে বসিয়ে দিলে মনে হচ্ছে। ...আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, দিল্লি ইস্তাহারে সই করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জনগণের প্রতি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।

লিগের এই প্রতিবাদ অবশ্য গ্রাহ্য করেন নি জওহর। তিনি বলেছিলেন দেশ আর কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এ অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। লিগের সদস্যপদ থেকে তিনি বহিষ্কৃত হলেন। এদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে লিগের সব সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যবস্থা করলেন জওহর।

লিগের প্রতিবাদের জবাবে যাই বলুন না জওহর, ইস্তাহারে সই করার পরও কিন্তু তাঁর দ্বিধা যায় নি। তা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠল এলাহাবাদ থেকে ৪ নবেম্বর গান্ধীজিকে লেখা তাঁর চিঠিতে।

বাপুজিকে যা লিখলেন জওহর তার মর্মার্থ : সই করে তিনি ভুল করেছেন।

গান্ধীজি জওহরকে বলেছিলেন দলের শৃঙ্খলা রক্ষার কথা। জওহর প্রশ্ন তুললেন। কংগ্রেসের তিনি সাধারণ সম্পাদক, তাঁকে শৃঙ্খলা মানতে হবে ঠিকই। কিন্তু তাঁর তো আরও কিছু পদ আছে, আছে আরও কিছু আনুগত্য? তিনি ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি, ইনডিপেণ্ডেন্স ফর ইণ্ডিয়া লিগের সচিব, যুব এবং অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তার কী হবে? গত পরশু সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সই করার পর) তাঁর মনের মধ্যে কী যেন একটা ছিঁড়ে গেছে, তিনি কিছুতেই আর জোড়া দিতে পারছেন না।

জওহর স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন বাপুজিকে : ঐ যুক্ত ইস্তাহার ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। কিছু ভদ্রলোককে আমাদের দলে রাখতে গিয়ে এমন অনেককে আঘাত দেওয়া এবং কার্যত আমাদের শিবির থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হল যাদের সঙ্গে পাওয়া আরও দরকার ছিল। আমার মনে হয় আমরা এক বিপজ্জনক ফাঁদে পা দিয়েছি, এই ফাঁদ থেকে বেরোন সহজ নয়। (সুভাষের পাণ্টা ইস্তাহারেও এই ফাঁদের কথা বলা হয়েছিল।)

জওহর তাই এ আই সি সির সাধারণ সম্পাদক পদে ইস্তফা দিতে চাইলেন। জানালেন, কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকেও তিনি নাম প্রত্যাহার করে নিতে চান।

গান্ধীজি সেই দিনই উত্তর দিলেন আলিগড় থেকে। লিখলেন : কী বলে তোমাকে আমি সান্ত্বনা দেব? অন্যের কাছে তোমার মনের অবস্থার কথা শোনার পর আমি কেবলই ভাবছি, তোমার উপর আমি কি অন্যায় চাপ দিয়েছি? আমার সর্বদাই মনে হয়েছে, তুমি যে কোন অন্যায় চাপের ঊর্ধ্বে। তোমার প্রতিরোধকে আমি সর্বদাই মান্য করেছি।...আমার আবেদনে তোমার বুদ্ধি বা হৃদয় যদি সাড়া না দেয় তবে অবশ্যই আমাকে বাধা দেবে। তার জন্য আমি তোমায় কম ভালোবাসব না।

জওহর যে ভেঙে পড়েছেন সে-কথা উল্লেখ করে বাপুজি লিখলেন : যদি অন্যায় কিছু করে না থাক তবে মুষড়ে পড়ছ কেন? কংগ্রেসের বর্তমান অন্যতম কর্মকর্তা আর পরের বছরের কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তোমার অধিকাংশ সহকর্মীর মিলিত সিদ্ধান্ত থেকে তুমি সরে আসতে পারো না।

সুভাষ দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরলেন ঐ চার তারিখেই। পরদিন দেশবন্ধু-পত্নী বাসন্তী দেবীর কাছে একটি ছোট চিঠি লিখলেন। বললেন : দিল্লিতে কী হয়েছে তা নিশ্চয়ই আপনি খবরের কাগজে পড়েছেন। মহাত্মার পরামর্শে স্বাধীনতার দাবি ত্যাগ করেছেন জওহরলাল।

বাসন্তী দেবীর কাছে সব কথা বলতে না পারলে যেন স্বস্তি পেতেন না সুভাষ। তাই দিল্লি বৈঠকের কথাও জানালেন। জওহরলালের সিদ্ধান্তে তাঁর হতাশার কথাটাও সামান্য কয়েকটি শব্দের মধ্যেই ফুটে উঠেছে।

১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির পদের জন্য উঠেছিল তিনটি নাম। অধিকাংশ প্রদেশ কংগ্রেসই চাইছিল, এবার সরাসরি গান্ধীজিই হাল ধরুন সংগঠনের। তারপরেই ছিল সর্দার প্যাটেলের নাম। শেষ নামটি জওহরের। কিন্তু গান্ধীজি নারাজ। তিনি চাইলেন জওহরকে। সর্দার প্যাটেলকে রাজি করালেন নাম প্রত্যাহার করতে (যেমন করিয়েছিলেন ১৯৩৬-৩৭ সালে, আবার ১৯৪৬ সালে)।

জুলাই মাসে গান্ধীজি খোলাখুলিই জানিয়ে দিলেন তিনি জওহরের পক্ষে। সেপ্টেম্বরে তাই জওহরের নির্বাচনের পক্ষে আর কোন বাধা রইল না। গান্ধীজি এই সময় এক দিন জওহরকে ডেকে বললেন : তোমার কি মনে হয়, এই দায়িত্ব পালন করার পক্ষে তোমার যথেষ্ট শক্তি আছে? জওহর উত্তর দিলেন : যদি এই দায়িত্ব আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে আমি সরে আসব না।

গান্ধীজির সিদ্ধান্তে সেদিন যদি অনেকে অবাক হয়ে থাকেন তবে তাতে অন্যায় কিছু ছিল না। কারণ, রাজনৈতিক পরিভাষায় জওহর সেই সময় ছিলেন 'চরমপন্থী'। গান্ধীজিও সে-কথা স্বীকার করলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, জওহর চরমপন্থী ঠিকই। কিন্তু তার কাণ্ডজ্ঞান যথেষ্ট, সে কখনোই এত দ্রুত এগোবে না যাতে ভাঙন দেখা দেবে। জওহরের হাতে দেশ নিরাপদ। আরও বললেন গান্ধীজি: তার ঐ চেয়ারে বসাও যা, আমার বসাও তাই।

গান্ধীজির পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়ে সেদিন কী মনে হচ্ছিল জওহরের? আত্মচরিতে খুব স্পষ্ট ভাষাতেই লিখেছেন তিনি: এই নির্বাচনে আমি যতটা বিরক্ত আর অপমানিত বোধ করেছিলাম তা আর কখনও বোধ হয় করি নি। আমি যে একটা বিরাট সম্মান পাচ্ছি তা যে আমি বুঝতে পারছি না তা নয়। যদি সাধারণ ভাবে আমি নির্বাচিত হতাম তবে আমি আনন্দে উৎফুল্লই হতাম। কিন্তু আমি প্রধান ফটক দিয়ে আসিনি, এমন কি পাশের ফটক দিয়েও নয়, যেন হঠাৎ একটা গোপন দরজা দিয়ে আবির্ভূত হলাম এবং দর্শকেরা অবাক হয়ে আমাকে মেনে নিল।

জওহরের এই মনোভাবের কারণ, লখনউয়ে এ আই সি সির বৈঠকে গান্ধীজি যখন কিছুতেই রাজি হলেন না তখনই জওহর নির্বাচিত হয়েছিলেন মহাত্মার অলিখিত নির্দেশে। তাঁর আত্মমর্যাদায় সেদিন তাই ঘা লেগেছিল। একবার মনে হয়েছিল, এই সম্মান ফিরিয়ে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেন নি।

জওহরের এই নির্বাচন বা মনোনয়নকে কীভাবে দেখলেন সুভাষচন্দ্র?

সাত

সুভাষচন্দ্র খুব স্পষ্ট ভাষাতেই লিখেছেন: কংগ্রেস সভাপতি পদে জওহরলালকে মনোনীত করে গান্ধীজি তাঁর নিজের দিক থেকে খুবই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা বামপন্থী বলে পরিচিত তাঁদের দিক থেকে এই মনোনয়ন খুবই পরিতাপের ব্যাপার।

জওহরলাল যখন একজন অগ্রগণ্য বামপন্থী বলেই পরিচিত তখন তাঁর মনোয়ন পরিতাপের বিষয় হয়ে উঠল কেন? সুভাষচন্দ্রের যুক্তি এই রকম: এই মনোনয়ন জওহরলাল আর গান্ধীজির মধ্যে একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়ার সূচনা করল। রাজনীতিতে আবির্ভাবের সময় থেকেই জওহর ছিলেন গান্ধীজির নীতির অনুসারী। দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল ভালো। কিন্তু ১৯২৭ সালের শেষে জওহর যখন ইউরোপ থেকে ফিরলেন তখন দেখা দিল একটা পরিবর্তন। সমাজতন্ত্রের কথা বলতে লাগলেন, গান্ধীজি ও অন্যান্য প্রবীণ নেতার সঙ্গে মতের অমিল ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন। সুভাষ অকপটেই স্বীকার করেছেন জওহরের অক্লান্ত উদ্যোগ ছাড়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগ এতটা গুরুত্ব অর্জন করতে পারত না। তাই বামপন্থীদের শক্তি হ্রাস করে নিজের ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য গান্ধীজি চাইলেন জওহরকে নিজের দিকে টেনে নিতে। জওহরের মনোনয়নে বামপন্থীদের অখুশির কারণ, কংগ্রেসে আধিপত্য থাকবে গান্ধীজির, যিনি সভাপতি হবেন তিনি থাকবেন নিতান্ত সাক্ষীগোপাল। নিজস্ব কর্মসূচী অনুযায়ী যদি কংগ্রেসকে পরিচালিত করা না যায় তবে এক জন বামপন্থী নেতার কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণ করে আর লাভ কী?

জওহরের এই মনোনয়নের ফলকে দু'দিক থেকে দেখেছেন সুভাষচন্দ্র। এক: বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে জওহরের দূরত্বের সূচনা হল। দুই: অতঃপর জওহর হয়ে দাঁড়ালেন মহাত্মার অকুণ্ঠ সমর্থক।

'অকুণ্ঠ সমর্থক' বলতে যদি বোঝায় জওহর এর পর থেকে গান্ধীজির সব বক্তব্যই সমর্থন করেছেন অথবা তাঁদের মধ্যে ১৯২৯ সালের পর আর কোন মতভেদ দেখা দেয় নি তবে বলতে হবে সুভাষচন্দ্রের ব্যবহৃত "আ কনসিসটেন্ট অ্যাণ্ড আনফেইলিং সাপোর্টার অব দা মহাত্মা" বিশেষণটি পুরোপুরি সঠিক নয়। কিন্তু মতভেদ দেখা দিলেও গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধকে জওহর কখনও চরম পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান নি বুদ্ধি ও বিবেকের তাগিদ সত্ত্বেও। তা আমরা পরে বারবারই দেখতে পাব। তার আগে আমরা দেখি লাহোর কংগ্রেসে কী ঘটল। সেই ঘটনাবলী থেকে কি বলা যাবে, বামপন্থী গোষ্ঠী আর জওহরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টিতে গান্ধীজি সফল হয়েছিলেন?

১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ইরাবতীর তীরে লাহোরের উপকণ্ঠে অধিবেশন মণ্ডপে সূচনা হয়েছিল কংগ্রেস সংগঠনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়। দু'বছর আগে মাদ্রাজে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হলেও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র বদল করে নতুন লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয় নি। তা করা হল লাহোরে। আর এই নতুন অধ্যায়ের সূচনায় পাদপ্রদীপের সামনে প্রধান ভূমিকায় জওহর। সাদা ঘোড়ায় চেপে এলেন সুদর্শন তরুণ সভাপতি, বয়স সবে চল্লিশ, দুপাশে যুব লিগের স্বেচ্ছাসেবীর দল, পিছনে হাতির সারি। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জওহর লিখেছেন: লাহোরের মানুষ সেদিন আমাকে যে চমৎকার সংবর্ধনা দিয়েছিল তা আমি কখনও ভুলতে পারব না। আমি জানতাম, এই উপচে পড়া উদ্দীপনা, এ তো শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য নয়, এ হল একটা প্রতীকের জন্য, একটা আদর্শের জন্য। তবু সাময়িকভাবে হলেও বহু মানুষের চোখে ও হৃদয়ে সেই প্রতীক হয়ে ওঠাটাও তো সামান্য ব্যাপার নয়।

ব্যক্তিগত দিক থেকেও লাহোর কংগ্রেস জওহরের জীবনে এক দিকচিহ্ন। পিতা মোতিলালের হাত থেকে তিনি নিলেন কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বভার। সংগঠনের ইতিহাসে এর নজির নেই। মোতিলাল স্বভাবতই দারুণ খুশি। সেদিন লাহোরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্তত কয়েক জনের মনে হয়েছিল, রাজা যেন শাসনদণ্ড তুলে দিচ্ছেন তাঁর উত্তরাধিকারীর হাতে।

লাহোর অধিবেশনের মুখে পরিবেশ সত্যিই হয়ে উঠেছিল বিদ্যুৎময়, দেশে সৃষ্টি হয়েছিল বিরাট প্রত্যাশা। ইংরেজের সঙ্গে সমঝোতার আশা নির্মূল হয়েছে। কংগ্রেস এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে সংগ্রামে। অধিবেশনের মধ্যেও উত্তেজনার অভাব ঘটে নি। গান্ধীজি ততদিনে সত্যি সত্যিই 'ইনডিপেনডেনসওয়ালা' হয়ে উঠেছেন। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তিনিই আনলেন। কিন্তু তবু সুভাষচন্দ্র এবং বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানো গেল না।

কিছুদিন আগে বড়লাটের ট্রেন বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। প্রাণে বেঁচে যান লর্ড আরউইন। গান্ধীজি প্রস্তাব আনলেন, বড়লাটের এই প্রাণরক্ষায় অভিনন্দন জানাচ্ছে কংগ্রেস। প্রতিনিধিদের একটা বিরাট অংশের মনে প্রশ্ন জাগল: একটা রাজনৈতিক প্রস্তাবের মধ্যে আবার বড়লাটকে এইভাবে অভিনন্দন জানানো কেন? সুভাষের ব্যাখ্যা: গান্ধীজি হয়ত এইভাবে বড়লাটকে খুশি করে ভবিষ্যৎ সমঝোতার পথ খোলা রাখতে চাইছিলেন। সুভাষের নেতৃত্বে বামপন্থীরা বেঁকে বসলেন। তাঁরা বললেন, এই প্রস্তাবের উপর ভোট নিতে হবে। গান্ধীজি মতৈক্যের জন্য আবেদন জানালেন। তাতে ফল হল না। তখন তিনি ব্যাপারটাকে দাঁড় করালেন তাঁর প্রতি আস্থার প্রশ্নে। প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত গৃহীত হল। কিন্তু গান্ধীজিও অবাক হয়ে গেলেন যখন দেখলেন তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে ৯৩৫টি ভোট পড়লেও বিপক্ষে পড়েছে এক-আধটি নয়, ৮৯৭টি ভোট।

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব তুললেন গান্ধীজি।

বললেন, এই অবস্থায় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে কোন লাভ নেই। স্বরাজ বলতে এখন থেকে বোঝাবে পূর্ণ স্বাধীনতা। সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার আন্দোলনে প্রথম ধাপ হচ্ছে আইনসভা বর্জন। সেই সঙ্গে দেওয়া হল আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করারও ডাক।

কিন্তু শুধু এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণে খুশি নন সুভাষ। তিনি আনলেন সংশোধন। বরং পাল্টা প্রস্তাব বলাই ভালো। সুভাষ বললেন, কোন অবস্থাতেই আলোচনা করা চলবে না ইংরেজদের সঙ্গে। পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণাকে স্বাগত জানালেন সুভাষ, কিন্তু সংগ্রামের নির্দিষ্ট কর্মসূচী কোথায়? তাই তিনি প্রস্তাব আনলেন, পাল্টা সরকার গঠন করতে হবে, তার ভিত্তি হবে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি আর এই উদ্দেশ্যে সংগঠিত করতে হবে শ্রমিক কৃষক আর যুব সম্প্রদায়কে। তিনি বললেন, আমি চরমপন্থী। হয় আমার সব চাই, অথবা কিছুই চাই না।

গান্ধীজি কিন্তু এই ধরনের সংশোধন মানতে মোটেই রাজি হলেন না। বললেন, আমার প্রস্তাব হয় পুরোটাই মানতে হবে, না হয় পুরোটাই বাতিল করতে হবে। পাল্টা সরকার গঠনের প্রস্তাব তাঁর মতে অবাস্তব। সুভাষের সংশোধন অগ্রাহ্য করার ডাক দিলেন তিনি। অগ্রাহ্যই হল সেই প্রস্তাব।

এই যে বিরাট বিতর্ক চলছিল কংগ্রেস অধিবেশনে তাতে নতুন সভাপতির ভূমিকা কী ছিল? জওহরের গুণমুগ্ধ জীবনীকার মাইকেল ব্রেশার লিখছেন: এই গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের সময় জওহর ছিলেন নীরব। মনের দিক থেকে তাঁর সহানুভূতি ছিল সুভাষের বক্তব্যের দিকে, কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনার দিক থেকে তিনি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন গান্ধীজির প্রস্তাবের দিকে। কারণ গান্ধীজির প্রস্তাবে পূর্ণ স্বাধীনতা আর সংগ্রামের কথা বলা হয়েছিল। তা ছাড়া সভাপতি হিসেবে তিনি গান্ধীজি বা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের প্রকাশ্য বিরোধিতায় নামতে পারেন না।

জওহরের আত্মচরিতে আমরা দেখি যে সুভাষ বা অন্যান্যরা যেসব

সংশোধন প্রস্তাব এনেছিলেন তাকে তিনি তেমন গুরুত্ব দিতে চান নি। মূল প্রস্তাবটি যে প্রায় বিনা বাধায় গৃহীত হয়েছিল তাতেই তিনি খুশি। সুভাষ অবশ্যই ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থে সংশোধন প্রস্তাব আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন যথোচিত। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী গোষ্ঠীর ভাবনাচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে এগুলির গুরুত্ব অস্বীকারও করা যায় না। সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যাওয়ার পর সুভাষ লিখলেন: কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য গ্রহণ করল বটে, কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য কোন পরিকল্পনা তৈরি করা হল না—আগামী বছরের জন্য গৃহীত হল না কোন কর্মসূচী। এর চেয়ে হাস্যকর অবস্থা আর কল্পনা করা যায় না।

জওহরের আত্মচরিতে আমরা যেন এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, যদিও তা সুভাষের মন্তব্যের মতো স্পষ্টোচ্চারিত নয়। জওহর লেখেন: 'চাকা ঘুরতে শুরু করেছে, কিন্তু কখন এবং কেমন করে আমরা শুরু করব সে বিষয়ে তখনও আমরা অন্ধকারে। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংগ্রামের ছক তৈরি করার, কিন্তু সকলেই জানতাম আসল সিদ্ধান্ত নেবেন গান্ধীজি।' আবার লিখছেন: 'ভবিষ্যৎ তখন আমাদের কাছে অস্পষ্ট। কংগ্রেস অধিবেশনে যথেষ্টই উৎসাহ দেখা গেছে, কিন্তু সংগ্রামের কর্মসূচীতে দেশ কীভাবে সাড়া দেবে তা কেউই জানে না। আমরা আমাদের নৌকো পুড়িয়ে ফেলেছি, ফেরার পথ নেই, কিন্তু আমাদের সামনে যে দেশ দেখতে পাচ্ছি তা যেন অজ্ঞাত, অপরিচিত।'

সভাপতি হিসেবে জওহর যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে অবশ্য সংগ্রামের ডাক ছিল। জওহর বললেন: সাফল্য বললেই আসে না। কিন্তু যারা সাহস করে সংগ্রামে নামে তারাই প্রায়শ সফল হয়। যারা ভীতু, যারা পরিণামের কথা ভেবে সন্ত্রস্ত তারা কদাচিৎ সফল হয়।

জওহরের ভাষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গান্ধীজির মতের বিরুদ্ধে কথা বলতে তিনি প্রস্তুত, যদিও স্বভাব অনুযায়ী তিনি

আপসের একটা পথ যেন রেখে দেন। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে তাঁর বিশ্বাসের কথা তিনি ঘোষণা করেন অকপটে। ভারতকে যদি দারিদ্র্য দূর করতে হয় তবে এই পথেই যেতে হবে। তবে কংগ্রেস এখনই পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী নিতে পারে না। আগে স্বাধীনতা, পরে সমাজতন্ত্র। কৃষক শ্রমিকের স্বার্থে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের ডাক দিলেন জওহর। সমাজের সম্পদের অছি হয়ে থাকবে ধনীরা—গান্ধীজির এই নীতির সমালোচনা করলেন। অছি যদি কেউ হতে পারে তবে তা গোটা দেশ বা জাতি। হিংসার প্রশ্নেও দেখা গেল তাঁর মত পুরোপুরি গান্ধীজির অনুগামী নয়। তিনি বললেন: আমার মনে হয়, হিংসার প্রশ্নটিকে আমরা অধিকাংশই শুধু নৈতিক দিক থেকে বিচার করি না, বিচার করি ব্যবহারিক দিক থেকে। আমরা যদি হিংসার পথ পরিহার করি তবে করি এই কারণে যে তাতে বিশেষ ফল পাওয়া যাবে না। কিন্তু কংগ্রেস যদি মনে করে হিংসার পথে গেলে আমরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পাব তবে আমার সন্দেহ নেই যে কংগ্রেস সেই পথই নেবে। হিংসা খারাপ, কিন্তু দাসত্ব আরও খারাপ।

গান্ধীজি যাঁকে সভাপতির পদে মনোনীত করেছেন তাঁর পক্ষে এই ধরনের কথা বলার মধ্যে নিশ্চয়ই সাহসের পরিচয় ছিল। কিন্তু চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে পার্থক্য সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে গান্ধীজির বিপক্ষে তিনি যেতে অপারগ। তা স্পষ্ট হয়ে উঠল লাহোরেই নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সময়। আর এই প্রসঙ্গে জড়িত সুভাষেরই নাম।

এ আই সি সির বৈঠক বসল পয়লা জানুয়ারি। উদ্দেশ্য ওয়ার্কিং কমিটি গঠন। সভাপতিরই কাজ ওয়ার্কিং কমিটি গঠন। কিন্তু পনেরটি নাম প্রস্তাব করলেন গান্ধীজি। দেখা গেল, এই তালিকায় বামপন্থী বলে যারা পরিচিত তাঁদের নাম নেই। নেই সুভাষের নাম, নেই শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের নাম। গান্ধীজি যখন সভাপতি পদে জওহরের নাম প্রস্তাব করেছিলেন তখন বলেছিলেন: "অধিনায়ক পদে জওহরলালের মনোনয়ন যুবসমাজের প্রতি দেশের আস্থার প্রমাণ।

জওহর একা বিশেষ কিছু করতে পারবে না। দেশের যুবসমাজের হাত দিয়েই সে কাজ করবে, তাদের চোখ দিয়েই দেখবে। যুবসমাজ যেন এই আস্থার যোগ্য হয়ে ওঠে।" গান্ধীজি নিশ্চয়ই তখন সুভাষকে যুবসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে ভাবতে পারেন নি, যদিও সুভাষ জওহরের চেয়ে বয়সে আট বছরের ছোট!

বামপন্থীরা অবশ্য বিনা প্রতিবাদে ব্যাপারটা মেনে নিলেন না। তাঁরা সংশোধন প্রস্তাব আনলেন। দাবি উঠল: অন্তত সুভাষ আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে কমিটিতে রাখা হোক। গান্ধীজি মানতে নারাজ। সভাপতি হিসেবে জওহর বললেন, সংশোধন প্রস্তাব বৈধ নয়। বললেন, যাঁরা গান্ধীজির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন (পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের সংশোধনের কথাই বলতে চেয়েছেন জওহর) তাঁদের কমিটিতে নেওয়া বিচক্ষণতার পরিচয় হবে না। কারণ তা হলে অচল অবস্থা দেখা দিতে পারে, ব্যাহত হতে পারে আসন্ন সংগ্রাম।

সুভাষের মন্তব্য: সব মিলিয়ে লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মার পরিপূর্ণ জয় সূচিত হল। বামপন্থী গোষ্ঠীর অন্যতম অগ্রগণ্য মুখপাত্র জওহরলাল নেহরুকে তিনি নিজের দিকে টেনে নিলেন আর ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ দিলেন বাকি সকলকে। অতঃপর তিনি নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতে পারবেন, ক্যাবিনেটের (অর্থাৎ ওয়ার্কিং কমিটি) মধ্যে কোন বিরোধিতার আশঙ্কাও আর রইল না।

ক্ষুব্ধ সুভাষ পরের দিনই (২ জানুয়ারি) গঠন করলেন কংগ্রেস গণতান্ত্রিক দল। পৃথক কোনও দল অবশ্য এটা নয়, কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কাজ করবে তাঁর সমমতাবলম্বীদের নিয়ে। বাসন্তীদেবীর কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে চাইলেন আশীর্বাদ। জানালেন, অবস্থার চাপে আর সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে এই দল গড়তে হল, যেমন গয়া অধিবেশনের (১৯২২) পর গড়েছিলেন দেশবন্ধু।

এই গোষ্ঠী অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ক'দিন পরে নিজেরই জন্মদিনে গ্রেপ্তার হলেন সুভাষ। শুরু হল তৃতীয়বারের কারাবাস।

আট

সুভাষ তখন অস্ট্রিয়ায়। খবর এল জওহর আবার কংগ্রেস সভাপতি হচ্ছেন লখনউ অধিবেশনে। খুশি হলেন সুভাষ। বাডগাস্টাইন থেকে জওহরকে চিঠি লিখলেন (৪ঠা মার্চ ১৯৩৬) : আজকের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই কংগ্রেসকে প্রগতিশীল পথে নিয়ে যেতে পারো বলে আমরা ভরসা করতে পারি। তা ছাড়া তুমি এমন একটা জায়গায় আছ যার সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। আর আমার মনে হয় মহাত্মা গান্ধীও তোমার সঙ্গে যতটা মানিয়ে নেবেন অন্য কারো সঙ্গে তা নেবেন না। আমি অন্তরের সঙ্গে আশা করি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তোমার রাজনৈতিক শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার তুমি করবে। তুমি অখুশি হতে পার এমন কোন সিদ্ধান্তই গান্ধীজি কখনও নেবেন না।

এর আগে ইউরোপে থাকতেই দেখা হয়েছিল জওহর ও সুভাষের। কিছু কথাবার্তাও হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সুভাষ লিখলেন : তোমার সঙ্গে যে কথা হয়েছে সেই মতো আমি একটা বিবৃতি দেব কিনা ভাবছি। আমার মনে হয় আমার দেওয়া উচিত কারণ আবার আমার জেলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আমার মতামত জানতে চায়। আমি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বিবৃতিই দেব আর স্পষ্টভাবেই বলব যে তোমাকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তই আমি গ্রহণ করেছি।

কংগ্রেসের পরবর্তী কর্মসূচী কী হওয়া উচিত তা নিয়েও কথা হয়েছিল দুই নায়কের। তাই সুভাষ লিখলেন : এখন জওহরের প্রধান কাজ হবে দুটো। প্রথম হচ্ছে, কংগ্রেস যাতে সরকারে যোগ না দেয় তার ব্যবস্থা করা আর দ্বিতীয় হচ্ছে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে আরও বিভিন্ন ধরনের নেতাকে নিয়ে আসা। জওহর

যদি তা করতে পারেন কংগ্রেস এখন যে হতাশা আর দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে তা দূর হবে। সুভাষের মতে, আরও যেসব বড় বড় সমস্যা রয়েছে সেগুলি নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে, কিন্তু হতাশা থেকে কংগ্রেসকে বাঁচাতে হবে এখনই। জওহর যে কংগ্রেসের একটা বিদেশ দপ্তর চালু করতে চান তাতেও খুশি সুভাষ, কারণ তাঁরও একই ইচ্ছে। চিঠির শেষে জওহরকে আশস্ত করেন সুভাষ: যদি আমি লখনউ পৌঁছতে পারি তবে আমার সব সাহায্যই পাবে।

কিন্তু সুভাষ কি পৌঁছতে পারবেন লখনউ? দেশে তো ফিরতেই চান সুভাষ। তিন বছরেরও বেশি হয়ে গেল ইউরোপে নির্বাসিত তিনি। বোম্বাই থেকে পুলিশ জাহাজে তুলে দিয়েছিল সেই ১৯৩৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। আগের বছর জানুয়ারি মাসে যখন কলকাতা ফিরছিলেন বোম্বাই থেকে তখন কল্যাণে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। (জওহর, বল্লভভাই, গান্ধীজিও গ্রেপ্তার হন একই সময়ে।) প্রথমে সেওনি জেল, তারপর জব্বলপুর, সেখান থেকে মাদ্রাজ জেল। কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি তো হয়ই না, বরং আরও খারাপ হয়। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে বললেন আরও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তাঁকে থাকতে দেওয়া হোক, সম্ভব হলে দেশের বাইরে। ইংরেজ সরকার অক্টোবরে তাঁকে পাঠালেন উত্তরপ্রদেশের ভাওয়ালি স্যানাটোরিয়ামে। তাতেও কোন উপকার হল না। সরকার বললেন, মুক্তি দিতে পারি, কিন্তু দেশে থাকা চলবে না, চলে যেতে হবে দেশের বাইরে, নিজের খরচে। যাওয়ার আগে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত দেওয়া হল না। শুধু কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন জেলে গিয়ে দেখা করে এলেন। তারপর কড়া পুলিশ পাহারায় উঠলেন এস এস গ্যাঞ্জেস জাহাজে।

তারপর একবারই মাত্র দেশে ফিরেছিলেন ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে। পিতা মৃত্যুশয্যায়, তাই টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল। করাচি হয়ে সুভাষ যখন কলকাতা পৌঁছলেন তখন সব শেষ। জানকীনাথ মারা গেছেন আগের দিন। পিতৃবিয়োগের আঘাত তো ছিলই, সেই সঙ্গে জারি করা হল ১৮১৮ সালের সেই কুখ্যাত

রেগুলেশন থ্রি অনুযায়ী আদেশ: বাড়ি থেকে বেরোন নিষেধ, বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ, চিঠিপত্র, বইপত্র পাওয়ার ওপরেও নিষেধাজ্ঞা। যদি এই আদেশ অমান্য করা হয় তবে সাত বছর পর্যন্ত জেল, সেই সঙ্গে জরিমানা।

এই নিষ্ঠুর আদেশকে জওহর তাঁর আত্মচরিতে বর্ণনা করেছেন 'বিস্ময়কর' বলে। তিনি লিখেছেন: এই আদেশ তো এমনিতেই সব মানবিকতা, সব বিবেচনা বর্জিত। এই আদেশ এমন একজন মানুষের উপর জারি করা হল দেশের অসংখ্য মানুষ যাঁকে ভালোবাসে, যাঁকে শ্রদ্ধা করে, যিনি নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও ছুটে এসেছেন পিতার মৃত্যুশয্যায়। এই যদি সরকারের মনোভাব হয় তবে তো নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে আমার মুক্তি পাওয়ার কোন আশাই নেই!

জওহরও সেই সময় জেলে। সপ্তম কারাবাস। জেলে গেছেন ১৯৩৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। দু বছরের কারাদণ্ড। এদিকে স্ত্রী কমলা অসুস্থ। জওহরকে আভাস দেওয়া হচ্ছিল, তিনি যদি তাঁর কারাবাসের বাকি মেয়াদের মধ্যে রাজনীতিতে জড়াবেন না বলে আশ্বাস দেন তবে কমলার পরিচর্যার জন্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। কমলার অবস্থা ক্রমশই যাচ্ছে খারাপের দিকে। কমলার এই জীবনমরণ সমস্যায় জওহর যদি পাশে থাকেন তবে নিশ্চয়ই খুব ভালো হয়। তবু ঐ ধরনের কোন আশ্বাস দেওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না জওহর। তা হলে যে তাঁর এত দিনের বিশ্বাস, এত দিনের আদর্শের মূলেই টান পড়বে। এক দিকে অসুস্থ স্ত্রী, অন্য দিকে আদর্শ-বিশ্বাস। আবার চরম মানসিক সংকটে পড়লেন জওহর। কিন্তু সংকট মিটিয়ে দিলেন কমলা নিজেই। জেল থেকেই এক দিন (অক্টোবর ১৯৩৪) জওহরকে নিয়ে যাওয়া হল কমলাকে দেখতে। খুব জ্বর, আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। দেখার পর জওহর আবার ফিরে যাচ্ছেন জেলে। মুখে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে জওহরকে বললেন কমলা: তুমি সরকারকে আশ্বাস-টাশ্বাস কী দেবে শুনছি? কোনও আশ্বাস দিও না!

কিন্তু কমলার অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল। তাঁকে পাঠানো হল ভাওয়ালি স্যানাটোরিয়ামে। তাতেও ফল না হওয়ায় পরের বছর মে মাসে ঠিক হল তাঁকে ইউরোপে পাঠানো হবে। আলমোড়ার জেল থেকে স্ত্রীকে বিদায় জানাতে এলেন জওহর। আবার ফিরে গেলেন জেলে। মনে সর্বদাই দুশ্চিন্তা: কমলাকে আর দেখতে পাবেন তো? মাস কয়েক পরে খবর এল, কমলার অবস্থা সংকট-জনক। ইংরেজ সরকার দয়া পরবশ হয়ে জওহরকে মুক্তি দিল সেপ্টেম্বরে। জওহর বিমানে গেলেন সুইজারল্যাণ্ড হয়ে জার্মানির বাডেনওয়াইলারে। ইউরোপে থাকার সময়েই দেখা হয়েছিল সুভাষের সঙ্গে। কথাবার্তা হয়েছিল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে।

জওহর আবার কংগ্রেস সভাপতি হচ্ছেন। আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার পর দেশে যে হতাশার আবহাওয়া তৈরি হয়েছে তা দূর করার একটা সুযোগ আসছে। তাই দেশে ফিরতে আগ্রহী সুভাষ। এমন সময় এল ভিয়েনায় ব্রিটিশ কনসালের কাছ থেকে এক চিঠি। তাতে কড়া হুঁশিয়ারি। ভারত সরকার সংবাদ-পত্রে দেখেছে সুভাষ দেশে ফিরতে চান। ব্রিটেনের বিদেশ সচিবের নির্দেশ অনুযায়ী তাই সুভাষকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, যদি তিনি দেশে ফেরেন তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে।

চিঠি যখন পেলেন তখন সুভাষ জাহাজ বা বিমানের টিকিট কাটার কথা ভাবছিলেন। এখন তিনি কী করবেন? ঐ হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও কি দেশে ফিরবেন, ফিরে আবার গ্রেপ্তার হবেন? নাকি হুঁশিয়ারিতে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবেন? কার্ সঙ্গে পরামর্শ করা যায় এ ব্য'পারে?

আবার জওহরলালকেই চিঠি লিখলেন সুভাষ (১৩ মার্চ, ১৯৩৬): এখানে অথবা ইউরোপে এমন কেউ নেই যার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি পরামর্শ করতে পারি। তোমার নিজের মনোভাব থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছে ঐ হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করে

দেশে ফিরে যাওয়া। শুধু এই কথাটাই ভাবতে হবে কোন্ পথটা জনস্বার্থের দিক থেকে সঠিক হবে। ব্যক্তিগত দিকটা আমি মোটেই ভাবি না, জনস্বার্থে যা প্রয়োজন তা করতেই আমি রাজি। রাজনীতি থেকে আমি এত দিন দূরে সরে আছি যে, ঠিক কোন্ পথটা জন-স্বার্থের পক্ষে সঠিক হবে তা আমার পক্ষে বোঝা কঠিন। আমি জানি, তোমার পক্ষেও অন্য কাউকে এই অবস্থায় পরামর্শ দেওয়া কঠিন। তবে তুমি ব্যক্তিগত দিকটা ভুলে যেতে পারো এবং শুধু জনস্বার্থের দিক থেকে একজন রাজনৈতিক কর্মীকে পরামর্শ দিতে পারো।

সুভাষ আরও লিখলেন: লখনউ কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য যখন তিনি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত করেন তখনই তিনি জানতেন দেশে পৌঁছলেই তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা আছে। তবে এমন একটা সম্ভাবনার কথাও তাঁর মনে হয়েছে যে হয়ত তাঁকে মুক্ত রাখা হবে, অন্তত কিছুদিনের জন্য। এখন আর সে সম্ভাবনা রইল না। এখন দেশে ফেরার অর্থই হল কারাবাস। অবশ্যই, জেলে যাওয়ারও একটা উপকারিতা আছে। তা ছাড়া সরকারি আদেশ অগ্রাহ্য করে কারাবরণ করার সপক্ষেও অনেক কিছু বলার আছে। তবু ঠিক কী করা উচিত? সুভাষ পরামর্শ চান জওহরের কারণ, "দেশের রাজনৈতিক জীবনে তুমি একটা অসাধারণ স্থান অধিকার করে আছ, এই রকম বিচিত্র অবস্থায় পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব তুমি এড়িয়ে যেতে পারো না।" কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ, সুভাষ লিখলেন: আমি আর কারো কথা ভাবতে পারি না যার প্রতি আমার আরও বেশি আস্থা আছে। সময় এত অল্প যে অনেক লোকের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারছি না। আমার নিজের আত্মীয়স্বজনকে জিজ্ঞেস করেও লাভ নেই। এটা খুবই সম্ভব যে তারা হয়ত শুধু জনস্বার্থের দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করবেন না। সুতরাং আমার একমাত্র পথ তোমার পরামর্শের উপর নির্ভর করা।

সুভাষকে দেশে ফিরতে দিতে হবে, এই দাবি ক্রমশই জোরদার

হচ্ছিল দেশের মধ্যে। ব্রিটিশ সরকার যখন নতুন করে আবার নিষেধাজ্ঞা জারি করলে তখন প্রসঙ্গটি উঠল কেন্দ্রীয় আইনসভাতেও (২৩ মার্চ)। তুললেন নীলকণ্ঠ দাস। উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব হ্যালেট যা বললেন তা থেকে বোঝা গেল সরকারের সুভাষ-আতঙ্কের কারণ। ১৯২৪ সালে সুভাষের গ্রেপ্তারের পর দুই বিচারক অনেক খোঁজ খবর করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সুভাষ নাকি এক বিপ্লবী চক্রান্তের শরিক, যদি তাঁকে মুক্ত থাকতে দেওয়া হয় তবে তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারেন, বিশেষ করে তিনি যখন রাজনীতিতে অধিকার করে আছেন একটি বিশিষ্ট স্থান, আর তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতাও অসাধারণ। সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত যোগাযোগ রেখে চলেন, সরকারি কর্মীদের হত্যা ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও তিনি অবহিত। লাহোর কংগ্রেসে তিনি পাল্টা সরকার গঠনের কথা বলেছিলেন, কম্যুনিজমের আদর্শ প্রচার করেছিলেন। যুগান্তর দলের নেতা সুভাষ। এই যুগান্তর দলই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পাহাড়তলির হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির জন্য দায়ী।

শুধু তাই নয়, অভিযোগের আর এক ফর্দ পেশ করলেন স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার হেনরি ক্রেইক। ১৯৩২ সালে সুভাষ গঠন করেছিলেন সাম্যবাদী সঙ্ঘ। পরে সেটিই পরিণত হয়েছে হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মিতে (যার প্রতিষ্ঠাতা শহিদ ভগৎ সিং)। ভিয়েনা থেকে পাওয়া গেছে সুভাষের নিজের হাতের লেখা একটি প্রচার পুস্তিকা। সেনা ও পুলিশ বাহিনীতে ভাঙন ধরিয়ে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত করার চেষ্টা করা হয়নি বলে পরিতাপ করা হয়েছে ঐ পুস্তিকায়। আরও বলা হয়েছে, যদি রাজস্ব আদায় বন্ধ করে দেওয়া যায় আর সঙ্কটের সময় সরকার কোন আর্থিক বা সামরিক সাহায্য না পায় তবেই জাতীয় আন্দোলন সফল হবে।

তাই স্যার হেনরি বললেন: এই ভদ্রলোক অবশ্যই সন্ত্রাসবাদীদের

সঙ্গে জড়িত। আমরা যতদূর জানি সশস্ত্র বিপ্লবের একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাঁর আছে। সুভাষের মতো বুদ্ধি ও সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষকে মুক্তি দিয়ে তার পরিকল্পনা কার্যকর করার সুযোগ দিলেও ভারত সরকার চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুভাষচরিতে এক দিক থেকে ঠিকই লিখেছেন, শত্রুপক্ষের মুখ থেকে এমন অভিযোগ তো দেশপ্রেমিকের কাছে প্রশংসাপত্রেরই সামিল। তবু সেদিন আইন-সভায় প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন ভুলাভাই দেশাই, নীলকণ্ঠ দাস আরও অনেকে। বলেছিলেন, এই ধরনের অভিযোগের প্রমাণ কোথায়? যদি প্রমাণ সরকারের হাতে থাকে তবে সুভাষের বিচার করা হোক। আর যদি প্রমাণ না থাকে তবে দেশে ফিরতে দেওয়া হোক তাঁকে।

মূলতুবি প্রস্তাব গৃহীতও হল স্বল্প ভোটের ব্যবধানে (৬২-৫৯)। কিন্তু ইংরেজ সরকার অনড়। সুভাষ হুঁশিয়ারির পরোয়া না করে ইউরোপ থেকে লয়েড ট্রিস্টিনো কোম্পানির জাহাজে চাপলেন মার্চের সাতাশ তারিখে। বোম্বাইয়ে পৌঁছলেন ৮ এপ্রিল। পুলিশ প্রস্তুত হয়েই ছিল। গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দিল পুনের কাছে জরবেদা জেলে। বাজেয়াপ্ত করল তাঁর পাসপোর্ট। গ্রেপ্তারের আগে দেশবাসীর উদ্দেশে বলে গেলেন: স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উঁচু করে রেখ।

ক'দিন পরেই বসল লখনউয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন। সভাপতি জওহরলাল সুভাষকে করে নিলেন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। দেশে ফেরার আগে পরামর্শ চেয়ে সুভাষ যে চিঠি লিখেছিলেন তার উত্তরে জওহর কী লিখেছিলেন তা জানা যায় না। তবে লখনউ থেকে পাঠিয়েছিলেন সমবেদনা আর সহানুভূতির বার্তা।

জওহরের দ্বিতীয়বারের সভাপতিত্বের আমলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন বটে সুভাষ, কিন্তু কোন বৈঠকেই যোগ দেওয়া হল না। কারণ তখন তিনি আটক। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটির দক্ষিণপন্থী সদস্যদের সঙ্গে জওহরলালের তীব্র মতবিরোধকে

কেন্দ্র করে যে গুরুতর সংকট ঘনিয়ে উঠল সেখানে কোন ভূমিকাই নিতে পারলেন না সুভাষ।

নয়

১৯৩৬ সালে ইউরোপ থেকে দেশে ফেরার আগে সুভাষচন্দ্র যে দুটি চিঠি জওহরলালকে লেখেন তা পড়ে আমরা যদি প্রথমে কিছুটা বিস্মিত হই তবে সেটা অস্বাভাবিক হয় না। কারণ এই চিঠি লেখার বছরখানেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে সুভাষের প্রথম গ্রন্থ 'দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'। আর সেই গ্রন্থ জুড়ে রয়েছে জওহরলালের সমালোচনা।

ইউরোপে এসেছেন চিকিৎসা করাতে, কিন্তু তার মধ্যেও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজ থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে রাখতে পারছেন না। সেই ব্যস্ততার সময়েই অতি দ্রুত তিনি রচনা করলেন দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্—তাঁর চোখে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীর প্রথম পর্ব (১৯২০ থেকে ১৯৩৪)। ইউরোপে নির্বাসনের আগে যখন সুভাষ গ্রেপ্তার হন তখন কিছুদিন তাঁকে থাকতে হয় মাদ্রাজ জেলে। সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন মুকুন্দলাল সরকার। মুকুন্দলালের বিবরণ থেকে জানা যায়, ঐ জেলেই সুভাষ 'দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্' বইটির প্রথম খসড়া তৈরি করেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা শ' খানেক। খসড়াটি জেল থেকে লুকিয়ে বাইরে চালান করা হয়। আর কোয়েম্বাটর থেকে নাকি ছাপানোও হয়। কিন্তু এই বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। সুভাষ তাঁর বইয়ের ভূমিকায় এ ধরনের কথা বলেন নি, ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে লণ্ডন থেকে প্রকাশের আগে এই বইয়ের আর কোন গুপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল বলেও জানা যায় না। ১৯৩৪ সালে প্রধানত ভিয়েনায় থাকার সময়ই বইটি রচিত। শ্রীমতী এমিলি শেঙ্কল তখন সুভাষের সচিব হিসেবে কাজ

করতে শুরু করেছেন। তিনি দিনে তিন-চার ঘণ্টার জন্য আসতেন, সুভাষের ডিক্টেশন নিতেন, তারপর টাইপ করতেন। বইটি যখন ছাপা হচ্ছে এবং প্রুফ দেখার পালা চলছে তখন সুভাষকেও কিছু দিনের জন্য দেশে আসতে হয় পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে। একে দ্রুততার মধ্যে লেখা, প্রুফ বিশেষ সংশোধনেরও সুবিধা পান নি সুভাষ। এমিলিই দায়িত্ব নেন প্রুফ দেখার।

'দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্' বইটি তখন আরও অনেকের মতো জওহলালও পড়েন। পড়ে চিঠি লেখেন সুভাষকে। বইটিতে যেসব ভুল ত্রুটি চোখে পড়েছে তাঁর, সে কথা জানান। সুভাষ সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেন (৪ঠা অকটোবর ১৯৩৫) ধন্যবাদ জানিয়ে। ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে ভালোই করেছেন জওহর। সন-তারিখ-ঘটনার অনেক ভুলই থাকতে পারে, তবে সুভাষ আশা করেন বিরাট কোন ভুল নেই। আসলে হয়েছে কি—সুভাষ জানান জওহরকে—প্রধানত স্মৃতিশক্তির উপর ভরসা করেই লিখতে হয়েছে, সন-তারিখের ব্যাপারে পড়তে হয়েছে খুব অসুবিধেয়। ঐ সময়ের কোন বইপত্তর পান নি, হাতের কাছে এমন কেউ ছিলেন না যিনি সাহায্য করতে পারেন। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর মৃত্যুর সঠিক তারিখটি স্মরণ করার অনেক চেষ্টা করেছেন সুভাষ, কিন্তু পারেন নি। জওহর যেসব ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন সেগুলি সবই তিনি সযত্নে লিখে রাখছেন, পরের সংস্করণে সংশোধন করবেন।

এটা নিশ্চয়ই একটা বিচিত্র যোগাযোগ যে ঠিক যে সময়ে সুদূর ভিয়েনায় বসে সুভাষ লিখেছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী ঠিক তখনই দেশের কারাগারে বসে জওহর লিখছেন তাঁর আত্মকথা। 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি' লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল-এর পরের বছর। সুভাষের বইটি ঠিক আত্মচরিত নয়, কিন্তু তাঁর নিজের কথা অনিবার্য ভাবেই এখানে এসেছে কারণ যে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী তিনি শোনাচ্ছেন তার অন্যতম সৈনিক তিনি। জওহরের আত্মচরিতও মুখ্যত স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী নয়, কিন্তু

যেহেতু এটি স্বাধীনতা সংগ্রামের এক সৈনিকের আত্মচরিত তাই সেই সংগ্রামের কাহিনী অনিবার্যভাবেই এখানে এসেছে। আর তুই নায়ক প্রায় একই সময়ের কাহিনী শুনিয়েছেন—গান্ধীজির আবির্ভাব থেকে শুরু করে তিরিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তুই ভিন্ন প্রকৃতির, ভিন্ন মেজাজের মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে একই ঘটনার বিশ্লেষণ দেখতে পান পাঠক। অনেক মিল চোখে পড়ে, অমিলও চোখে পড়ে অনেক।

রচনারীতি ও মেজাজেও তুটি বই ভিন্ন স্বাদের। সাহিত্যিক প্রসাদগুণে জওহরের আত্মচরিত নিঃসন্দেহে অতি উচ্চস্তরের এবং ইংরেজি সাহিত্যেরই অন্যতম সম্পদ হিসেবে গণ্য। জওহর লিখছেন আত্মকথা, কারাগারের অবসরে। সুভাষ লিখছেন সাম্প্রতিক ইতিহাস। নিজের কথা এলেও উত্তম পুরুষ ব্যবহার না করে প্রায় সর্বদাই লিখছেন 'এই লেখক'। (সুভাষের অসমাপ্ত আত্মকাহিনী 'অ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম' রচিত হয় ইউরোপেই—অস্ট্রিয়ার বাডগাস্টাইনে, ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে, দিন দশেকের মধ্যে অতি দ্রুততায়।)

'দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' এবং 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি' তুটি বই-ই কিন্তু একটি উদ্দেশ্য সাধিত করে—বাইরের মানুষের কাছে ভারতের স্বাধীনতার কাহিনীকে তুলে ধরে জোরালো ভাবে। জ্ঞানীগুণীজনের প্রশংসা পায় তুটি প্রচেষ্টাই। কিন্তু ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে তুটি বই পায় ভিন্ন ধরনের অভ্যর্থনা। ব্রিটেনের ভারত সচিবের অনুমোদন নিয়ে এদেশের ইংরেজ সরকার 'দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করে, বইটির ভারতে প্রবেশ নিষেধ। কারণ? ভারত সচিব সার স্যামুয়েল হোর কমন্স সভার জানিয়ে দেন সেই কারণ: বইটিতে সন্ত্রাসবাদ আর প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

জওহরের 'অ্যান অটোবায়োগ্রফি' ভারতে নিষিদ্ধ করা হবে কিনা সে-প্রশ্নও উঠেছিল। প্রশ্নটি বিচারের দায়িত্ব পড়ল তখনকার স্বরাষ্ট্র

দপ্তরের সচিব মরিস হ্যালেটের উপর। তিনি শুধু যে বইটি পড়লেন তাই নয়, দু' হাজার শব্দের একটি দীর্ঘ রিপোর্টও লিখে ফেললেন বইটি সম্বন্ধে। তিনি বইটিতে আপত্তিকর কিছু দেখতে পেলেন না। লিখলেন (১০ মে ১৯৩৬): যে-ব্যাপারটা তাঁর মনে বিশেষ দাগ কেটেছে তা হল বইটিতে কোন তিক্ততা নেই। কোন ঘটনার বর্ণনায় নেই কোন অহেতুক আতিশয্য। তাঁর মনে বিশেষ করে দাগ কেটেছে সরকারি কার্যকলাপ সম্পর্কে জওহরের "সৎ" মন্তব্য। জওহর এক জায়গায় লিখেছেন: "আমরা যদি বৈপ্লবিক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ নিই—তা সে যতই অহিংস হোক না কেন—আমাদের সব রকম প্রতিরোধের জন্য তৈরি থাকতে হবে।" জওহরের এই পংক্তিগুলি উদ্ধৃতিও দিয়েছেন হ্যালেট।

তখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন স্যার হেনরি ক্রেইক। তিনি হ্যালেটের মতই মেনে নিলেন। যেহেতু জওহরলালের লেখা বই, তাই বিষয়টি গেল স্বয়ং বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর কাছে। তিনি বললেন, বইটি আমি আদ্যোপান্ত পড়েছি, একেবারে নীরস বই। এই বই নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন নেই।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বে যাঁরা তখন ছিলেন সেই মরিস হ্যালেট অথবা স্যার হেনরি ক্রেইক কেউই আমাদের অপরিচিত নন। হ্যালেট সচিব পদে ছিলেন সেই ১৯৩২ সালে। বড়লাট উইলিংডনের আমলে এদেশে কংগ্রেসের উপর যে চরম নির্যাতন চলে তার নেপথ্য নায়ক ছিলেন তিনি। সুভাষচন্দ্রকে যখন নির্বাসন থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি উঠেছিল আইনসভায় কিছুদিন আগে তখন প্রবলতম বিরোধিতা করেছিলেন এই হ্যালেট। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন স্যার হেনরি। হ্যালেট যে 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি' নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেন নি তার জন্য নেহেরু পবিবারের এক চরিতকার ঐ দোর্দণ্ডপ্রতাপ আমলার মধ্যেও এক 'উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীর' সন্ধান পেতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জওহরের আত্মচরিতের এই ধরনের পংক্তিগুলিই নিঃসন্দেহে হ্যালেটকে প্রভাবিত করেছিল: "ইংলণ্ড

বা ইংরেজের প্রতি আমার কোন রাগ নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমি পছন্দ করি না, ভারতে এই সাম্রাজ্যবাদের আমি নিন্দা করি। ব্রিটেনের শাসক শ্রেণী যেভাবে ভারতকে শোষণ করছে তা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। কিন্তু আমি এজন্য ইংলণ্ড বা সমগ্র ইংরেজ জাতিকে এর জন্য দায়ী করি না। আমাদের মতো তারাও অবস্থার শিকার।"

সুভাষের 'দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্' বইটিতে সন্ত্রাসবাদে প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কিনা সেই তর্কে না গিয়ে এ-কথা বলা যায়, বইটিতে মহাত্মা গান্ধীর অনুসৃত নানা নীতি ও সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা স্থান পায়। তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার স্থান এটা নয়। কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে সঙ্গে জওহরলালও কম সমালোচিত হন নি সুভাষের কলমে। প্রথম উল্লেখেই জওহর সম্পর্কে সুভাষের মন্তব্য তির্যক। কংগ্রেস সংগঠনে বামপন্থী গোষ্ঠীর আলোচনা প্রসঙ্গে সুভাষ লেখেন: "এ দিক থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অবস্থাটা বেশ আকর্ষক। তাঁর চিন্তাভাবনা র‍্যাডিক্যাল ধরনের, নিজেকে তিনি পুরোদস্তুর সমাজতন্ত্রীই বলে থাকেন—কিন্তু কাজে তিনি মহাত্মার অনুগত অনুসারী। এ-কথা বলাই বোধ হয় ভালো যে তার মস্তিষ্কটি রয়েছে বামপন্থীদের দিকে আর হৃদয়টি তিনি দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধীকে।" এর আগে অবশ্য মাদ্রাজ কংগ্রেসের মুখে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জওহরলালের ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন সুভাষ। ১৯২৮ সালে একত্রে কাজ করার কথাও লিখেছেন। কিন্তু পরের বছর লাহোর কংগ্রেসে জওহরলালের সভাপতির পদ গ্রহণে বামপন্থীদের মধ্যে যে খুশির জোয়ার ডাকে নি তা সুভাষ স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন।

বড়লাট আরউইনের সঙ্গে গান্ধীজির চুক্তি এবং আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার (১৯৩১) প্রসঙ্গে জওহরলালের ভূমিকার সরাসরি সমালোচনা করেছেন সুভাষ। গান্ধী আরউইন আলোচনায়

সময় মহাত্মাকে ঘিরে রেখেছিল কিছু ধনী আর আপসকামী কিছু রাজনীতিক। ওয়ার্কিং কমিটিতে এমন কেউ ছিলেন না যিনি মহাত্মার উপর কথা বলতে পারেন সুভাষের আক্ষেপ, জওহরলালই একমাত্র তা পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। এই সংকটের মুহূর্তে তাঁর দায়িত্ব ছিল বিরাট। তিনি কংগ্রেস সভাপতি। তা ছাড়া ওয়ার্কিং কমিটিতে একমাত্র তিনিই বামপন্থীদের মনোভাব বুঝতে পারতেন এবং কথা বলতে পারতেন তাদের হয়ে। তিনি সম্মত না হলে ওয়ার্কিং কমিটিতে শেষ পর্যন্ত চুক্তি অনুমোদিত হতে পারত না।

এই চুক্তির পর দেশ জুড়ে যখন সোরগোল উঠল তখন জওহর এক বিবৃতিতে জানালেন, চুক্তির কয়েকটি শর্তে তাঁর সায় নেই, কিন্তু অনুগত সৈনিকের মতো তিনি নেতার মতই মেনে নিয়েছেন। এই বিষয়ে সুভাষের মন্তব্য : দেশের মানুষ জওহরলালকে একজন অনুগত সৈনিকের চেয়ে বেশি কিছু বলেই মনে করে।

১৯৩৩ সালে দ্বিতীয় দফার আইন অমান্য আন্দোলনে যখন ভাটা পড়ল, সংগঠন হিসেবে ঝিমিয়ে পড়ল কংগ্রেস তখনও জওহরের ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছেন সুভাষ। তিনি লিখছেন : দু' বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন জওহর। সবাই তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। একমাত্র তিনিই মহাত্মাকে প্রভাবিত করতে পারেন, টেনে তুলতে পারেন কংগ্রেসকে। তাঁর মতো জনপ্রিয়তা গান্ধীজি ছাড়া আর কারো নেই। দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁর মর্যাদা অসীম, সর্বোত্তম ধ্যানধারনার আধার তাঁর মস্তিষ্ক, আধুনিক পৃথিবীর নানা আন্দোলন সম্পর্কে সর্বশেষ খবর তিনি রাখেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের কথা, নেতৃত্ব দেওয়ার একটা অত্যাবশ্যক গুণই তাঁর নেই। সেটা হল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং দরকার হলে জনপ্রিয়তা হারানোর সাহস রাখা। অন্য সময়েও জওহরলাল নেহরুর চরিত্রের এই ত্রুটি দেখা গেছে—১৯২৩-২৪ সালে কংগ্রেসের সংকটে, আবার ১৯২৮-২৯ সালে।

সুভাষ শুধু জওহরের কার্যধারারই সমালোচনা করেন নি, সমালোচনা করেছেন তাঁর চিন্তাধারারও। ভারতে কম্যুনিজমের ভবিষ্যৎ কী—এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে সুভাষ উল্লেখ করেছেন জওহরলালের একটি বিখ্যাত বিবৃতির। ১৯৩৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের ঐ বিবৃতিতে বলেছিলেন জওহর :

আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীকে এখন মূলত দুটি পথের একটিকে বেছে নিতে হবে—কোন এক ধরনের কম্যুনিজম অথবা কোন এক ধরনের ফ্যাসিজম। আমি পুরোপুরিই প্রথমটির, অর্থাৎ কম্যুনিজমের পক্ষে। এই আদর্শে পৌঁছবার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে গোঁড়া কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আমার মতের অমিল থাকতে পারে। আমার মনে হয়, এই পথ পদ্ধতিকে পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, দেশে দেশে তা ভিন্ন ধরণেরও হবে। কিন্তু আমি মনে করি কম্যুনিজমের মূল আদর্শ এবং ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ভাষ্য নির্ভুল।

সুভাষ সরাসরিই বলেছেন, জওহরের এই মত সম্পূর্ণ ভুল। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিয়েছেন, এই মত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নয়, জওহরের নিজস্ব। আর জওহর জনপ্রিয় বলেই কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা যে তাঁর এই মত মেনে নিয়েছেন তাও নয়। জওহরের বিবৃতি সম্পর্কে সুভাষের আপত্তির কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে :

আমরা যদি অভিব্যক্তির (ইভোলিউশন) শেষ পর্যায়ে পৌঁছে না থাকি, অথবা অভিব্যক্তির কথা যদি না পুরোপুরি অস্বীকার করি তবে এ কথা ভাবার কোন কারণ নেই যে আমাদের সামনে বিকল্প মাত্র দুটি। বরং সব দিক ভেবে একথাই বলতে হয় যে বিশ্ব ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে দেখা দেবে কম্যুনিজম আর ফ্যাসিজমের মধ্যে এক সমন্বয়। আর এই সমন্বয় যদি ভারতেই ঘটে তবে তাতে কি অবাক হওয়ার কিছু থাকবে? এই সমন্বয়কে সুভাষ নাম দিতে চান সাম্যবাদ।

সুভাষের এই মতের যৌক্তিকতা এবং এই বিষয়ে বছর তিনেক পরে তিনি রজনী পালমে দত্তর কাছে যে ব্যাখ্যা দেন তা আমরা পরে আলোচনা করব। আপাতত এই প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে যে জওহরলালের কার্যধারা ও চিন্তাধারার এই ধরনের লিখিত সমালোচনার পরও সুভাষ কেন কংগ্রেস সভাপতি পদে তাঁর পুনর্নিয়োগকে স্বাগত জানালেন অকপটে, অথবা দেশে ফেরার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলেন তাঁরই মতামতকে?

দশ

'দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে জওহরলালের সমালোচনা করেছেন সুভাষ সরাসরি ও তীক্ষ্ণ ভাষায়, কিন্তু সেই সমালোচনার বিশ্লেষণ করলে আমরা সেখানে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কিছু খুঁজে পাই না। বরং ব্যক্তিগতভাবে জওহরের উচ্চতম প্রশংসাই বর্ষিত হয় সুভাষের লেখনী থেকে। ভারতে জনপ্রিয়তার বিচারে জওহরের স্থান যে গান্ধীজির ঠিক পরেই, এই কথাটা বার বার স্বীকার করে নিতে দ্বিধান্বিত নন সুভাষ। ভারতবাসীর মনে জওহর কোন্ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত সে-বিষয়েও তাঁর মনে কোন সংশয় নেই। জওহরের বিচারবুদ্ধি, চিন্তাদর্শ, বিশ্বমুখিনতা, এই সবেরই প্রশংসা করেন তিনি। কিন্তু এই গুণাবলী নিয়েও জওহর তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা অনুযায়ী কাজ করতে এগিয়ে আসতে পারছেন না, এখানেই সুভাষের হতাশা। গান্ধীজির সঙ্গে সুতীব্র মতভেদ সত্ত্বেও জওহর যে প্রতিবাদ বা বিরোধিতার পথে যাচ্ছেন না, তাতেই সুভাষের অসন্তোষ। তাঁর হাতাশা আরও বেড়ে যায় এই কারণে যে জওহরের এই আচরণে কংগ্রেসের মধ্যে যে বামপন্থী শক্তি রয়েছে তা সংহত হতে পারে না। যে বক্তব্যে মনের দিক থেকে সায় নেই সেই বক্তব্যকেই শেষ পর্যন্ত সমর্থন করেন জওহর গান্ধীজির কথা ভেবে। যে বিবৃতিতে আপত্তি

আছে যুক্তির দিক থেকে তাতেও সই করে দেন। এবং তারপর প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন এটা করা তাঁর উচিত হয়নি। অতঃপর নিজের মনের মধ্যেই দ্বন্দ্ব চলতে থাকে জওহরের।

'দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইটিতে আরও কয়েকটি অধ্যায় সংযোজিত করেন সুভাষ ১৯৪২-৪৩ সালে ইউরোপ প্রবাসের সময়। সেখানে জওহরলাল সম্পর্কে একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। সুভাষ লেখেন : নেহরু ভেসে চলেছেন, চেষ্টা করেছেন একই সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে বাম ও দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করতে। গান্ধী গোষ্ঠীতেও পুরোপুরি যোগ দেন নি, আবার কোন র‍্যাডিকাল দলেও যোগ দেন নি। ফলে কার্যত কংগ্রেসের মধ্যে রয়ে গেছেন একা।

সুভাষের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে জওহরলালের নিজের বিশ্লেষণের মিল আমাদের অবাক না করে পারে না। ১৯৪০ সালের আগস্টে প্রকাশকের অনুরোধে জওহরলাল তাঁর আত্মচরিতে একটি অধ্যায় যোগ করেন। সেখানে শুরুতেই তিনি লেখেন : কাজের মধ্যে শান্তি পাচ্ছি না, মনেও শান্তি নেই। যে দায়িত্ব আমায় বহন করতে হচ্ছে তা আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করছে। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে পারছি না; আমার ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীদের সঙ্গেও আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছি না।...একটা দম বন্ধ করা ভাব আর হতাশা বেড়ে চলেছে। যদিও বিশাল জনতা আমার কথা শুনতে জড়ো হচ্ছে, আমার চার দিকে রয়েছে উদ্দীপনা, তবু রাজনীতিতে আমি হয়ে পড়েছি একা।

জওহরলালের এই একাকিত্বের মনোভাবের একটা কারণ নিশ্চয়ই ছিল ব্যক্তিগত। কমলার মৃত্যু একটা বড় আঘাত। মায়ের মৃত্যুতেও অতীতের সঙ্গে শেষ যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন। একমাত্র সন্তান ইন্দিরা প্রবাসে। কাজের মধ্যে ডুবে যেতে চেয়েছেন জওহর, ছুটে বেড়িয়েছেন দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। কিন্তু তাতে একাকিত্ব কাটে নি।

তবে এই একাকিত্ব বোধ যে শুধুই ব্যক্তিগত কারণে নয় তা জওহরের নিজের কথা থেকেই স্পষ্ট। দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতির

দায়িত্ব নিয়ে যখন কাজ শুরু করলেন তখন দেখলেন তাঁর কারাবাস আর প্রবাসের অবসরে সংগঠনের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেখানে তখন সন্দেহ আর তিক্ততার আবহাওয়া। জওহর কংগ্রেসকে যে দিকে নিয়ে যেতে চান তাই নিয়েই শুরু হয়ে যায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধ। আর সেই বিরোধ এমনই পর্যায়ে পৌঁছায় যে জওহরকে বারবার ইস্তফা দেওয়ার কথাও চিন্তা করতে হয়, যদিও শেষ পর্যন্ত ইস্তফা দেওয়া তাঁর হয় নি গান্ধীজির পরামর্শে।

জওহরের সভাপতির পদে দ্বিতীয়বার মনোনয়নের পর সুভাষ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন আর সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন তার কারণ, তিনি এটাকে একটা নতুন সুযোগ হিসেবে দেখলেন। ভাবলেন জওহর কংগ্রেসকে আরও সংগ্রামী, প্রগতিশীল পথে নিয়ে যাবেন আর তিনি পাশে থেকে সহায়তা করবেন সাধ্যমতো। কিন্তু দেশে ফেরা মাত্রই আবার কারারুদ্ধ হওয়ায় সে আশা অপূর্ণই থেকে গেল। দেশে ফেরার আগে জওহরের মতামতকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া থেকে শুধু এই কথাই বোঝা যায় যে রাজনৈতিক মতবিরোধ সত্ত্বেও জওহরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে তিনি ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চান নি কিছুতেই। তাই নিজের আত্মীয় স্বজনের চেয়েও জওহরের পরামর্শকেই বেশি মূল্যবান মনে করেছেন তিনি।

এখানে জওহরলালকে লেখা ইংরেজ লেখক এডওয়ার্ড টমসনের একটি চিঠির (২৬ নবেম্বর ১৯৩৫) দুটি পংক্তি আমাদের কৌতূহল না জাগিয়ে পারে না। টমসন চিঠিটির একেবারে শেষে লিখছেন :

এস সি বি সম্পর্কে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, বারবার। কিন্তু উপর মহলে আমি নিজেই তো খুব বাঞ্ছিত ব্যক্তি নই।

এস সি বি এই ইংরেজি অক্ষরগুলি যে সুভাষচন্দ্র বসুর নামের আদ্যাক্ষর তা পাদটীকা থেকেই জানা যায়, কিন্তু টমসন কী চেষ্টা করছিলেন তা জানা যায় না। এমন অনুমান কি অসঙ্গত যে, লণ্ডনে উপর মহলে কথাবার্তা বলে সুভাষের নির্বাসন পর্ব অবসানের জন্য

চেষ্টা করতে জওহর অনুরোধ করেছিলেন টমসনকে ?

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতবিরোধকে যে সুভাষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ হতে দেন নি তা এই সময়ে ইউরোপে কমলা নেহরুর চিকিৎসা ও মৃত্যুর সময়ে তাঁর উদ্যোগ ও আচরণ থেকেই আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। এই পর্বের বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অশোকনাথ বসুর বৃত্তান্ত থেকে। অশোকনাথ তখন ইউরোপে পড়ুয়া।

অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে যাওয়ার জন্য আলমোড়া জেল থেকে জওহর হঠাৎ ছাড়া পেলেন ৪ সেপ্টেম্বর (১৯৩৫)। কমলা তখন জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট এলাকায় বাডেনওয়াইলার স্বাস্থ্য নিবাসে। প্রথমে মোটর, তারপর ট্রেন—পরের দিনই জওহর পৌঁছলেন এলাহাবাদ। সেদিন বিকেলেই বিমানে ইউরোপের পথে। করাচি বাগদাদ হয়ে কায়রো। তারপর আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সামুদ্রিক বিমানে বিন্দিসি। সেখান থেকে ট্রেনে সুইজারল্যাণ্ডের বাসল্। তারপর বাডেনওয়াইলার।

সুভাষ আগেই খবর পেয়েছিলেন জওহর আসছেন। তিনি তখন কার্লস্বাডে (কার্লোভি ভারি)। জওহরের আসার খবর পেয়ে তিনিও ঠিক করলেন বাডেনওয়াইলারে যাবেন। সুইজারল্যাণ্ডে এসে গাড়িতে করে গেলেন বাসল্ জওহরকে স্বাগত জানাতে। তারপর এক সঙ্গে বাডেনওয়াইলার। সেখানে একই বোর্ডিং হাউসে রইলেন দুজনে। চিকিৎসার ব্যাপারে কথাবার্তাও হল।

কমলা এসেছিলেন জুনে। পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে যাতে তাঁর চিকিৎসা শুরু হতে পারে তার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন সুভাষ। ভিয়েনার কয়েকজন ডাক্তারি ছাত্রকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন রেল স্টেশন। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় পৌঁছলেন কমলা। স্ট্রেচারে করে ট্রেন থেকে নামাতে হল তাঁকে।

সুভাষ নিজেও তখন পুরোপুরি সুস্থ নন। এপ্রিলের শেষেই

হয়েছে অস্ত্রোপচার। আরও চিকিৎসা আর বিশ্রামের জন্য যাওয়ার কথা কার্লসবাড। কিন্তু কমলার আসার জন্য তিনি যাওয়া পিছিয়ে দিলেন কিছুদিন। ১৭ জুন অশোকনাথকে চিঠি লিখে জানালেন, তিনি আগের দিন পৌঁছেছেন কার্লসবাডে। কমলার সঙ্গে একই ট্রেনে গিয়েছিলেন প্রাগ পর্যন্ত। তারপর কমলা চলে যান বার্লিন। সঙ্গে গেছেন চিকিৎসকেরা।

বাডেনওয়াইলারে স্বাস্থ্য নিবাসে পৌঁছে জওহর দেখলেন কমলার মুখে সেই পরিচিত সাহস-মাখা হাসি। তখনও যথেষ্ট দুর্বল কমলা, যন্ত্রণায় কাতর। স্বামী এসে পৌঁছনোর পর অবস্থার একটু উন্নতিই হল যেন। কিন্তু সংকট কাটল না। কাছেই পান্থনিবাসে থাকতেন জওহর। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে সকালে-বিকালে যেতেন স্যানাটোরিয়ামে। কয়েক ঘণ্টা কাটাতেন। খুব বেশি কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। কমলার। জওহর মাঝে মাঝে বই পড়ে শোনাতেন। তারপর আবার ফিরে যেতেন পান্থনিবাসের নির্জনতায়। সেখানে কমলার হাজার স্মৃতি ভিড় করে আসত। বছর কুড়ি হল বিয়ে হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে জওহরের একটা বড় অংশ কেটেছে জেলখানার অন্ধকারে। দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্ম-ব্যস্ততা তো ছিলই। জওহরের মনে হত, কমলার যা প্রাপ্য তা কি তিনি দিতে পেরেছেন? অনেক সময়েই কি তিনি কাজের ভিড়ে ভুলে থাকেন নি তাঁর স্ত্রীকে, প্রার্থিত সঙ্গটুকু দিতে ব্যর্থ হন নি?

প্রবাসে একা-একা বসে জওহরের এ-কথাও মনে হয়েছে যে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কমলা নিজেকে ঘরের কোণে আবদ্ধ রাখতে চান নি, শুধু স্বামীর ছায়া হয়ে না-থেকে স্বামীর পাশাপাশি যোগ দিতে চেয়েছেন জাতীয় আন্দোলনে। যেন রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদার' মতো বলতে চেয়েছেন:

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।

পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি সে নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি সে নহি।

জওহর কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন কমলার মনের কথা, তাই উনিশ শ' তিরিশ সালের গোড়ার দিকে কাজ করতে শুরু করলেন এক সঙ্গে। সে এক নতুন উন্মাদনা, নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু বেশি দিন নয়, এপ্রিলের মাঝামাঝিই গ্রেপ্তার হলেন জওহর। কমলা অবশ্য কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন অন্যান্য মহিলার সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জওহরের মা স্বরূপরাণী এবং বিজয়লক্ষ্মী। এলাহাবাদে মহিলাদের সংগঠিত করে বিদেশী বস্ত্র বর্জন, মদের দোকান বর্জনে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন কমলা। জেলে বসেই এই সব খবর কিছু কিছু পেতেন জওহর। তারপর মোতিলাল যখন গ্রেপ্তার হয়ে এলেন জেলের মধ্যে তখন পেলেন বিশদ বিবরণ।

জেলে বসেই একতিরিশ সালের পয়লা জানুয়ারি শুনলেন কমলার গ্রেপ্তারের খবর। ইন্দিরাকে সেই সময় চিঠি লিখে জানিয়েছেন: 'এই খবর আমার কাছে নববর্ষের সবচেয়ে আনন্দ-দায়ক উপহার।' গ্রেপ্তার হওয়ার সময় এক সাংবাদিক কমলাকে অনুরোধ করলেন: কিছু বলুন। কমলা বললেন: আমার স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পেরে আমি যার-পর-নাই খুশি। আশা করি দেশের মানুষ ঝাণ্ডা উঁচু করেই রাখবেন।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জওহর লিখেছেন: কমলা কিছু ভেবে-চিন্তে বললে হয়ত ঠিক এই কথা বলতেন না, কারণ তিনি ছিলেন পুরুষের নির্যাতনের বিরুদ্ধে মেয়েদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের এক প্রবক্তা। তবে সেই মুহূর্তে তাঁর মধ্যেকার হিন্দু রমণীটিই বড় হয়ে উঠেছিল, তাই পুরুষের নির্যাতনের কথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

প্রবাসে বসে জওহরের মনে পড়ছিল তাঁর নিজের বারবার জেলে যাওয়ার কথা। চৌতিরিশ সালের ফেব্রুয়ারিতে আর এক বার গ্রেপ্তার হলেন। কলকাতা থেকে জারি হয়েছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।

কমলা জামাকাপড় গুছিয়ে দিতে গেলেন। জওহরও গেলেন সেখানে বিদায় নিতে। হঠাৎ কমলা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর চেতনা হারিয়ে ফেললেন। অবাক হলেন জওহর। জেলে যাওয়া তো নতুন কিছু নয়। কিন্তু কোনবারই তো কমলা এই ধরণের কিছু করেন না। তবে কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বাভাবিক পরিবেশে দু' জনের এই প্রায় শেষ দেখা?

*

বাডেনওয়াইলারের সেই পান্থনিবাস থেকে চিঠিপত্র লেখেন জওহর বন্ধুবান্ধবকে, চিঠিপত্র পান। চিঠি লিখছেন গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠি লিখছেন সুভাষও। অকটোবরের ২ এবং ৩ তারিখে সুভাষকে দুটি চিঠি লিখেছিলেন জওহর। সুভাষ তার উত্তর দিলেন ৪ তারিখেই। শ্রীমতী কমলা নেহরুর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে ফ্রীবার্গের সার্জন যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা জেনে খুশি হয়েছেন সুভাষ। এই চিকিৎসায় রোগীর কিছুটা উপকার হবে বলে আশা করেন তিনি। কমলাকে অন্য কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জওহর কি চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন? এই বিপদের সময় যদি তিনি কোন সাহায্যে আসতে পারেন তবে যেন তাঁকে খবর দিতে দ্বিধা না-করেন জওহর।

এরপর কমলার অবস্থা একটু ভালোর দিকে গেল। সেই সুযোগে জওহর কিছু দিনের জন্য গেলেন লণ্ডনে। বছর আষ্টেকের মধ্যে আর বিলেত যাওয়া হয় নি। দিন কয়েক ঘুরে আবার ফিরে এলেন বাডেনওয়ালিয়ারে। কমলার সংকট কখনও কমে, কখনও বাড়ে। জানুয়ারিতে অবস্থা যখন একটু ভালো জওহর আবার গেলেন প্যারিস হয়ে লণ্ডন।

সুভাষও ঐ জানুয়ারিতেই গেলেন আয়ারল্যাণ্ডে। অনেক দিন ধরেই তাঁর ইচ্ছা আয়ারল্যাণ্ডে যাবেন, দেখা করবেন ইমন ডি ভ্যালেবার সঙ্গে। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ঐ দেশের মানুষ যেভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছে সে বিষয়ে তিনি আগ্রহী

বরাবর। জওহরলালের ইংলণ্ডে যাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধানিষেধ আরোপ করে নি ইংরেজ সরকার। কিন্তু সুভাষের ইংলণ্ডে প্রবেশ নিষেধ। তাই ইংলণ্ডের বদলে ফ্রান্স হয়ে তাঁকে যেতে হল ডাবলিন।

লণ্ডনে থাকতেই জওহর জানতে পারলেন তিনি দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হতে চলেছেন। আবার এক সংকটে পড়লেন জওহর। কমলাকে এইভাবে ফেলে চলে যাবেন? না, প্রত্যাখ্যান করবেন সভাপতির পদ? কমলাকে জানালেন সব কথা। রোগশয্যায় শুয়েই তিনি বললেন, না, কংগ্রেস সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করা তোমার চলবে না।

কিছু দিন ধরেই কমলা বলছিলেন, বাডেনওয়ালিয়ারে থাকতে তাঁর আর একদম ভালো লাগছে না। তাই জানুয়ারির শেষে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল সুইজারল্যাণ্ডের লোসানে। অবস্থার আবার একটু উন্নতি হল। এদিকে জওহরের দেশে ফেরার ডাক আসছে। তিনি ঠিক করলেন ২৮ ফেব্রুয়ারি কে এল এম বিমানে দেশে ফিরে যাবেন।

কিন্তু তখনও জওহর জানতেন না যে ঠিক ঐ তারিখেই কমলা চিরবিদায় নেবেন। কয়েক দিন আগেই ডাক্তার বলেছিলেন জওহরকে: দেশে ফেরা কয়েক দিন পিছিয়ে দিন। তাই-ই দিয়েছিলেন তিনি। এদিকে আয়ারল্যাণ্ড থেকে প্যারিসে এসে কমলার সংকটের খবর পেলেন সুভাষ। তিনি সোজা সেখান থেকে চলে এলেন লোসানে। আঠাশ তারিখে ভোর বেলা কমলা যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তখন সেখানে উপস্থিত সুভাষ।

জওহর লিখছেন: ইন্দিরা তখন পাশে ছিল। আর ছিলেন এই ক' মাসে আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সর্বক্ষণের সঙ্গী ডঃ এম অটল। সুইজারল্যাণ্ডের অন্যান্য কয়েকটি পাশাপাশি শহর থেকে আরও কয়েকজন বন্ধু এলেন। আমরা কমলাকে নিয়ে গেলাম লোসানের ক্রিমেটোরিয়ামে।

কমলার শেষকৃত্যের সময়ও উপস্থিত ছিলেন সুভাষ। তিনি বাডগাস্টাইনে ফিরে যান মার্চের তিন তারিখে। জওহর কিন্তু তাঁর স্মৃতিচারণে কোথাও উল্লেখ করেন নি যে তাঁর জীবনের এই সংকটের মুহূর্তে সুভাষ বারবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

মধ্য ইউরোপের মাটিতে একটি সম্পর্কের ইতি ঘটল—জওহরের সঙ্গে কমলার। ঠিক ঐ একই সময়ে মধ্য ইউরোপের মাটিতে গড়ে উঠছিল আর একটি সম্পর্ক—সুভাষের সঙ্গে এমিলি শেঙ্কলের। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

এগার

১৯৩৭ সালের শেষের দিকে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। তার মূল বক্তব্য : জওহরলাল নেহেরুকে আবার কংগ্রেস পভাপতি করা উচিত নয়। লখনউ কংগ্রেসে (১৯৩৬) তিনি সভাপতিত্ব করেছেন, আবার ঐ বছরের শেষেই ফৈজপুর অধিবেশনের জন্যও তিনিই সভাপতি নির্বাচিত হন। তবু কোন কোন মহলে কথা উঠল : গুজরাটের হরিপুরা অধিবেশনেও তাঁকেই সভাপতি করা হোক। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই মডার্ন রিভিউ পত্রিকার লেখকের জেহাদ।

কিন্তু জওহরলালের পুনর্নিবাচনের বিরুদ্ধতা করে কে কলম ধরলেন? জানার উপায় নেই, কারণ রচয়িতার নাম দেওয়া নেই। প্রবন্ধের বক্তব্য নিয়ে তো জোর আলোচনা শুরু হলই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি জল্পনা চলতে লাগল রচয়িতার সম্ভাব্য নাম নিয়ে।

পরে জানা গেল, রচয়িতা আর কেউ নন, স্বয়ং জওহরলাল নেহরু! (খবরটি প্রথম ফাঁস করেন জন গান্থার, তাঁর বিখ্যাত 'ইন-সাইড এশিয়া' বইয়ে।)

পর পর তিন বার কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার কোন নজির নেই।

তা ছাড়া বিগত দু' বছরের অভিজ্ঞতাতেই জওহরলাল ক্লান্ত। দ্বিতীয়বার সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার মুখেই তিনি অনুভব করেছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে 'সন্দেহ তিক্ততা আর সংঘর্ষের আবহাওয়া'। এই আবহাওয়া আরও জোরালো হয়েছে দু' বছরে।

লখনউ অধিবেশনেই বুঝতে পেরেছিলেন জওহর যে কংগ্রেসকে তিনি যে পথে নিয়ে যেতে চান সে পথে যাওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। তাঁর উজ্জ্বল প্রগতিশীল ভাবমূর্তি, তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য তাঁকে সংগঠনের শীর্ষে রাখা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কংগ্রেস নামক যন্ত্রের আসল চাবিকাঠি সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ দক্ষিণপন্থীদেরই হাতে। লখনউ অধিবেশনেই তিনি দেখেছেন, প্রগতিশীল ভাবধারার যে সব প্রস্তাব তিনি আনতে চেয়েছেন সেগুলির হাল কী হয়েছে। অধিবেশনের আগে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তেমন আপত্তি তোলেন নি দক্ষিণপন্থীরা। কিন্তু প্রকাশ্য অধিবেশনে সেগুলি যাতে অগ্রাহ্য হয়ে যায়, অথবা সেগুলি আমূল সংশোধিত হয় তার ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রমিক ও কিসান সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার (অ্যাফিলিয়েশন) অনুমোদন দেওয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল সরাসরি, কারণ তা হলে নাকি সংগঠনে বামপন্থীদের দিকে পাল্লা ভারি হয়ে যাবে। বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে রাজনৈতিক অধিকারের জন্য যে সংগ্রাম চলছিল, জওহর চেয়েছিলেন কংগ্রেস তার সঙ্গে আরও সরাসরি যুক্ত হোক। ব্যর্থ হল তাঁর এই প্রচেষ্টাও। ভূমি সংস্কার নিয়ে যে প্রস্তাব উঠল সেটি গৃহীত হল বটে, কিন্তু অত্যন্ত জোলো আকারে। জওহর আহ্বান জানালেন: ১৯৩৫ সালের আইন পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা হোক, নির্বাচনে কংগ্রেস যোগ দেবে না, গ্রহণ করবে না সরকারি পদ। ঐ আইন যে গ্রহণের অযোগ্য তা ঘোষিত হল বটে, কিন্তু নির্বাচনে যোগ দিতে রাজি হয়ে গেল কংগ্রেস। সরকারি পদ ও মর্যাদার মোহ দক্ষিণপন্থীদের কাছে অমোঘ। (অস্ট্রিয়া থেকে ৪ মার্চ সুভাষ জওহরকে যে চিঠি লেখেন তাতে বলেছিলেন:

কংগ্রেস যাতে সরকারে যোগ না দেয় যেমন করে হোক তার ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে।)

প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে রীতিমতো হতাশ জওহর। প্রথম থেকে মনে দানা বাঁধতে থাকে পদত্যাগের বাসনা। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের অভিজ্ঞতায় সেই বাসনা আরও জোরদার হয়। প্রথম বৈঠক থেকেই হয়ে পড়েন প্রায় কোণঠাসা। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন তো তিনিই করেছেন। এবার সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে তিনি কিছু সমাজতন্ত্রী মনোভাবের মানুষকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেছেন বটে, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তিনি এমনভাবে বাছলেন যাতে দেখা দিল হতাশা, তার চেয়ে বেশি বোধ হয় বিস্ময়। ১৪ জনের মধ্যে দশ জনই পরিচিত দক্ষিণ-পন্থী হিসেবে, সুভাষকে নিয়ে বাকি চার জন বামপন্থী। (আর তিন জন হলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন এবং নরেন্দ্র দেব। আর সুভাষ তো বন্দি)।

উদ্বিগ্ন হয়ে জওহরকে চিঠি দিলেন উত্তর প্রদেশের নেতা রফি আহমেদ কিদোয়াই (২০ এপ্রিল) : গত কয়েক দিন কেটেছে আমার যন্ত্রণায়। আপাতত আপনিই আমাদের একমাত্র আশা, কিন্তু সেই আশা কি ছলনাময়ী বলে প্রমাণিত হবে ? গান্ধীবাদের প্রভাব আর মিলিত বিরুদ্ধতার মুখে আপনি কতটা শক্ত হতে পারবেন সে বিষয়ে কিছু লোকের সন্দেহ ছিলই। আপনি ওয়ার্কিং কমিটি ঢেলে সাজানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। আপনি ট্যাণ্ডন, নরিম্যান, পট্টভি, শার্দুল সিংকে বাদ দিয়েছেন। গোবিন্দ দাস আর শরৎ বসুকে বাদ দিয়ে নিয়েছেন ভুলাভাই আর রাজা-গোপালাচারিকে। ওঁরা থাকলে আপনার শক্তি বাড়ত। এ আই সি সি এবং প্রতিনিধিদের মধ্যেও আমাদের শক্তি কমেছে। আর আপনি যে ওয়ার্কিং কমিটি গড়েছেন তা বিদায়ী কমিটির চেয়ে আরও প্রতিক্রিয়াশীল বলে প্রমাণিত হবেই।

ওয়ার্কিং কমিটিতে যখন নিজের মত অনুযায়ী এগোতে পারছেন না তখন জওহর দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে প্রচার করতে

লাগলেন সমাজতন্ত্রের বাণী। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা তো আতঙ্কিত হলেনই, এমন কি গান্ধীজিও। শোনা গেল, গান্ধীজি বলেছেন, জওহরের কথাবার্তায় আমার সারা জীবনের কীর্তি ধ্বংস হয়ে গেল। গান্ধীজি পরে অবশ্য এ কথা অস্বীকার করেন।

কিন্তু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ নেতারা জওহরের সঙ্গে মতবিরোধকে সামান্য ব্যাপার বলে মনে করলেন না। তাঁরা একযোগে ইস্তফা দিয়ে বসলেন ওয়ার্কিং কমিটি থেকে। ওয়ার্ধা থেকে জওহরকে এক যোগে চিঠি লিখলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ বল্লবভাই প্যাটেল, রাজা-গোপালাচারি জে বি কৃপালনি, জয়রামদাস দৌলতরাম এস ডি দেব এবং যমুনালাল বাজাজ (২৯ জুন ১৯৩৬)। তাঁদের বক্তব্য : মতের অমিল আছে জেনেই তো জওহর তাঁদের ওয়ার্কিং কমিটিতে নিয়েছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন তবু এক সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হবে। কিন্তু এই সময়ে জওহর এবং ওয়ার্কিং কমিটির সমাজবাদী সদস্যেরা যে ভাবে সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করছেন তাতে কি দেশের স্বার্থের এবং স্বাধীনতা সংগ্রামেরই ক্ষতি হচ্ছে না? কংগ্রেস তো সমাজতন্ত্রের আদর্শ সরকারিভাবে গ্রহণ করে নি। এই ধরণের প্রচারে কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়ছে। এদিকে নির্বাচন আসন্ন। এই অবস্থায় নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাঁরা ইস্তফা দিতে চান।

সভাপতির সঙ্গে মতবিরোধের দরুন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের এক যোগে ইস্তফা—তবে কি ১৯৩৬ সালেই আমরা ১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী অধিবেশনে সুভাষকে ঘিরে বিতর্কের পূর্বভাস পাচ্ছি? পূর্বভাস ঠিকই, সংকটের লক্ষণেও মিল আছে। তবে একটি বড় পার্থক্য দুই সংকটে গান্ধীজির ভূমিকা। রাজেন্দ্র প্রসাদদের ইস্তফার পরই মহাত্মা আসরে নামলেন। পরামর্শ দিলেন পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে। সে-পরামর্শ উপেক্ষা করার স্পর্ধা ঐ সপ্তরথীর ছিল না। দু দিন পরেই জওহরলালকে আর এক চিঠি দিয়ে প্রত্যাহার করে নিলেন ইস্তফা। মন রাখতে দু-চারটি মিষ্টি কথাও

বললেন। কিন্তু যা লক্ষ্যণীয় ১ জুলাইয়ের চিঠিতেও রাজেনবাবু পুরনো অভিযোগগুলিই আবার লিপিবদ্ধ করলেন এবং এবার আরও বিশদভাবে।

জওহরলাল সভাপতি হলে যে সংকট দেখা দিতে পারে এমন আঁচ অবশ্য রাজেনবাবুরা আগেই করেছিলেন। তাই লখনউ অধিবেশনের আগেই চিঠিতে লিখে দিয়েছিলেন প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি (১৯ ডিসেম্বর ১৯৩৫): কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচীতে মৌলিক পরিবর্তন না-ঘটলে আমরা এক সঙ্গে কাজ করতে পারি।

ঐ চিঠিতেই দেখতে পাই একটি বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করছেন রাজেন্দ্র প্রসাদ। বলছেন: কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আপনি বা সুভাষবাবু তো প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা নির্বাচিত হওয়ার অধিকারী নন। কারণ তা হতেগেলে একাদিক্রমে ছ মাস সদস্য থাকতে হবে, সর্বদা খাদি পরতে হবে, এবং করতে হবে কিছু কায়িক পরিশ্রমের কাজ। যারা ইতিপূর্বে কংগ্রেস সভাপতি হয়েছেন, অথবা জেলে ছিলেন অথবা অন্য কারণে এই সব শর্ত পূরণ করতে পারেন নি তাঁদের ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রমের রেওয়াজ নেই।

এই বাধা অবশ্যই কোন ভাবে দূর হয়েছিল, না হলে জওহর আর সভাপতি নির্বাচিত হলেন কী করে। কিন্তু অন্য বাধা থেকেই গিয়েছিল। তাই জওহর গান্ধীজিকে লিখলেন:

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আমি বড়ই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছি। প্রতি বারই মনে হয় যেন আমার বয়স অনেক বেড়ে গেছে। কমিটির অন্যান্য সহকর্মীরও যদি এই অভিজ্ঞতা হয় তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ এক অস্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতা, এতে যথার্থ কাজে বাধা আসে। (এলাহবাদ থেকে ৫ জুলাই লেখা চিঠি।)

রাজেনবাবুদের অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে জওহর লিখলেন: যত নরম করেই বলা হোক না ব্যাপারটা, আসলে কথাটা তো দাঁড়াচ্ছে এই যে আমি একটা অসহ্য বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমার যা কিছু গুণ আছে—কিছুটা দক্ষতা, উৎসাহ, আন্তরিকতা,

কিছুটা ব্যক্তিত্ব যার এক ধরণের আবেদন আছে—সেগুলিই হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপজ্জনক, কারণ ভুল রথে যুক্ত হয়েছে সেগুলি। এ থেকে যা সিদ্ধান্ত করা যায় তা তো খুব স্পষ্ট।

গান্ধীজি সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি দিয়ে প্রশমিত করতে চাইলেন জওহরের ক্ষোভ। বললেন, রাজেনবাবুদের চিঠির তাৎপর্য তুমি বড় বাড়িয়ে দেখছ। ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু ভেবে দেখ। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তুমি তোমার রসবোধকে কাজে লাগাও না কেন ?

শুধু রসবোধ দিয়ে অবশ্য রাজনৈতিক সংকট কাটে না। তাই পদত্যাগের সিদ্ধান্তই নেন জওহর। গান্ধীজিকে জানিয়েও দেন। কিন্তু সেই সময়েই শুরু হয় স্পেনে গৃহযুদ্ধ। জওহরের আশঙ্কা দেখা দেয়, এই থেকেই হয়ত সূচনা হবে বিশ্বযুদ্ধের। এই সংকটের সময় কংগ্রেসকে দুর্বল করা উচিত নয়। তাই ইস্তফার সিদ্ধান্ত বদল করেন।

কিন্তু মতবিরোধের শেষ হয় না। ফৈজপুরে আবার সভাপতি নির্বাচিত হন জওহর, কিন্তু নরমপন্থীদের সঙ্গে মতান্তর থেকেই যায়। প্রাদেশিক সরকারে যোগ দেওয়ায় দলের চেহারা বদলে যাচ্ছে। সংগ্রামী সংগঠন হয়ে উঠছে নির্বাচনী লড়াইয়ের হাতিয়ার। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস সরকারের কাজেও খুশি নন জওহর। বিরোধ বড় আকার নেয় ১৯৩৭ সালের অকটোবরে এ আই সি সির সভায়।

মহীশূর রাজ্যে চলছিল প্রজাদের উপর দারুণ নির্যাতন। কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন মহারাজা। এপ্রিলে গুলি চালানো হয়েছিল জনতার উপর। এ আই সি সির প্রস্তাবে মহীশূর সরকারের তীব্র সমালোচনা করে সমর্থন জানানো হল রাজ্য কংগ্রেসকে। কিন্তু কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের পছন্দ হল না এই প্রস্তাব। কারণ দেশীয় রাজারাজড়াদের কায়েমি স্বার্থে হাত দিতে রাজি নন তাঁরা।

গান্ধীজি তখন অসুস্থ। এই প্রস্তাবে তিনিও খুবই চটে গেলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যে-ভাষায় তিনি এই প্রস্তাবের নিন্দা করলেন

জওহরলাল নিজেই তাকে বলেছেন 'অস্বাভাবিক রকমের কড়া'। গান্ধীজি কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের 'কৃত্রিম সহাবস্থানের' নিন্দা করলেন। বললেন, এ চলতে দেওয়া যেতে পারে পারে না। কংগ্রেসকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক হতে হবে। কংগ্রেসে যদি কোন রকম পরিবর্তন করা হয় তবে তাকে সবে দাঁড়াতে হবে।

'হরিজন' পত্রিকায় কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে জওহরের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করলেন গান্ধীজি। বললেন, এই প্রস্তাবের আলোচনা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের আওতায় আসে না। অর্থাৎ এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে দিয়ে জওহর উচিত কাজ করেন নি।

জওহর কিন্তু এই যুক্তি মানতে রাজি নন। তিনি বললেন, গঠন-তন্ত্রের পরিপন্থী কোন কাজ তিনি করেন নি। গান্ধীজি আর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদেরও চিঠি লিখে জানালেন সে কথা। সংবাদপত্রে বিবৃতি দিতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্য বিরোধ এড়াতে তা আর দেন নি শেষ পর্যন্ত।

জওহর লিখছেন: কিন্তু ক্রমশই আমার মনে হতে লাগল, কর্মসমিতির দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে আমি আর কাজ করতে পারব না। আমি ঠিক করলাম, সংকট দেখা দিতে পারে এমন কিছু আমি করব না। তবে পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে কর্মসমিতি থেকে সরে দাঁড়াব। গান্ধীজি এবং আরও কয়েকজন সহকর্মীকে সে কথা জানিয়ে দিলাম। সুভাষবাবুকেও একই মর্মে চিঠি দিলাম। তিনি তখন ইউরোপে। (তিনি তখনও সরকারিভাবে সভাপতি নির্বাচিত হন নি, কিন্তু তাঁর নির্বাচন এক রকম নিশ্চিত।)

কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি থেকে সরে দাঁড়ানোও শেষ পর্যন্ত হল না। হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেসকে মোকাবিলা করতে হল উত্তর প্রদেশ ও বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সংকটের। জওহর লিখছেন: ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগ না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত ধাক্কা খেল। আরও একটা বিষয় আমাকে প্রভাবিত করেছিল। আমি যদি ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগ না দিই তবে ভাবা হতে পারে যে আমি সুভাষবাবুকে পূর্ণ সহযোগিতা

দিতে চাই না। (ফ্রম লখনউ টু ত্রিপুরী ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৩৯)

ইতিমধ্যে সুভাষ মুক্তি পেয়েছেন। কার্শিয়াঙে আটক ছিলেন সাত মাস। তারপর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা হয়েছে। সাঁইতিরিশ সালের এপ্রিলে তাই গিয়েছিলেন হিমাচলের ডালহৌসি পাহাড়ে ডাঃ এন আ'র ধর্মবীরের পরিবারের সঙ্গে থাকতে। ছাত্রাবস্থায় ইংলণ্ডে থাকতেই আলাপ হয়েছিল এই পরিবারের সঙ্গে। ফিরলেন অক্টোবরে। ঐ মাসের শেষে কলকাতায় বসল ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসুবাড়িতেই (১ নং উডবার্ন পার্ক)।

জওহর এলেন, বিজয়লক্ষ্মী এলেন, এলেন গান্ধীজিও। বসুবাড়িতে জওহরের থাকা নতুন কিছু নয়। বর্মা যাওয়ার পথে আগের মে মাসেই এসেছিলেন ইন্দিরাকে নিয়ে। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে বারবারই এসেছেন। আসলে শরৎ বসুর এই বাড়িতে জওহরের জন্য একটি আলাদা ঘরই নির্দিষ্ট ছিল। বাড়ির সকলে বলত, পণ্ডিতজির ঘর। ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠকের সময়েই মোটামুটি পাকা হয়ে যায় যে, হরিপুরা অধিবেশনে সভাপতি হবেন সুভাষচন্দ্র।

ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরায় বসল কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন। বিগত বছরের কাজের পর্যালোচনা করলেন বিদায়ী সভাপতি জওহরলাল। তারপর দায়িত্বভার তুলে দিলেন সুভাষচন্দ্রের হাতে।

বারো

হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হয়ে যাওয়ার কিছু দিন পরে জওহরলাল বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন কুমায়ুন পাহাড়ের খালিতে। দু'বছর কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে কাজ করতে গিয়ে যে মানসিক অবসাদ এসেছে তা দূর করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু তাতেও যেন শ্রান্তি ঘুচল না। ফিরে এল না আগের কর্মোদ্দীপনা। গান্ধীজি তখন বোম্বাইয়ে। এলাহাবাদ থেকে তাঁকে চিঠি লিখলেন জওহর (২৮

এপ্রিল ১৯৩৮): যেভাবে সব কিছু চলছে তাতে গত কয়েক মাস ধরেই আমার মনে হচ্ছে দেশে আমি ঠিকমতো কাজ করতে পারছি না। আমি অবশ্য কোন রকমে কাজ চালিয়ে গেছি। কিন্তু আমার যেন নিজেকে মনে হয়েছে বেমানান। এই কারণেই (অবশ্য অন্য কারণও আছে) আমি ইউরোপে যাওয়া মনস্থ করেছি। আমার মনে হয়েছে, ওখানেই আমি বেশি কাজে লাগব। আর যাই হোক আমার ক্লান্ত বিভ্রান্ত মনটা তাজা হয়ে উঠবে।

জওহর আরও জানালেন তিনি ২ জুন বোম্বাই থেকে পাড়ি দেবেন ইউরোপের পথে। কবে ফিরবেন ঠিক নেই। হয়ত সেপ্টেম্বরের শেষে ফিরতে পারেন।

কিন্তু তা ফিরলেন না। তখন সুভাষ চিঠি লিখলেন জওহরকে (১৯ অক্টোবর ১৯৩৮)। জওহর অবশ্য ইউরোপে থাকতেই দেশের ও কংগ্রেসের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে একাধিক রিপোর্ট ও চিঠি দিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতিকে। ত্রিপুরী অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক দেখা দেয় সে-প্রসঙ্গে পরে আমরা দেখতে পাব, জওহরের অন্যতম অভিযোগ—সুভাষ ঐ সব চিঠির উত্তর দেন নি, এমন কি প্রাপ্তি স্বীকারও করেন নি (৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ তারিখের চিঠি)।

সুভাষ তাঁর চিঠিতে এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন: জওহর নিশ্চয়ই ভাবছেন সুভাষ কী বিচিত্র লোক, চিঠির উত্তর দেয় না। সব চিঠিই তিনি পেয়েছেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাছে জওহর যে চিঠি দিয়েছেন তা সকলেই পড়েছেন। দেশের ঘটনাবলীর কথা কৃপালনি (জে বি কৃপালনি—তখন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক) এবং অন্য বন্ধুরা তাঁকে জানিয়েছেন।

ইউরোপে গিয়ে জওহরের যে বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তা সুভাষ অস্বীকার করলেন না, কিন্তু জানালেন: এই কয়েক মাস তোমার অভাব যে কতটা অনুভব করেছি তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না। কত সমস্যার সমাধান তোমার ফেরার জন্য আটকে আছে।

যে-সব সমস্যার কথা সুভাষ বললেন তার মধ্যে ছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যা, জিন্নার একগুয়েমি, এ আই সি সি তে বাম আর দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে মতভেদ, আন্তর্জাতিক বিষয়। সবশেষে বললেন, আমি আশা করি ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যানের পদ তুমি গ্রহণ করবে। যদি এই কমিটিকে সফল হতে হয় তবে তোমাকে এই পদ গ্রহণ করতেই হবে।

এক হিসেবে দেখতে গেলে সুভাষের কংগ্রেস সভাপতিত্বের কালে এই ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঠিকই, ১৯৩৭ সালের শেষের দিকেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কত সাধু প্রস্তাবই তো কংগ্রেসের বিভিন্ন বার্ষিক অধিবেশন বা কমিটির বৈঠকে গৃহীত হওয়ার পর আর রূপায়িত হয় নি। পরের বছর সুভাষের পরিবর্তে যে-কেউ সভাপতির আসনে বসলেই যে এই প্রস্তাবটি সঙ্গে সঙ্গে রূপায়িত হতই—এমন কথা ধরে নেওয়ার কোন অর্থ নেই, বিশেষত স্বয়ং গান্ধীজি এবং গান্ধীবাদী নেতাদের একাংশ যখন এই ধরনের উদ্যোগের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। সুতরাং এই বিষয়ে সুভাষের উদ্যোগের একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল। অথচ এদেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিন্তার প্রসারে সুভাষের ভূমিকার কথাটিকে চাপা দেওয়ার প্রয়াস প্রায় সর্বত্র। যা বিশেষত পরিতাপের তা হল এই প্রয়াসের সূচনা স্বয়ং জওহরলালেরই হাতে—সেই জওহরলাল, যাঁকে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান পদে বরণ করেছিলেন সুভাষ।

হরিপুরায় কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষের ভাষণের অনেকখানিই জুড়ে রয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের পর তাঁর দেশগঠনের স্বপ্নের কথা। ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরই রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস বিলুপ্ত হবে—এই ধরণের প্রস্তাবের সরাসরি বিরোধিতা করলেন সুভাষ। বললেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের পর দেশ গড়ার ভার নেবে কংগ্রেসই। দেশ গড়ার বিশদ পরিকল্পনা তৈরির

সময় এখনও হয় নি। কিন্তু কিছু নীতি অবশ্যই বিবেচনা করা যায়। দেশের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা আর রোগ দূর করা এবং সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন আর বণ্টনের ব্যবস্থা করা। শুধু সমাজতান্ত্রিক পথেই এই সব সমস্যার ঠিকমতো মোকাবিলা করা যেতে পারে। তার জন্য এক দিকে দরকার ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার আর জমিদারী প্রথার বিলোপ। অন্য দিকে প্রয়োজন রাষ্ট্রের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে শিল্পের বিকাশ। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন কল-কারখানার আগের যুগে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। তবে সেই সঙ্গে যেখানে সম্ভব কুটীর শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় সরকারকে প্রথমেই যা করতে হবে তা হল দেশগড়ার বিশদ পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি কমিশন গঠন।

জওহর যখন কংগ্রেস সভাপতি সেই ১৯৩৭ সালের আগস্টের ১৪ থেকে ১৭ তারিখে ওয়ার্ধায় বসেছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। সারা ভারতে শিল্প উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা রচনার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ঐ বৈঠকে। পরের বছর জুলাইয়ের ২৩ থেকে ২৭ ওয়ার্ধাতেই আবার বসল ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। সুভাষ তখন সভাপতি। বৈঠকে জওহর অনুপস্থিত। তিনি তখন বিদেশে। ঠিক হল আগের বছরের প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেস সভাপতিকে ক্ষমতা দেওয়া হবে বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প মন্ত্রীদের সম্মেলন ডাকতে। সেই সম্মেলনে আলোচনা হবে শিল্প বিকাশ নিয়ে।

এর আগে মে মাসে বোম্বাইয়ে সুভাষ ডেকেছিলেন কংগ্রেস-শাসিত সাতটি প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীদের (তখন বলা হত প্রিমিয়ার) সম্মেলন। সেখানে ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যও হাজির ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জওহরলাল, বল্লভভাই, কৃপালনি প্রমুখ। শিল্প উন্নয়ন নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা হল। ঠিক হল বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে ওয়ার্কিং কমিটি।

প্রধানমন্ত্রীদের এই সম্মেলন ডাকার জন্য সুভাষকে অভিনন্দন জানালেন জওহর। প্রধানমন্ত্রীদের সেই সময় সংবর্ধনা জানানো হয় এক সভায়। সেখানেই কংগ্রেস সভাপতিকে অভিনন্দন জানান জওহর। বলেন, বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা কী করতে পেরেছে শুধু তা জানার জন্য নয়, কতটা কাজ বাকি তা জানার জন্যও এই ধরনের সম্মেলন প্রয়োজন।

শিল্প মন্ত্রীদের সম্মেলন বসল দিল্লিতে ২ অক্টোবর। দু দিনের সম্মেলনে জাতীয় পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরলেন সুভাষ। এর আগে আগস্ট মাসে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় ডঃ মেঘনাদ সাহার প্রশ্নের উত্তরেও আমরা তাঁকে দেখেছিলাম অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল নীতিগুলিকে তুলে ধরতে। এর পর অল ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির প্রথম বৈঠক বসল ১৭ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে বৈঠক উদ্বোধন করলেন সুভাষ। কমিটির সভাপতি হিসেবে বরণ করলেন জওহরকে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জওহর লিখেছেন: আমি কমিটির সভাপতি পদ গ্রহণ করলাম বটে, তবে আমার দ্বিধা ও সন্দেহ ছিলই। তবে কাজটা আমার মনের মতো, তাই আমি এর বাইরে থাকতে পারলাম না।

জওহরের 'দ্বিধা ও সংশয়ের' কারণ, নানা ধরনের লোক নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই কমিটি। তাতে যেমন ছিলেন ঝানু ব্যবসায়ী, তেমনি ছিলেন সমাজবাদী আর আধা কম্যুনিস্টরা। কংগ্রেস নেতৃত্বেরই একাংশ এই কমিটিকে মনে করতেন 'অবাঞ্ছিত সন্তান'। এই কমিটি ভবিষ্যতে কী চেহারা নেয় তা নিয়ে ছিলেন শঙ্কিত।

কিন্তু সুভাষ জওহরকে এই পদ গ্রহণে আমন্ত্রণ জানালেন কেন? আমরা আগে দেখেছি, অনেক বিষয়ে মতবিরোধ সত্ত্বেও সুভাষ ছিলেন জওহরের চিন্তাদর্শ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। জাতীয় পরিকল্পনার রূপরেখা কী হবে সে-বিষয়ে দু' জনের চিন্তাধারায় মিল ছিল যথেষ্ট। সুভাষ তাঁর হরিপুরা ভাষণে সমাজতান্ত্রিক পথে দেশ গড়ার কথা বলেছেন।

তাঁর পূর্বসূরী জওহর লখনউ ও ফৈজপুর অধিবেশনেও বলেছেন সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা—এবং সম্ভবত আরও জোরালো ভাষায়। (জওহর বলছিলেন : আমার কাছে সমাজতন্ত্র শুধু একটা পছন্দসই অর্থনৈতিক মতবাদ নয়। আমার সব বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে আমি এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে আছি। ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমি যে সংগ্রাম করছি তার কারণ আমার জাতীয়তাবোধ বিদেশী প্রভুত্ব মানতে চায় না। আমি যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি তার আরও বড় কারণ, ঐ স্বাধীনতা হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পালাবদল ঘটাবার পথে অনিবার্য একটি ধাপ। আমি চাই কংগ্রেস একটা সমাজবাদী সংগঠন হয়ে উঠুক, বিশ্বের আরও যে-সব শক্তি নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে তাদের সঙ্গে হাত মেলাক।—লখনউ অধিবেশনে ভাষণ।)

সুভাষ ও জওহর দু'জনেরই স্থির বিশ্বাস ছিল ভারতের মতো দেশে দারিদ্র্য মুক্তির পথ শিল্প স্থাপন এবং বড় আকারের শিল্প স্থাপন। দ্রুত শিল্পায়নের সঙ্গে যে কিছু বিপদ জড়িত আছে সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন দু জনেই, তবু দু'জনেই মেনে নিয়েছিলেন যে এ ছাড়া আর পথ নেই। ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠনের পর অনেক মহলে একটা গেল গেল রব ওঠে। 'গেল গেল' ভাবটা ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। জওহর ও সুভাষ দু'জনেই তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, বৃহৎ শিল্পের প্রসার মানেই কুটীর শিল্পের লয় নয়। বস্তুত প্ল্যানিং কমিটির প্রথম সভায় সুভাষকে আমরা বারবার দেখি কুটীর শিল্প সম্পর্কে অন্যায় আশঙ্কা দূর করতে।

এই সব দিক বিচার করে জওহরকে এই কমিটির সভাপতি মনোনয়ন করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তবু প্রথমে এই পদে নাম ওঠে স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার। কিন্তু তখন ডঃ মেঘনাদ সাহা একটি প্রস্তাব দেন। এই ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটিকে যদি কংগ্রেস নেতৃত্বের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে হয় তা হলে গান্ধীজির আস্থাভাজন এবং প্রথম সারির একজন নেতাকে সভাপতি করা দরকার। তিনি

জওহরের নাম প্রস্তাব করেন। সুভাষের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সত্যরঞ্জন বক্সী শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে যা বলেছেন তা থেকে এই কথারই সমর্থন মেলে ('সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং')।

জওহরের এই নিয়োগে যাঁরা খুশি হয়েছিলেন তাঁদের এক জন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সচিব অনিলকুমার চন্দ জওহরকে চিঠি (২৮ নবেম্বর ১৯৩৮) দিয়ে জানালেন : গুরুদেব ঐ দিনই জওহরকে একটা চিঠি দিয়েছেন এবং শান্তিনিকেতনে আসতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে এই আমন্ত্রণের সবিশেষ কারণের উল্লেখ নেই। কিন্তু অনিল চন্দের চিঠি থেকে জানা যায় কারণটি কী। তিনি জওহরকে লিখলেন : বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ডাঃ সাহার ভাবনাচিন্তা খুবই মনে ধরেছে রবীন্দ্রনাথের। ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু আশা করেন। তাই জওহর অন্য কোন কাজে জড়িয়ে পড়ার আগে রবীন্দ্রনাথ চান তাঁর সঙ্গে কথা বলতে, পাছে কাজের চাপে জওহর আবার কমিটির কাজ থেকে দূরে সরে যান।

অনিলবাবু আরও লিখলেন : রবীন্দ্রনাথ চান পরের বছর এক আধুনিক মনোভাবাপন্ন কেউ কংগ্রেসের সভাপতি হোন। তা হলে প্ল্যানিং কমিটির রিপোর্ট সাদরে গৃহীত হবে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসে, শিকেয় তোলা থাকবে না। আর রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, হাই কমাণ্ডে সত্যিকার আধুনিক মনোভাবের মানুষ আছেন দু জন— জওহরলাল আর সুভাষচন্দ্র। প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ায় জওহরের সক্রিয় সহযোগিতা তো পাওয়া গেছেই। তাই রবীন্দ্রনাথ চান সুভাষ আবার কংগ্রেস সভাপতি হোন।

১৯১৪ সালে আহমেদনগর দুর্গে বন্দি জওহরলাল 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' লিখতে গিয়ে ন্যাশনাল প্ল্যানিং সম্পর্কে বেশ কিছু কথাই লিখেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে সুভাষের যে কোন ভূমিকা ছিল তা একটিবারও উল্লেখ করেন নি। এই নীরবতা আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। আর এই নীরবতা স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা

সংক্রান্ত সব দলিলেই সংক্রামিত হয়। পরিকল্পিত উন্নয়নের ছক রচনায় জওহরলালের ভূমিকা বিশাল। কিন্তু মৌল শিল্পের বিকাশ, ঐ শিল্পে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের প্রসার, বৃহৎ শিল্প আর কুটীর শিল্পের বিকাশের মধ্যে সমন্বয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প গড়ে তোলার নীতি, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণার প্রসার ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই সেই ছক সুভাষের তৈরি রূপরেখার অনুসারী। স্বাধীনতার পর পরিবার পরিকল্পনার প্রচলন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র যে তাঁর হরিপুরা ভাষণে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা আর আজ উল্লেখ করা হয় না সরকারি নথিপত্রে।

তের

কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষের ভূমিকা সম্পর্কে জওহরলালের একটি মন্তব্য শুধু আমাদের কৌতূহলই উদ্রেক করে না, বিস্ময়ও জাগায়। আহমেদনগর দুর্গে বন্দি জওহর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেন :

১৯৩৮ সালে কংগ্রেস চীনে এক দল চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তখন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ বসু। জাপান জার্মানি বা ইতালির বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোন ব্যবস্থা নিক তা তাঁর মনঃপূত ছিল না। কিন্তু কংগ্রেসে এবং দেশের মধ্যে মানুষের মনোভাব এমনই ছিল যে তিনি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করেন নি। চীন এবং অন্য যারা ফ্যাসিস্ত ও নাৎসি আক্রমণের বলি হয়েছিল তাদের প্রতি কংগ্রেসের সহানুভূতির অন্যান্য প্রকাশকেও তিনি বাধা দেন নি। তাঁর সভাপতিত্বের আমলে আমরা এমন অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করি, এমন অনেক বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করি যাতে তাঁর সম্মতি ছিল না, কিন্তু তিনি বিনা প্রতিবাদে সেই সব

মেনে নিয়েছিলেন কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সেগুলির পিছনে ছিল গভীর আবেগ অনুভূতি। (ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া: নবম অধ্যায়।)

ঠিক তার আগেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখে কংগ্রেসের বিদেশ নীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন জওহর। সেখানে কারো নাম উল্লেখ না করে বলেছেন: এ দেশেও এমন লোক আছেন যাঁরা চান না সাধারণতন্ত্রী স্পেন ও চীন, আবিসিনিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার পাশে আমরা দাঁড়াই। তাঁরা বলেন, ইতালি জার্মানি বা জাপানের মতো শক্তিশালী দেশকে চটিয়ে লাভ কী? ব্রিটেনের প্রত্যেক শত্রুকেই বন্ধু বলে গণ্য করতে হবে। রাজনীতিতে আদর্শবাদের ঠাঁই নেই। স্পষ্ট করে না বললেও বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, এই মন্তব্যের লক্ষ্য সুভাষ। ফ্যাসিস্ত ইতালি নাৎসি জার্মানি এবং সাম্রাজ্যবাদী জাপানের প্রতি সুভাষের দুর্বলতা ছিল, জওহরের এই ইঙ্গিত এখানে খুব একটা প্রচ্ছন্ন নয়।

১৯৪১ সালে দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর জার্মানি বা জাপানের সঙ্গে সুভাষের সম্পর্ক এখানে আলোচ্য নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর আগে ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা কী তা বিচার করে দেখা দরকার, কারণ জওহর সেই সময় সম্পর্কেই মন্তব্য করেছেন। প্রথমত দেখা যাক, সুভাষের সভাপতিত্বের আমলে ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে অথবা চীন বা চেকোশ্লোভাকিয়ার সমর্থনে কটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

হরিপুরা অধিবেশনেই চীনে জাপানের "সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের" তীব্র নিন্দা করে গৃহীত হল একটি প্রস্তাব। সেই সঙ্গে চীনের প্রতি সমর্থন জানাতে ডাক দেওয়া হল জাপানি পণ্য বয়কটের। বিদেশ নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবেও আমরা দেখতে পাই ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন নীতির নিন্দা এবং সেই ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদকে তোয়াজ করার জন্য ব্রিটেনের সমালোচনা। জওহর চীনে মেডিকেল মিশন পাঠাবার যে প্রস্তাবটির কথা বলেছেন সেটি গৃহীত হয় বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির

বৈঠকে (১৫-১৯মে ১৯৩৮)। সুভাষই তাতে সভাপতিত্ব করেন। ঠিক হল, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ও নার্স সহ চীনে একটি মোটর অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট পাঠানো হবে। তার নেতৃত্বে থাকবেন ডাঃ এম অটল। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গড়া হল একটি কমিটি। তার সদস্য সুভাষ, ডাঃ জীবরাজ মেটা, ডাঃ সুনীল চন্দ্র বসু, ডাঃ আর এম লোহিয়া এবং জি পি হাথীসিং (আহ্বায়ক)।

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জানিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করল দিল্লি বৈঠকে (২১ সেপ্টেম্বর-২ অক্টোবর ১৯৩৮)। জওহর এই বৈঠকে ছিলেন না, তিনি তখন বিদেশে। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা হরণের জার্মান অপপ্রয়াসের তীব্র নিন্দা করা হল এই প্রস্তাবে। কংগ্রেস সভাপতি তারপর চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট বেনেসের কাছে একটি সহানুভূতি-সূচক তারবার্তা পাঠালেন। তার বয়ান: স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপনার দেশের বীর জনগণ যে সংগ্রাম চালাচ্ছে তার প্রতি গভীর সহানুভূতি জানিয়ে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। আমরা আশা করি, মানুষের প্রকৃতির উত্তম দিকটিই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে এবং আসন্ন বিপর্যয় থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করবে। আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রশংসা গ্রহণ করুন।

জওহরের ভাষ্য যদি মেনে নিতে হয় তবে বলতে হয়, এই সব প্রস্তাব বা উদ্যোগে সুভাষের আন্তরিক সায় ছিল না, বাধ্য হয়ে সায় দিতে হয়েছিল তাঁকে। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে ঘনায়মান আন্তর্জাতিক সংকট সম্পর্কে সুভাষের সঙ্গে জওহর ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। এই সংকটকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে লাগাবার ব্যাপারে তিনি যতটা উৎসাহী ছিলেন জওহর বা অন্যেরা ততটা ছিলেন না। কিন্তু ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল সেই সময়ে, জওহরের এই অভিযোগের ভিত্তি কী?

ফ্যাসিবাদ ও কম্যুনিজম সম্পর্কে দুই নায়কের দৃষ্টিভঙ্গির

পার্থক্যের পরিচয় তো আমরা আগেই পেয়েছি। জওহর যেখানে এই দুই মতবাদের মধ্যে সরাসরি কম্যুনিজমকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত তখন সুভাষ চেয়েছিলেন এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়। 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে ১৯৩৪ সালে তাঁর এই মন্তব্য প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি করে। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার ঠিক মুখে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে সুভাষ একবার লণ্ডনে যান। তখন 'ডেইলি ওয়ার্কার' পত্রিকার তরফ থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার নেন কম্যুনিস্ট তাত্ত্বিক রজনী পাল্‌মে দত্ত। অনিবার্যভাবেই ওঠে ফ্যাসিজম ও কম্যুনিজমের কথা। সুভাষ তখন বলেন: তিন বছর আগে ঐ বই লেখার পর তাঁর রাজনৈতিক ধারণার আরও বিবর্তন ঘটেছে। আসলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, ভারতবাসী চায় দেশের স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনের পর সমাজতন্ত্রের পথে এগোতে। তিনি যখন ফ্যাসিজম ও কম্যুনিজমের সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন তখন এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। তিনি যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন সেটি হয়ত ঠিক যথাযথ ছিল না। তবে তিনি যখন ঐ বই লিখছিলেন তখনও ফ্যাসিবাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিযান শুরু হয় নি এবং ফ্যাসিবাদকে তাঁর মনে হয়েছিল জাতীয়তাবাদেরই একটা জঙ্গিরূপ।

হরিপুরা ভাষণেও এল বিদেশ নীতির প্রসঙ্গ। সুভাষ বললেন, আগামী কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা ঘটবে তাতে আমাদের সংগ্রামের সুবিধে হবে। তবে বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সঠিকভাবে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে, কী ভাবে তার সুযোগ নিতে হবে তা জানতে হবে। সেই সঙ্গে সুভাষ আরও বললেন, কোন্ দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি কোন্ ধরনের অথবা সেই রাষ্ট্রের চরিত্র কী তা দিয়ে আমাদের প্রভাবিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক দেশেই এমন কিছু নারী-পুরুষ পাওয়া যাবে যারা ভারতের স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে সহানুভূতিশীল। এ ক্ষেত্রে সুভাষ প্রস্তাব করলেন সোভিয়েত কূটনীতির পদাঙ্ক অনুসরণের। সোভিয়েত রাশিয়া কম্যুনিস্ট দেশ, কিন্তু সেই দেশের কূটনীতিকরা অ-সমাজতান্ত্রিক

দেশের সঙ্গে আঁতাত করতে অথবা যে কোন মহল থেকে সহানুভূতি ও সমর্থন নিতে দ্বিধা করেন নি।

সুভাষ যখন কোনও একটি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির অথবা রাষ্ট্রের চরিত্রের কথা বলছিলেন তখন প্রধানত তৎকালীন ইতালি বা জার্মানির কথাই বলছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই ধরনের দেশের সমর্থন বা সহানুভূতি আদায়ে তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু নাৎসিবাদ বা ফ্যাসিবাদের মূল নীতি কি তিনি সমর্থন করেছিলেন?

আবার দেখা যাক হরিপুরা ভাষণটিকে। ভবিষ্যৎ ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সুভাষ সেখানে বলছেন, স্বাধীনতা লাভের পরই কংগ্রেস বিলুপ্ত হবে না, বরং কংগ্রেসই নেবে দেশ গড়ার কাজ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে দেখা গেছে, যে-দল ক্ষমতা দখল করেছে তারাই নিয়েছে দেশ গড়ার কাজ। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে কি ভারতের স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকবে? সুভাষ তেমন আশঙ্কা করেন না। তিনি বলেন যদি রাশিয়া জার্মানি অথবা ইতালির মতো একটি মাত্র দলের অস্তিত্ব থাকে তবেই কোন দেশ স্বৈরতন্ত্রী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু (ভবিষ্যৎ ভারতে) অন্যান্য দল নিষিদ্ধ করার কোন কারণ নেই। তা ছাড়া দল (কংগ্রেস) হবে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে তৈরি, নাৎসি দলের মতো নয়—ঐ দলের ভিত্তি হল 'নেতাই সব'। একাধিক দল থাকবে, কংগ্রেসের থাকবে গণতান্ত্রিক ভিত্তি। ফলে ভবিষ্যৎ ভারত রাষ্ট্রের স্বৈরতন্ত্রী হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না।

এখন ফেরা যাক জওহরলাল চীনে মেডিকেল মিশন পাঠাবার যে প্রস্তাবের কথা টেনে সুভাষ সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন সেই প্রসঙ্গে। জওহরলাল বলেছেন কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে সুভাষের মানসিক বিরোধিতার কথা, তার কোন প্রমাণ তিনি দেন নি। কিন্তু জাপানের আচরণের নিন্দায় অথবা চীনের প্রতি সমর্থন জানাতে সুভাষের আপত্তি ছিল এমন প্রমাণ কোথায়? কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের আগে সুভাষ কিছু দিন কাটিয়েছিলেন ডালহৌসি

পাহাড় এলাকায় স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। সেই সময় 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। নাম : দূর প্রাচ্যে জাপানের ভূমিকা (সেপ্টেম্বর ১৯৩৭)।

ঐ প্রবন্ধে সুভাষ বিশ শতকের শুরুতে জাপানের নবজাগরণের প্রশংসা করে লিখলেন : নিজের জন্য এবং এশিয়ার জন্য জাপান অনেক কিছু করেছে। দূর প্রাচ্যে শ্বেতাঙ্গদের মর্যাদাকে সে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। শুধু সামরিক ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সে আজ পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে কোণঠাসা করেছে।

কিন্তু তারপর সুভাষের প্রশ্ন : কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পথে না গিয়ে, আর একটি গৌরবান্বিত, সুসংস্কৃত, প্রাচীন জাতিকে লাঞ্ছিত না করে কি এই সব করা যেত না? না, যেখানে প্রশংসা প্রাপ্য সেখানে আমরা জাপানের যতই প্রশংসা করি না কেন, আজ চীনের এই চরম পরীক্ষার দিনে আমাদের অন্তরের সব সমর্থন চীনেরই দিকে। তার নিজের জন্য আর মানবতার জন্যই চীনকে এখন বেঁচে থাকতে হবে। এই সংঘর্ষের চিতাভস্ম থেকেই সে আবার ফিনিক্সের মতো জেগে উঠবে অতীতের আরও অনেকবারের মতো।...আসুন, দূর প্রাচ্যের এই সংঘর্ষ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। নতুন যুগের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে ভারত সংকল্প গ্রহণ করুক যে সে সব দিকে জাতীয় প্রত্যাশা পূরণে প্রয়াসী হবে—কিন্তু অন্য দেশকে ধ্বংস করে নয়, সম্প্রসারণবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত পথে নয়।

এই রচনার মধ্যে আর যাই থাক, সাম্রাজ্যবাদী জাপানের প্রতি সহানুভূতি অথবা আক্রান্ত চীন সম্পর্কে ঔদাসীন্যের পরিচয় মেলে না। এর কয়েক মাস পরেই কংগ্রেসের প্রস্তাবে সায় দিতে মানসিক দিক থেকে সুভাষের আপত্তি থাকবে কেন?

সুভাষ যখন কংগ্রেস সভাপতি তখনই ঠিক হয় ১৯৩৮ সালের ৭, ৮ ও ৯ জুলাই পালিত হবে চীন দিবস হিসেবে। এই উপলক্ষে একটি আবেদন প্রচার করলেন সুভাষ ৩০ জুন। তাতে বললেন : চীনের জনগণের দিক থেকে বিচার করলে ৭ থেকে ৯ জুলাই তারিখের

ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম। এই দিনে অর্থ সংগ্রহের জন্য জোরদার প্রয়াস চালাতে আমি দেশের সব কংগ্রেস সংগঠনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। এই দিনে যদি ছোট চীনা পতাকা বিক্রি করা যায় তবে তা হবে চীনের জনগণের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার প্রতীক এবং অর্থ সংগ্রহেও রীতিমতো সুবিধে হবে। আমি আশা করি যেখানেই সম্ভব সেখানে এই তিনটি দিন চীনা পতাকা দিবস হিসেবে পালিত হবে।

সুভাষ আরও বললেন: আমি আশা করি আমরা যে-অর্থ সংগ্রহ করতে পারব তার দ্বারা অন্তত এক বছর আমাদের মেডিকেল মিশনের কাজ চলবে। চীনের ইতিহাসের অন্ধকারতম মুহূর্তে অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসাকর্মীর দল হবে চীনের মহান জনগণের প্রতি ভারতের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার নিদর্শন।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুখে চীনের জনগণের প্রতি সুভাষের ঔদাসীন্যের কোন প্রমাণ কি এই বিবৃতির মধ্যে মেলে?

এই প্রসঙ্গে আমরা জওহরের চীন সফর এবং সুভাষের প্রস্তাবিত চীন সফরের বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিতে পারি।

জওহর চীনে যান ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে। বেশি দিন থাকতে পারেন নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় ফিরে আসেন দিন বারো পরেই। তার কিছু দিন পরে অক্টোবরে সুভাষ চেষ্টা করেন চীনে যাওয়ার। কিন্তু তাঁর যাওয়া হয় নি। কেন যাওয়া হয় নি সে-কাহিনী রীতিমতো আকর্ষক। ইংরেজ সরকার দুই নায়ককে কী চোখে দেখতেন তার একটা আভাসও আমরা এই কাহিনী থেকে পাই।

হুয়াং চাও-চীন কলকাতায় চীনের কনসাল-জেনারেল ছিলেন ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোয় এসে অনেক বছর পরে হুয়াং সেই সময়ের কাহিনী শোনান এক দিন। তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছবার পর সুভাষ এক দিন তাঁকে টেলিফোন করে ডেকে পাঠান। দু জনে একান্তে কথা হল। হুয়াংকে সুভাষ বললেন, তাঁর আশঙ্কা তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হবে। তাঁর

পক্ষে কি চীনে রাজনৈতি কআশ্রয় পাওয়া সম্ভব? হুয়াং উত্তর বললেন, সুভাষ যদি চীনে কয়েক দিনের সফরে যেতে চান তবে তাঁকে সব রকম সুবিধেই দেওয়া হবে। কিন্তু সুভাষকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে চীন সরকার রাজি হবেন বলে মনে হয় না। কারণ ব্রিটিশ সরকার হল চীনের মিত্র।

সুভাষ তখন বললেন, তিনি এই দিকটা ভেবে দেখবেন। দিন-কয়েক পরে তিনি হুয়াংকে আবার টেলিফোন করে জানালেন, হুয়াং যা বলেছেন তাই ঠিক। ভারত থেকে নিষ্ক্রমণের অন্য কোন পথের কথা ভাবতে হবে তাঁকে।

চীন যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট চেয়ে সুভাষ যে আবেদন করেছিলেন সে-বিষয়ে ইংরেজ সরকারের আমলাদের মধ্যে যে 'নোট' চালাচালি হয়েছিল তা অবশ্য আরও বেশি আকর্ষক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে পাঠানো ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর অধিকর্তার 'নোটে' (১৮ অক্টোবর ১৯৩৯) সুভাষের আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করা হল। কারণ সুভাষকে শত্রুর চর বলে সন্দেহ করা হয়ে থাকে। জনরব যে তিনি জার্মানি থেকে টাকা পেয়েছেন। হয়ত বেশি টাকা তিনি এখনও পান নি। তবে যদি ঠিকমতো 'কাজ করে দিতে পারেন' তবে আরও টাকা পাবেন।

ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর কর্তার আরও সন্দেহ : সুভাষ প্রথমে গিয়ে নামবেন ব্যাঙ্ককে। সেখান থেকে টাকাকড়ি ও নির্দেশ নিয়ে সুভাষ চীনে যাবেন। তারপর কিছু দিন তাঁর হদিশ মিলবে না। পরে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে উন্নান বা শ্যামে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা হিসেবে। গত ছয় মাস ধরে বাংলা এবং অন্য প্রায় সব প্রদেশে বিপ্লবীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন সুভাষ। উন্নান বা শ্যামের ঐ বিপ্লবী আন্দোলন যুক্ত হবে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে। সুতরাং এই ধরনের 'বিপজ্জনক ব্যক্তিকে' পাসপোর্ট দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করলেন গোয়েন্দা প্রধান।

তাঁর অভিমতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর স্বরাষ্ট্র সচিবকে

জানালেন, বাংলা সরকারকে অনুরোধ করা হোক সুভাষকে যেন পাসপোর্ট দেওয়া না-হয়। সেই সঙ্গে বললেন, এর ফলে সমালোচনার ঝড় উঠবে; বিশেষ করে যখন কিছু দিন আগেই জওহরলাল নেহরুকে চীনে যেতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনও ঝুঁকি নিতে চান নি স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

স্বরাষ্ট্র সচিবও মেনে নিলেন এই সুপারিশ। তবে দেখা গেল আর একটা বাড়তি আশঙ্কাও রয়েছে। চীনে গিয়ে সুভাষ হয়ত রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। সুভাষের মতো বিপ্লবী চীন বা মধ্য এশিয়ায় ঘুরে বেড়াবেন, হয়ে উঠবেন সম্ভাব্য বিপদের উৎস তা সরকার চান না। ভারতে তাঁর থাকাই ভালো, প্রয়োজনে তাঁকে 'জালে' তোলা যাবে।

সেই সঙ্গে বললেন স্বরাষ্ট্র সচিব: নেহরুর যত ত্রুটিই থাক, সুভাষ বোসের তুলনায় তিনি একেবারে অন্য ধরনের মানুষ। সুতরাং তাঁর সফরের নজির দেখিয়ে সুভাষকে চীন সফরের অনুমতি দিতে আমরা বাধ্য নই। (ক্রসরোডস্ পরিশিষ্ট।)

সুতরাং চীন যাওয়া আর হল না সুভাষের।

চৌদ্দ

মিউনিক চুক্তি করে ১৯৩৮ সালে ব্রিটেন ফ্রান্স আর ইতালি যখন হিটলারের জার্মানিকে চেকোশ্লোভাকিয়া টুকরো টুকরো করার অনুমতি দিল, তখন ইউরোপের ঐ দেশটির কথা ব্রিটেনের অনেকে তেমন জানতই না। তাই যে-দেশটিকে হিটলারি সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা মেটাতে বিসর্জন দেওয়া হল সেটিকে বলা হয়েছিল "দূরের ঐ একটা দেশ"—ভ্যাট ফার-অ্যাওয়ে কান্ট্রি। সুভাষচন্দ্র ইউরোপের মানুষ ছিলেন না, কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া তাঁর কাছে "দূরের দেশ" ছিল না। ১৯৩৩ সালে ইউরোপে নির্বাসিত হওয়ার পর তিনি যে-সব দেশে

একাধিকবার গিয়েছিলেন তার একটি হল চেকোশ্লোভাকিয়া। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য প্রথমে তিনি যান অষ্ট্রিয়া, তারপরেই চেকোশ্লোভাকিয়া। ইংরেজের চরেরা সর্বত্রই সুভাষকে অনুসরণ করছিল। তবু তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা প্রচারে ছিলেন শঙ্কাহীন। যে দুটি দেশ তখন এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিল তারা হল হাঙ্গেরি আর চেকোশ্লোভাকিয়া। প্রাগে যাওয়ার ভিসা পেতে সুভাষের কোন অসুবিধে হয় নি। একটা উদ্দেশ্য ছিল কার্লসবাডে (কার্লোভিভারি) চিকিৎসা, কিন্তু রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার সুযোগ তিনি ছাড়লেন না। যাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ বেনেস। তিনি তখন বিদেশ মন্ত্রী।

ইউরোপের নানা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী ছিলেন সুভাষ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর, অর্থাৎ মাত্র বছর পনের আগে স্বাধীনতা অর্জন করেছে চেকোশ্লোভাকিয়া। তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে যেমন ঐ দেশের মানুষের আগ্রহ ছিল স্বাভাবিক, তেমনি সুভাষচন্দ্রেরও ছিল পাল্টা আগ্রহ। অষ্ট্রিয়ার হাত থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার লড়াই চালাবার জন্য প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চেকোশ্লোভাকিয়ার বাইরে গঠিত হয়েছিল 'চেকোশ্লোভাকিয়া লিজিওন।' এই বাহিনী গঠনে সাহায্য মিলেছিল ব্রিটেন আর রাশিয়ার। সুভাষচন্দ্র এই বাহিনীর কাজ সম্পর্কে বিশদ খোঁজ খবর নিলেন। পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী মনে রাখলে সুভাষের এই কৌতূহল একটি বিশেষ তাৎপর্য পায়।

প্রাগে থাকতে তিনি গড়ে তুললেন চেকোশ্লোভাক-ভারত সমিতি। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক লেনসি হলেন সেই সমিতির সভাপতি। সমিতির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিলেন সুভাষ। তুলে ধরলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী। আর সুভাষ যে শুধু বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত বা রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গেই কথাবার্তা বললেন তা নয়। সাধারণ মানুষের কাছেও ভারতের কথা পৌছে দিতে তিনি ছিলেন সমান আগ্রহী। কিট্টি কুর্তি নামে এক মহিলার সঙ্গে পরিচয়

হল তাঁর। কিট্টি এক চেক ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী। ঐ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সুভাষের। তাঁদের কাছেও ভারতের অবস্থার কথা তুলে ধরতেন তিনি।

তবে স্বভাবতই রাজনৈতিকদের সম্পর্কেই বেশি আগ্রহী ছিলেন সুভাষ। তাঁদের একজন ডঃ বেনেস। পরেও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে সুভাষের। পরে তিনিই হয়েছেন চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট। ১৯৩৮ সালের গোড়ায় (১৯ জানুয়ারি) আর একবার প্রাগে গেলেন সুভাষ। সেখানে চেক-ভারত সমিতি তাঁকে সংবর্ধনা জানাল। দেখা হল ডঃ বেনেসের সঙ্গে। কথাবার্তা হল প্রায় এক ঘণ্টা ধরে। এর কয়েক মাস পরেই হল মিউনিখ চুক্তি আর তারপর চেকোশ্লোভাকিয়ার সুডেটেনল্যাণ্ড দখল করে নিল জার্মানি।

সেই অকটোবরেই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পত্রিকার একটি প্রবন্ধ লিখলেন সুভাষ—"ইউরোপের সংকট : বিপর্যয়ের বিশ্লেষণ"। সেই প্রবন্ধে সুভাষ দেখাতে চাইলেন, কীভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রশ্রয়েই হিটলারের জার্মানি এত আগ্রাসী হয়ে উঠেছে।

এই পটভূমি মনে রাখলে কীভাবে আমরা জওহরলালের এই অভিযোগ মেনে নিতে পারি যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি সহানুভূতি জানাতে সুভাষ কুণ্ঠিত ছিলেন অথবা ডঃ বেনেসের কাছে সহানুভূতি-সূচক বার্তা তিনি পাঠিয়েছিলেন অন্য লোকের চাপে পড়ে?

জাপান বা জার্মানি সম্পর্কে সুভাষের গোপন দুর্বলতা নিয়ে জওহর যেমন কটাক্ষ করেছেন 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়ায়', তেমনই জওহর সম্পর্কে কটাক্ষ দেখতে পাই সুভাষের 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইয়ে। ১৯৩৫-৩৬ সালে জওহরের ইউরোপ সফর প্রসঙ্গে সুভাষ লিখছেন : ইউরোপ সফরের সময় লণ্ডন ও প্যারিসের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করলেন। তাঁর ভবিষ্যৎ নীতি প্রভাবিত হয়েছিল এই সব যোগাযোগের দ্বারা। রাশিয়া বা আয়ারল্যাণ্ডে তিনি যাননি। কারণ ঐ দুটি দেশ তখন ব্রিটিশ-বিরোধী বলে গণ্য। আগের বারে ইউরোপ সফরে এসে অবশ্য তিনি মস্কো গিয়েছিলেন। ইতালি বা জার্মানির মতো দেশে

যোগাযোগের ব্যাপারটা তিনি সযত্নে এড়িয়ে যান। এর কারণ হয়ত ফ্যাসিজম ও ন্যাশনাল সোস্যালিজম সম্পর্কে তাঁর বিরাগ অথবা তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে তাঁর বন্ধুদের চটাতে চাননি। (সুভাষ এই কথাগুলি লেখেন ১৯৪৩ সালে।)

সুভাষ সম্পর্কে জওহরের কটাক্ষের ভিত্তি যদি দুর্বল হয় তবে জওহর সম্পর্কে সুভাষের কটাক্ষের ভিত্তিও খুব সবল নয়। ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদ সম্পর্কে জওহরলালের বিরাগ ছিল আন্তরিক। এই সব দেশের তখনকার নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারে তিনি কোন উৎসাহই দেখান নি।

কমলার মৃত্যুর পর ইন্দিরাকে সঙ্গে নিয়ে দিন কয়েক নিরিবিলিতে কাটাচ্ছেন জওহর। একদিন লোসানে ইতালির কনসাল এলেন হঠাৎ। কমলার মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন মুসোলিনি। অবাক হলেন জওহর। মুসোলিনির সঙ্গে কখনও তাঁর দেখা হয় নি ; অন্য কোন যোগাযোগও নেই। তবে হঠাৎ কেন এই শোকবার্তা।

কয়েক সপ্তাহ আগেই অবশ্য রোম থেকে এক বন্ধু জানিয়েছিলেন, জওহরের সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী মুসোলিনি। তখন অবশ্য রোমে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। পরে যখন দেশে ফেরার কথা ভাবছেন তখন আবার মুসোলিনি জানালেন একই বাসনা। কিন্তু জওহর খুব আগ্রহী নন। ফ্যাসিস্ত নেতাটি সম্পর্কে তাঁর বিরাগ ছিল। কিন্তু মানুষটি কেমন তা জানতে যে কৌতূহল না-ছিল তা নয়। কিন্তু তখন চলছে ইতালির আবিসিনিয়া অভিযান। জওহরের ভয় হল, এই সময়ে যদি তিনি মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করেন তা হলে তার নানা রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। ব্যাপারটা নিজেদের প্রচারের কাজেও লাগাতে পারে ইতালি। ১৯৩১ সালে ইতালির একটি সংবাদপত্রে গান্ধীজির যে ভুয়া সাক্ষাৎকার বেরিয়েছিল তার কথা মনে পড়ে গেল জওহরের। তিনি জানিয়ে দিলেন, তিনি অপারগ।

কমলার মৃত্যুর পর দেশে ফিরছেন। ফিরতে হচ্ছে রোম হয়েই।

কে এল এম বিমান এসে পৌঁছিল বিকেলে। ইতালি মন্ত্রিসভার তরফে এক চিঠি পেলেন বিমান বন্দেরই। মুসোলিনি দেখা করতে চান জওহরের সঙ্গে সেদিনই সন্ধ্যা ছটায়। জওহর আবার অবাক। তিনি তো আগেই জানিয়ে দিয়েছেন তিনি অপারগ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এখন তাঁর মনের অবস্থা এমন নয় যে তিনি এই ধরনের দেখাসাক্ষাতে আগ্রহী হতে পারেন।

কিন্তু উচ্চ পদস্থ যে সরকারি কর্মীটি নিয়ে এসেছিলেন চিঠিটি তিনি জানালেন সাক্ষাতের সব ব্যবস্থা পাকা। সত্যি কথা বলতে কি, যদি তিনি জওহরকে নিয়ে যেতে না-পারেন তবে তাঁর চাকরি যেতে পারে। ঘণ্টাখানেক চলল টানাটানি। আর কিছু তো নয় কয়েক মিনিটের ব্যাপার। কমলার মৃত্যুতে ব্যক্তিগতভাবে সমবেদনা জানাতে চান মুসোলিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন জওহরই। গেলেন না। পরে অবশ্য ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন মুসোলিনিকে।

হরিপুরা কংগ্রেসের পর ক্লান্ত জহওর যখন ইউরোপ গেলেন তখন নাৎসি সরকারের তরফে এল আমন্ত্রণ। নাৎসিবাদ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের কথা জানেন জার্মান সরকার। তবু তাঁরা চান জওহর নিজে এসে দেখে যান জার্মানির অবস্থা। সরকারি অতিথি হিসেবে তিনি যেতে পারেন, আবার নিজের খরচেও যেতে পারেন। দরকার হলে যেতে পারেন নাম গোপন করেও। যাওয়ার পর জার্মানির যেখানে খুশি যাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে তাঁর।

কিন্তু জওহর বললেন, না, ধন্যবাদ। আমি যেতে পারছি না। জার্মানি না-গিয়ে গেলেন চেকোশ্লোভাকিয়া।

জার্মানি বা ইতালি সম্পর্কে ছুঁৎমার্গের মনোভাব সুভাষের ছিল না। সুভাষ নিজেই লিখছেন: ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে এই লেখক রাশিয়া ছাড়া প্রায় গোটা ইউরোপেই ঘুরেছেন এবং ভার্সাই চুক্তির পর ইউরোপের অবস্থা সরেজমিনে দেখেছেন। বহুবার তিনি ইতালি আর জার্মানিতে গেছেন এবং রোমে বেশ কয়েকবার মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে।

তিরিশের দশকের মাঝামাঝি ইতালি আর জার্মানি ইউরোপে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেশ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই সময়ে সুভাষের জার্মান সঙ্গী ডঃ লোথার ফ্রাঙ্ক লিখেছেন, হিটলার আর মুসোলিনি কীভাবে জার্মান আর ইতালির মানুষের মধ্যে প্রবল জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন সেই সম্পর্কেই আগ্রহী ছিলেন সুভাষ। কোন বিশেষ দেশের মুক্তি সংগ্রামের আদর্শগত দিকের চেয়ে ক্ষমতা দখলের কৌশল সম্পর্কেই বেশি কৌতূহল ছিল তাঁর। এই জন্যই তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল ইতালির মুক্তি সংগ্রামের পথিকৃৎ, গুপ্ত সংগঠন 'কার্বোনিয়েরি' সম্পর্কে জানার।

সুভাষ তখন কিছু দিনের জন্য গেছেন ফ্রান্সে। সেখানে ইতালি সরকারের তরফে আমন্ত্রণ গেল। রোমে ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন হচ্ছে, সুভাষকে আসতে হবে। তেত্রিশ সালের ডিসেম্বরে রোমে এলেন সুভাষ। ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করলেন মুসোলিনি স্বয়ং। তারপর অনুষ্ঠিত হল ওরিয়েন্টাল স্টুডেন্টস কংগ্রেস। এই সম্মেলনে ভাষণ দিলেন সুভাষ। এই সময়েই মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। ভ্রাতুষ্পুত্র অশোকনাথকে চিঠি লিখে (১৫ জানুয়ারি ১৯৩৪) জানালেন: মুসোলিনির সঙ্গে দু'বার দেখা হয়েছে। তবে এ-কথাটা এখন গোপন রেখ।

সুভাষ গোপন রাখতে চাইলেও রোমে তাঁর কার্যকলাপ, এশিয় ছাত্রদের সম্মেলনে ভাষণ, মুসোলিনি ও ইতালির অন্যান্য নেতা ও বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ ব্রিটিশ সরকারের চরেদের কাছে গোপন থাকে নি। বৃটিশ সরকার এর ফলে উদ্বিগ্নও হয়ে উঠেছিলেন যথেষ্ট।

মুসোলিনির সঙ্গে পরেও দেখা করেছেন সুভাষ। 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' প্রকাশের পর নিজে হাতে উপহার দিয়ে এসেছেন। একবার সাক্ষাতের সময় সুভাষকে জিজ্ঞেস করলেন মুসোলিনি: সত্যিই কি আপনি মনে করেন ভারত অল্প দিনের মধ্যে স্বাধীন হবে?

সুভাষ বললেন, হ্যাঁ।

মুসোলিনি জানতে চাইলেন: স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপনি কোন পথে এগোতে চান—সংস্কার আন্দোলনের পথে, না বৈপ্লবিক পথে?

সুভাষ বললেন: বৈপ্লবিক পথই পছন্দ আমার। তা শুনে মুসোলিনি বললেন: তা হলে সম্ভাবনা আছে। একটু থেমে জানতে চাইলেন আবার: সেই বিপ্লবের জন্য কোন পরিকল্পনা আছে আপনার?

সুভাষ একটু চুপ করে আছেন দেখে মুসোলিনি বললেন: এখনই আপনার উচিত বিপ্লবের একটা পরিকল্পনা তৈরি করা আর তারপর সেই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য অবিরাম কাজ করে যাওয়া।

সুভাষ প্রথম জার্মানিতে যান ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো তাঁর এই জার্মানি সফরেরও উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে ঐ দেশের সমর্থন সংগ্রহ। তাঁর এই উদ্দেশ্য যে সফল হয় নি তা আমরা জানি। হিটলার বা গোয়েবলসের সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারেন নি তিনি, ন্যাশানাল সোসালিস্ট পার্টির নেতাদের মধ্যেও ভারত বিরোধী মনোভাবে পরিবর্তন আনতে পারেন নি। তিরিশের দশকের নাৎসি জার্মানি তাঁকে হতাশ করেছিল। নাৎসি চরিত্র যে তিনি প্রথমে বুঝতে পারেন নি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই সময়ে সুভাষের জার্মান সফর সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। প্রথমবার জার্মানি গিয়ে তিনি সরকারি অতিথিশালায় থাকতে রাজি হন নি আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও। তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রবাসী ভারতীয়, বিশেষত ভারতীয় ছাত্রদের অভাব-অভিযোগ জার্মান সরকারের গোচরে আনতে। ফ্র্যাঙ্ক লোথারের চেষ্টায় তিনি যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন নাৎসি পার্টির বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে। এই গোষ্ঠীই সুভাষকে আশ্বস্ত করেছিল যে

বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে তারা সাহায্য করবে অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম দিয়ে। সে উদ্যোগ অবশ্য সফল হয় নি শেষ পর্যন্ত।

সুভাষ যখন সে-যাত্রায় ইউরোপ ছেড়ে যান তখন নাৎসি জার্মানি বা নাৎসিবাদ সম্পর্কে তাঁর মনে কোন মোহ ছিল বলে মনে হয় না। মিউনিখের ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ডঃ ফ্র্যাঙ্ক থিয়েরফেল্ডারের কাছে অষ্ট্রিয়ার বাডগাস্টাইন থেকে তিনি যে চিঠি লেখেন (২৫ মার্চ ১৯৩৬) তা থেকেই স্পষ্ট হয় এ কথা।

সুভাষ লিখেছেন : ১৯৩৩ সালে আমি যখন প্রথম জার্মানিতে যাই তখন আমার আশা ছিল, যে জার্মান জাতি নিজের জাতীয় সামর্থ্য ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কে নতুনভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে তারা স্বভাবতই অন্যান্য যে সব জাতি একই ধরনের সংগ্রামে প্রয়াসী তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি বোধ করবে। আজ ক্ষোভের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আমি এই বিশ্বাস নিয়ে ভারতে ফিরছি যে জার্মানির নব্য জাতীয়তাবাদ শুধু সংকীর্ণ ও স্বার্থান্ধই নয়, উদ্ধতও। মিউনিখে হার হিটলারের সাম্প্রতিক বক্তৃতার মধ্যেই মেলে নাৎসি দর্শনের সারাৎসার। নতুন বর্ণ দর্শনের ভিত বৈজ্ঞানিক বিচারে বড়ই দুর্বল। এই দর্শনে সাধারণ-ভাবে শ্বেতাঙ্গদের এবং বিশেষভাবে জার্মানদের গুণগান করা হয়েছে। হার হিটলার বলেছেন, 'শ্বেতাঙ্গরাই সারা দুনিয়া শাসন করবে' এই হল বিধির বিধান। কিন্তু ইতিহাসের সত্য এই যে, এখনও পর্যন্ত ইউরোপ যতটা এশিয়ার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে এশিয়ানরা ইউরোপের উপর করেছে তার চেয়ে বেশি। মোঙ্গল, তুর্কি, আরব (মুর), হুন ও অন্যান্য এশিয় জাতি যে বারবার ইউরোপ অভিযান করেছে সে-কথা বিবেচনা করলেই আমার যুক্তির সারবত্তা বোঝা যাবে। এক জাতি আর এক জাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে—আমি এই মতের সমর্থক বলে এ-কথা বলছি না, বলছি শুধু এই কারণেই যে ইতিহাসের দিক থেকে এ-কথা ভ্রান্ত যে ইউরোপ ও এশিয়া পরস্পর শান্তিতে থাকতে পারে না। সুতরাং যখন দেখি জার্মানির নব্য জাতীয়তাবাদের মূলে রয়েছে স্বার্থ ও বর্ণগত ঔদ্ধত্য তখন আমরা ব্যথিত হই। হার

হিটলার তাঁর 'মাইন কাম্‌ফ্' বইয়ে জার্মানির সাবেক ঔপনিবেশিক নীতির নিন্দা করেছেন। কিন্তু নাৎসি জার্মানি আবার শুরু করেছে তার ভূতপূর্ব উপনিবেশের কথা বলতে।

ব্রিটেনের মন রাখার জন্য জার্মানি যে ভারত এবং ভারতের মানুষকে বারবার সমালোচনা করছে তাতেও গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সুভাষ ঐ চিঠিতে। লিখেছেন: হার হিটলারের বক্তৃতার পর আমি ভারতের সংবাদপত্রে কঠোর ভাষায় এক বিবৃতি পাঠিয়েছি। আশা করি যথাসময়ে তা প্রকাশিত হবে। কিন্তু ইউরোপ ছেড়ে যাওয়ার আগে আমি এই কথা বলে যেতে চাই যে, জার্মানি ও ভারতের মধ্যে সমঝোতার জন্য আমি এখনও কাজ করে যেতে প্রস্তুত। এই সমঝোতা হবে আমাদের আত্মমর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের অধিকারের জন্য যখন আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছি, যখন আমরা আমাদের চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ, তখন অন্য কোন দেশের কাছ থেকে কোন অপমান অথবা আমাদের বর্ণ বা সংস্কৃতির উপর কোন আক্রমণ আমরা সহ্য করতে পারি না।

পনের

জওহরলাল তখন প্রধানমন্ত্রী। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের বিখ্যাত সাংবাদিক তায়া জিনকিন জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, পণ্ডিতজি, ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় আপনার ভূমিকা সম্পর্কে আপনার নিজের বক্তব্য কী?

জওহর জবাব দিলেন: দেখুন, আমি যা করেছিলাম ভালোর জন্যই করেছিলাম। এ-কথা ঠিক, সুভাষকে আমি ডুবিয়েছিলাম। আমি এটা করেছিলাম কারণ ভারতের বিকাশের পথ সম্পর্কে যার যে ধারনাই থাক না কেন, সেই মুহূর্তে গান্ধীই ছিলেন ভারতবর্ষ।

গান্ধীজিকে দুর্বল করে ফেললে ভারতই দুর্বল হয়ে পড়বে। সুভাষ যা করতে চাইছিল তার সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল, তবু আমি গান্ধীজির মতকেই মেনে নিলাম। আমার মনে হয় এ-কথা বলা ঠিকই হবে যে সুভাষকে আমি ডুবিয়েছিলাম। (কিন্তু) আমাদের দু'জনের যে কোন এক জনের চেয়ে ভারতের কথাই আগে ভাবতে হবে।

ত্রিপুরীর কংগ্রেস অধিবেশনের তেইশ বছর পরে কোন স্মৃতিমেদুর দিনে জওহরের এই মন্তব্য। আর ত্রিপুরীর ঠিক পরেই সুভাষচন্দ্র কী বলছেন এই প্রসঙ্গে? জওহরের সঙ্গে চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। গান্ধীজির সঙ্গে চলছে পত্রালাপ এবং তারবার্তা বিনিময়। সেই সময়ে বিহারের জামাডোবা থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয়নাথ বসুকে লিখলেন (১৭ এপ্রিল ১৯৩৯): এই সংকটে ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং আমাদের আদর্শের প্রতি আর কেউই এতটা ক্ষতি করে নি যতটা করেছে পণ্ডিত নেহরু। সে যদি আমাদের সঙ্গে থাকত তবে—তবে আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হতাম। কিন্তু ত্রিপুরীতে সে প্রাচীন পন্থী নেতাদের সঙ্গে হাত মেলাল। দ্বাদশ বড় বড় নেতার কার্যকলাপের চেয়ে আমার বিরুদ্ধে জওহরের প্রকাশ্য প্রচারেই আমার ক্ষতি হয়েছে বেশি। সত্যিই, বড় দুঃখের ব্যাপারটা।

নানা সঙ্গত কারণেই জওহরলালের গুণমুগ্ধ কম্যুনিস্ট নেতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল দুই নায়কেরই তিনি জীবন চরিতকার। ত্রিপুরী সংকটে জওহরের ভূমিকা, তার ভাষায়, পণ্ডিতজীর রাজনৈতিক জীবনের একটি কলঙ্ক বিশেষ। কিন্তু নেহরু পরিবারের উদ্যোগে যিনি সরকারিভাবে জওহরের জীবনী লিখেছেন সেই সর্বেপল্লী গোপাল অবশ্য তা মনে করেন না। দার্শনিক রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের ঐতিহাসিক পুত্র যে জওহরের ভূমিকার সমর্থনে এগিয়ে আসবেন তা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু তিনি যাবতীয় দোষই চাপিয়ে দিয়েছেন সুভাষের উপর। শুধু এটুকু হলেও হয়ত বলার তেমন কিছু থাকত না। আমরা অবাক হয়ে দেখি ডঃ গোপাল বলছেন, এই

সংকটের মূল কারণ সুভাষ বোস নামে লোকটি ছিলেন অত্যন্ত অধৈর্য, জেদি। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষারও কোন শেষ ছিল না। পট্টভি সীতারামাইয়াকে সভাপতি নির্বাচনে হারিয়ে দিয়ে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এই নেতাটি ভাবতে শুরু করে দিলেন যে তাঁর এখন দেশের নেতৃত্ব হাতে তুলে নেওয়ার সময় এসে গেছে। তা ছাড়া দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সুভাষ ছিলেন নিতান্তই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী। এমন কি দেশের নানা ব্যাপারেও তাঁর মতামতের উপর ভরসা রাখা যেত না। ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদের নিন্দাতেও বিশেষ সরব ছিলেন না সুভাষ। সুতরাং জওহর তাঁকে সমর্থন করবেন কী করে?

প্রশ্ন এখানে একটাই। জওহরের ভূমিকা সমর্থন করতে হবে বলেই কি ঐতিহাসিক নামধারী কোন জীবনীকারকে সুভাষের পর্যায়ের নেতাকে এই ভাষায় আক্রমণ করতে হবে? অবশ্য বইয়ের ভূমিকাতেই ডাঃ গোপাল সাফাই গিয়ে রেখেছেন: "নেহরু সম্পর্কে আমার বস্তুনিষ্ঠ হওয়া কঠিন।...তবে আমি চেষ্টা করেছি।" চেষ্টার নমুনা এই।

কিন্তু বিচারের আগে ত্রিপুরী কংগ্রেসের আগে-পরের ঘটনাবলী আবার স্মরণ করা দরকার।

১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে গুজরাটের বরদৌলিতে বসল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। বৈঠকের পর সভাপতি সুভাষ কলকাতা ফিরে গেলেন। তারপর যা ঘটল তা জওহরের ভাষাতেই শোনা যাক।

কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি হওয়ার জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে চাপ দিতে লাগলেন গান্ধীজি, জওহর এবং আরও কয়েকজন। তিনি রাজি হচ্ছিলেন না। সুভাষ ফিরে যাওয়ার পর দিন জওহরও ফিরে যাবেন। তিনি গেলেন গান্ধীজি এবং অন্যান্যদের কাছে বিদায় নিতে। গান্ধীজির কুটিরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন ওঁরা কয়েকজন। মৌলানা আর বল্লভভাই ছাড়া আর কারা ছিলেন জওহরের মনে নেই। মৌলানা আবার জানালেন তিনি দায়িত্ব নিতে

দ্বিধান্বিত। তখন বল্লভভাই বললেন, মৌলানা যদি শেষ পর্যন্ত রাজি না হন তবে ডাঃ পট্টভিকে (সীতারামাইয়া) দাঁড়াতে বলা হোক। এই পদের জন্য ডাঃ পট্টভির নাম জওহরের পছন্দসই ছিল না। তাই তিনি বল্লভভাইয়ের প্রস্তাবের বিরোধিতা না করে আবার বললেন, মৌলানাকেই রাজি করাতে হবে। এলাহাবাদে ফিরে গিয়ে জওহর এক তারবার্তায় জানতে পারলেন যে মৌলানা রাজি হয়েছেন। (সুভাষকে চিঠি, ৩ এপ্রিল)।

বরদৌলি থেকে বল্লভভাই যে বিবৃতি দিলেন (২৫ জানুয়ারি) তা থেকেও আমরা মোটের উপর একই কাহিনী পাই। তবে এখানে আমরা জানতে পারি পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়ে আলাপ আলোচনায় কারা উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজি তো ছিলেনই, তা ছাড়া ছিলেন জওহর, মৌলানা আজাদ, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বুলাভাই দেশাই, আচার্য কৃপালনি। আমরা এ কথাও জানতে পারি বল্লভভাইয়ের বিবৃতি থেকে যে, এই যে এঁরা ক'জন এক সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন তা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা করে নয়, এটা নেহাৎই আকস্মিক।

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলার সময় পরবর্তী সভাপতি পদের প্রার্থী নিয়ে আলাপ আলোচনা কংগ্রেসের ইতিহাসে অভূতপূর্ব কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু বরদৌলিতে আমরা দেখলাম এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যখন হচ্ছে তখন কংগ্রেস সভাপতি সেখানে উপস্থিত নেই, ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য শরৎচন্দ্র বসুও নেই। সুভাষের অনুপস্থিতিতে তাঁর উত্তরসূরি নিয়ে আলোচনা কেন? জওহরের কাছে লেখা চিঠিতে এই প্রশ্ন তুললেন শরৎচন্দ্র (৪ এপ্রিল), বললেন: ভুল বোঝাবুঝির শুরু তো বরদৌলিতে। সেখানে কিছু লোক একত্র হয়ে ঠিক করলেন পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি কে হবেন। বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটির কিছু সদস্যকে কোন কথা না জানিয়েই করা হল এই সব ব্যবস্থা। কংগ্রেস তো বটেই, কংগ্রেস সভাপতি নিজেও যে ব্যাপারে বিশেষভাবে জড়িত এবং যে

ব্যাপারে তাঁর নিজের কিছু বলার থাকতে পারে সে বিষয়ে তাঁকে কিছু না জানানোর কোন যৌক্তিকতা আছে বলে কি তুমি মনে কর? অবশ্য সেই যৌক্তিকতা যদি না হয় তাঁর প্রতি নিছক ব্যক্তিগত বিদ্বেষ অথবা তাঁর সঙ্গে খোলা মনে কথা বলার অনিচ্ছা।

বল্লভভাইয়ের বিবৃতি থেকে অবশ্য একটা যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কয়েকজন নেতা মিলে আলাপ-আলোচনা কতটা 'আকস্মিক' তারও হদিশ মিলতে পারে। বল্লভভাই বলে দিয়েছেন: সেই আলাপ-আলোচনায় ঠিক হল, মৌলানা যদি শেষ পর্যন্ত জিদ ধরে থাকেন যে তিনি দাঁড়াবেন না তা হলে বাকি থাকছেন একমাত্র ডাঃ সীতারামাইয়াই, কারণ আমাদের সুস্পষ্ট মত হল শ্রীসুভাষ বসুকে পুনর্নির্বাচিত করার কোন প্রয়োজন নেই।

পট্টভির নাম প্রস্তাব করেছে কোন কোন প্রদেশ কংগ্রেস। সুভাষকে পুনর্নির্বাচিত করার প্রস্তাবও এসেছে অনেক প্রদেশ থেকে। তবু যখন ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সদস্য ঠিকই করে ফেলেছেন যে সুভাষকে পুনর্নির্বাচিত করার কোন প্রয়োজন নেই তখন পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি মনোনয়ন নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হতে পারে কী করে?

ইতিমধ্যে মৌলানা আজাদ গান্ধীজির কাছে গিয়ে আর্জি জানিয়ে অব্যাহতি পেয়েছেন এবং পট্টভিকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতি দেওয়ার আগে অবশ্য তিনি বল্লভভাই প্রমুখ কয়েক জনের সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছেন। তারপরেই সুভাষ প্রথম বিবৃতি দিলেন, জানালেন কেন তিনি প্রার্থী হতে চান (২১ জানুয়ারি)।

তারপর ঘটল সেই অভূতপূর্ব ঘটনা। ওয়ার্কিং কমিটির সপ্তরথী বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জয়রাম দাস দৌলতরাম, জে বি কৃপালনি, যমুনালাল বাজাজ, শংকররাও দেও এবং বুলাভাই দেশাই সুভাষের পুনর্নির্বাচনে বিরোধিতা করে বিবৃতি দিলেন, প্রকাশ্যে আহ্বান জানালেন পট্টভিকে সমর্থন জানাতে (২৪ জানুয়ারি)।

পর দিনই পাল্টা বিবৃতি দিলেন সুভাষ। বললেন, ওয়ার্কিং কমিটির ঐ সাত সদস্য নাকি যথেষ্ট বিচার বিবেচনার পরই পট্টভিকে প্রার্থী করেছেন। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি বা কমিটির অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেন নি।

বল্লভভাই প্রমুখের বক্তব্য: অস্বাভাবিক অবস্থা ছাড়া পর পর দুবার কারো সভাপতি হবার নিয়ম নেই। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে ভোটাভুটি হয় না, সর্বদাই তা সর্বসম্মত হয়েছে। সুভাষ এই দুই যুক্তিরই বিরোধিতা করলেন। বললেন, একই ব্যক্তির একাধিক বার সভাপতি হওয়ার বহু নজির আছে। (জওহরলাল ১৯২৯ এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে সভাপতি হয়েছেন তিনবার। ১৯৩৮ সালেও তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল, ত্রিপুরীর জন্যও তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিলেন স্বয়ং গান্ধীজি। জওহরই রাজি হন নি।) কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে কখনও ভোটাভুটি হয় নি এ কথাও ঠিক নয়। সুভাষ নিজেই বহুবার ভোট দিয়েছেন।

তারপর সরাসরি অভিযোগ আনলেন সুভাষ: ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার এদেশে যে ফেডারেল ব্যবস্থা চালু করতে চায় কংগ্রেস তার ঘোরতর বিরোধী। অথচ কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থী গোষ্ঠী আগামী বছরে এই বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপস করতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ঐ দক্ষিণপন্থীরা চায় না যে একজন বামপন্থী কংগ্রেস সভাপতি হোন। সুভাষের এই অভিযোগে মৌচাকে ঢিল পড়ল।

এই বাদ প্রতিবাদ যখন চলছে তখন আলমোড়ায় বিশ্রাম নিচ্ছেন জওহরলাল। কুমায়ুন পাহাড়ের এই এলাকায় খবরের কাগজ পৌঁছয় দেরিতে। খবরাখবর অনেকটাই পাওয়া যায় রেডিও মারফৎ। তাই কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়ে যে-বিতর্কের ঝড় বইতে শুরু করেছিল তা থেকে কিছুটা দূরে ছিলেন জওহর। এই বিতর্কে নিজেকে জড়াতে

প্রথমে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক বিবৃতি দিলেন ২৬ জানুয়ারি।

গোড়াতেই জানিয়ে দিলেন জওহর, কোন বিশেষ ব্যক্তির সমর্থনে বা বিরোধিতা করে এই বিবৃতি তিনি দিচ্ছেন না। বিতর্কের ধারা যে পথে চলছে তা পরিতাপজনক। সব ভুল প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। তিনি অবস্থাটা একটু পরিষ্কার করে দিতে চান।

জওহর বললেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটাভুটির বিরোধী নন তিনি। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, আসল প্রশ্ন হল নীতির প্রশ্ন। কিন্তু আসন্ন নির্বাচনে তিনি তো কোন বড় নীতির লড়াই দেখতে পাচ্ছেন না। ইংরেজ সরকারের প্রস্তাবিত ফেডারেশনের প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ফেডারেশন নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ কোথায়? এই প্রস্তাবের তো সুস্পষ্ট বিরোধিতা করছে কংগ্রেস। আসন্ন ভোটাভুটিতে জয় যাঁরই হোক, ফেডারেশন প্রস্তাবের হার হবেই।

কিন্তু সুভাষ যে সভাপতি পদে আবার প্রার্থী হলেন সে ব্যাপারে কী বলেন জওহর? তার নিজের ভাষায় শোনা যাক: কঠিন সঙ্কটের সময় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করার কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে। বহু বারই আমি পদত্যাগ করতে চেয়েছি, কারণ আমার মনে হয়েছে কোন পদে না থেকেই আমি আরও বেশি করে কংগ্রেসের সেবা করতে পারব, আমাদের সংগ্রামে সহায়তা করতে পারব। এই বছরও কোন কোন সহকর্মী আবার আমাকে বলেছিলেন সভাপতি পদে প্রার্থী হতে। আমি একেবারেই রাজি হই নি। কেন হইনি তার কারণ আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না। এই সব এবং অন্যান্য কারণে আমার সুস্পষ্ট মত ছিল সুভাষ বাবুর প্রার্থী হওয়া উচিত নয়। আমার মনে হয়েছিল এই সময়ে কোন পদ আঁকড়ে থাকলে তাঁর ও আমার আসল কাজের ক্ষমতা কমে যাবে। আমি সুভাষ বাবুকেও বলেছি সে-কথা।

এর পরে জওহর জানালেন কেন তিনি মৌলানা আজাদের

নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। মৌলানা আজাদের ব্যক্তিগত গুণা-বলীর তারিফ করে জওহর বললেন, এখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মোকাবিলার পক্ষে তিনিই ছিলেন উপযুক্ত নেতা।

কিন্তু জওহরলাল এবং তার পরের দিন রাজেন্দ্র প্রাসাদের বিবৃতির পরও সুভাষ তাঁর বক্তব্যে অটল রইলেন। তিনি দুটি প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এলেন। ফেডারেল প্রস্তাবের আপসহীন বিরোধিতা এবং কংগ্রেসের মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতি নীতি। ওয়ার্কিং কমিটির ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী যাকে সভাপতি করতে চান তাঁর প্রতি যদি জনসমর্থন না থাকে তবে কি প্রতিনিধিরা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী ভোট দিতে পারবেন না? এই স্বাধীনতা যদি প্রতিনিধিদের না থাকে তবে কংগ্রেস তো আর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান থাকবে না।

আরও একটি কথা বললেন সুভাষ। কংগ্রেসের মধ্যে যদি ঐক্য বজায় রাখতে হয়, দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের যদি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হয় তবে কংগ্রেস সভাপতি হওয়া উচিত এমন এক জনের যার প্রতি দুই গোষ্ঠীরই আস্থা আছে। জওহরলাল নেহরু এই ভূমিকা পালন করেছেন চমৎকার ভাবে। তারপর বিনয়ের সঙ্গে সুভাষ দাবি করলেন, অনেকটা কম পরিমানে হলেও তিনিও কিছুটা নিশ্চয়ই করেছেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২৯ জানুয়ারি। সেদিন বসুবাড়িতে বসেছে প্রীতিভোজের আসর। শরৎচন্দ্রের ছেলে অশোকনাথের বউ-ভাত। বহু লোকের আনাগোনা। প্রধান আলোচ্য, অবশ্যই কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের ফল। সন্ধের পর থেকে খবর আসতে শুরু করল। এক একটা প্রদেশের খবর আসে টেলিফোনে, উত্তেজনা বাড়ে। নিমন্ত্রিত এক অতিথি কংগ্রেস নেতা হলেও ছিলেন সুভাষ বিরোধী। তিনি এক সময় সুভাষকে বললেন, এই নির্বাচনে সুভাষের জয়ের আশা নেই। সুভাষ তখন তাঁকে হিসেব কষে দেখিয়ে দিলেন, কীভাবে তিনি জিতবেন। রাতের দিকেই খবর এল এল, সুভাষের হিসেবই ঠিক—তিনিই জিতেছেন শ' দুই ভোটের ব্যবধানে।

বাকিটা এখন ইতিহাস। সারা দেশ বিস্ময়ে হতবাক। কংগ্রেসের দীর্ঘ ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটে নি। সকলেই জানতেন প্রকাশ্যে না বললেও পট্টভি ছিলেন গান্ধীজির আশীর্বাদপুষ্ট। জওহরলালের কাছে লেখা বল্লভভাইয়ের একটি চিঠিতে (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) আমরা দেখতে পাই, জানুয়ারিতে ওয়ার্কিং কমিটির সপ্তরথীর বিবৃতিটির পিছনে ছিল মহাত্মার প্রেরণা। আর সভাপতি নির্বাচনের পর গান্ধীজি তো আর কিছুই গোপন রাখলেন না। এই পরাজয় যতটা না পট্টভির পরাজয় তার চেয়ে বেশি আমার পরাজয়, আর যাই হোক, সুভাষবাবু তো আর দেশের শত্রু নন'—এই সব মহাত্মাবাণী এখন ইতিহাসের চিরকালীন সম্পদ। ৩১ জানুয়ারির বিখ্যাত বিবৃতিতে গান্ধীজি সোজাসুজিই বললেন: গোড়া থেকেই তিনি সুভাষের পুনর্নির্বাচনের বিপক্ষে ছিলেন। কেন ছিলেন, তা অবশ্য তিনি বললেন না। তবে জানালেন, সুভাষের নানা বিবৃতিতে যে-সব যুক্তি দেখানো হয়েছে তা তিনি মানেন না। সহকর্মীদের সম্পর্কে সুভাষের কটাক্ষ তাঁর ভালো লাগেনি এই পর্যন্ত। সুভাষের প্রতিদ্বন্দ্বী পট্টভি অনেক দিন পরে যখন কংগ্রেসের ইতিহাস লিখতে বসেন তখন তাঁর মন্তব্য: গান্ধীজি যে কেন সুভাষের প্রতি এতটা বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই কারণ অনুসন্ধান আবার পরে করা যেতে পারে। আপাতত আমরা দেখি জওহর-সুভাষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুভাষের এই জয়ের কী প্রভাব পড়ল। আমরা ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি নিয়ে আলোচনার সময়েই দেখেছি, সুভাষের পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে কতটা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবির সচিব অনিলকুমার চন্দ জওহরকে যে চিঠি লেখেন (২৮ নভেম্বর ১৯৩৮) তাতেই জানা যায় কবির মনের কথা। অনিলকুমার আর একটি কথাও জানালেন জওহরকে। সুভাষের পুনর্নির্বাচনের প্রস্তাব করে একটি চিঠি কবি লিখেছেন গান্ধীজিকে। (পরে গান্ধীজি এই চিঠি পাঠিয়ে দেন জওহরকেই।)

গান্ধীজি ও জওহরকে কবির এই চিঠি লেখার পিছনে ছিলেন

মেঘনাদ সাহা। তিনি তখন ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির অন্যতম সদস্য। কবিকে তিনি বুঝিয়েছিলেন, প্ল্যানিং কমিটির কাজ সার্থক করে তুলতে হলে সুভাষের পুনর্নির্বাচন অত্যন্তই জরুরি। কিছু দিন আগেও (১৯ নভেম্বর) কবি এই ন্যাশনাল প্ল্যানিং সম্পর্কে জওহরের মত জানতে চেয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। গান্ধীজির কাছে কবির চিঠিটি নিয়ে যান কবির আর এক সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথের এই আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে, কংগ্রেস সভাপতি পদে সুভাষের বিতর্কিত নির্বাচনের পর জওহর ও সুভাষের দেখা হবে শান্তিনিকেতনে। সুভাষের জয় সত্ত্বেও এ কথা কারো কাছেই অস্পষ্ট ছিল না যে, এই জয়ের মধ্যে দিয়েই সব সংকটের মীমাংসা হয় নি, কারণ গান্ধীজি মেনে নিতে পারেন নি এই জয়কে, পারেন নি অন্যান্য গান্ধীবাদী নেতাও। জওহর যথারীতি ছিলেন মাঝামাঝি একটা জায়গায়। এই অবস্থায় কী করণীয় সে বিষয়ে সুভাষ তাই কথা বলতে চেয়েছিলেন জওহরের সঙ্গে।

শান্তিনিকেতনের আলোচনায় যে খুব বেশি লাভ হয় নি তা জওহরের কথাতেই স্পষ্ট। ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি সুভাষকে একটি 'ব্যক্তিগত ও গোপনীয়' চিঠি লেখেন। তাতে জওহর বলছেন: শান্তিনিকেতনে এক ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় ধরে কথা হল বটে, কিন্তু আমরা অবস্থাটা পরিষ্কার করে নিতে পেরেছি বলে মনে হল না। অনেক অনিশ্চয়তা রয়েছে। ভবিষ্যৎ ঘটনা কী রূপ নেবে তা আমি জানি না। এখন এই ঘটনাবলীর জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের, তবে এই সব ঘটনাও তো নির্ভর করছে আমাদের উপর, বিশেষ করে তোমার উপর।

শান্তিনিকেতনের আলোচনা সম্পর্কে আমরা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই জওহরকে লেখা সুভাষের সেই ২৮ মার্চের বিশাল ও বিখ্যাত চিঠি থেকে। সুভাষ লিখছেন: তোমার হয়ত মনে আছে, শান্তিনিকেতনে যখন আমাদের দেখা হল তখন আমি তোমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, যদি ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যের সহযোগিতা পেতে

আমরা ব্যর্থ হই তবে কংগ্রেস সংগঠন চালাবার দায়িত্ব আমাদের এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না। তুমি তখন আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলে। পরে আমার কাছে দুর্বোধ্য কোন কারণে তুমি যেন সশরীরেই চলে গেলে অপর পক্ষে। অবশ্যই তোমার তা যাওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু তা হলে তোমার সমাজতন্ত্র আর বামপন্থার কী হবে ?

শেষের এই বাক্যটিতে শাণিত বিদ্রূপ ও অভিযোগের সুর মোটেই অস্পষ্ট নয়। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের পরেই শুরু হয়ে যায় জওহর-সুভাষ পত্রালাপ, যাকে আমরা পত্রযুদ্ধও বলতে পারি। আর এই চিঠিপত্র লেখার পর্বেই দুই নায়কের সম্পর্কের জটিলতাও আমাদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে।

ষোল

এই পত্রালাপ পর্বেই আমরা দেখি জওহর ও সুভাষ একে অপরকে সরাসরি অভিযুক্ত করছেন। আবার দেখি উত্তর-ত্রিপুরী পর্বে সংকট মোচনের জন্য জওহরের পরামর্শ চাইছেন সুভাষ বারবার। সুভাষের সঙ্গে একমত হতে না পারলেও সুভাষের আহ্বানে তাঁর কাছে ছুটে যাচ্ছেন জওহর। গান্ধীজিকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নরম করার জন্য চিঠি লিখেছেন জওহর, এমনকি সুভাষকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা থেকে ছুটছেন সোদপুরে।

এই পত্রযুদ্ধের সূচনা করেন জওহরলালই। ফেব্রুয়ারির চার তারিখের চিঠিতে তিনি লিখলেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সুভাষ যে জিতেছেন তাতে কিছু ভালো হয়েছে আবার কিছু মন্দও হয়েছে। ভালো যা হয়েছে তা তিনি স্বীকার করে নিচ্ছেন, কিন্তু মন্দ দিকটা নিয়েই তিনি চিন্তিত। এখন যে সংকট ঘনিয়ে উঠেছে তা পরিতাপের

বিষয়। তিনি এখন কী করবেন তা স্থির করার আগে তিনি সুভাষের কাছে জানতে চান সুভাষ কংগ্রেসকে নিয়ে কী করতে চান। অতঃপর জওহর কতকগুলি প্রশ্ন তোলেন, যেগুলিকে নিছক প্রশ্ন না বলে অভিযোগই বলা ভালো।

জওহর লিখলেন: বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী, ফেডারেশন ইত্যাদি অনেক কথাই এখন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সুভাষের সভাপতিত্বের সময় (১৯৩৮ সালে) ওয়ার্কিং কমিটিতে এই সব প্রশ্ন নিয়ে কোন আলোচনা হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। সুভাষ কাকে বামপন্থী মনে করেন আর কাকেই বা দক্ষিণপন্থী। এইসব শব্দ এমনভাবে ব্যবহার হচ্ছে যাতে বাড়ছে বিভ্রান্তি। সুভাষের নীতিটা আসলে কী? ফেডারেশন-বিরোধিতা, বেশ ভালো কথা, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই তো ফেডারেশনের বিপক্ষে।

অভিযোগের পর অভিযোগ করেন জওহর। তিনি গত বছর বিদেশ থেকে যেসব চিঠি ও রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তার প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত করেননি সুভাষ। গত বছরে এ আই সি সি অফিসের কাজকর্মের খুবই অবনতি ঘটেছে। সুভাষ কিছুই দেখেন না। চিঠিপত্র টেলিগ্রাম পড়ে থাকে, জবাব মেলে না। ফলে সংগঠনের কাজ ঝুলে থাকে। কত সমস্যা রয়েছে—দেশীয় রাজ্যের সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, কিসান-মজুরের সমস্যা। এই সব বিষয়ে নানা জনের নানা মত। সুভাষের মতটা কী? তারপর রয়েছে বিদেশ নীতির প্রশ্ন। জওহর তাকে খুবই গুরুত্ব দেন। তাঁর ধারণা, সুভাষও দেন। কিন্তু সুভাষ ঠিক কী নীতি অনুসরণ করতে চান তা জওহর জানেন না। ইংরেজ সরকারকে চরমপত্র দেওয়ার কথা বলেছেন সুভাষ। জওহর চান প্রস্তাবটাকে আরও বিশদভাবে পেশ করুন সুভাষ। কীভাবে এগোতে চান সুভাষ? চরমপত্র দেওয়ার পরই বা কী হবে?

জওহর তাই একটা প্রস্তাব দিলেন। এইসব সমস্যা নিয়ে সুভাষ একটা বিশদ 'নোট' তৈরি করুন। সেই 'নোট' প্রকাশ করার

দরকার নেই, কিন্তু সুভাষ যাঁদের সহযোগিতা চান তাঁদের দেখাতে পারেন সেটা। সেই সঙ্গে জওহর কিছু নীতি আদর্শের কথাও বললেন। রাজনীতিতে নীতি আদর্শ আছে তো বটেই, সেই সঙ্গে আছে সহকর্মীদের একে অপরকে বোঝবার, একের অপরের প্রতি আস্থার প্রশ্ন। বোঝাপড়া আর বিশ্বাস যদি না থাকে তবে সহযোগিতায় লাভ হয় না।

সুভাষ গয়া থেকে এই চিঠির উত্তর দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই (১০ ফেব্রুয়ারি)। কিন্তু জওহরের নানা প্রশ্নের উত্তর আপাতত তিনি দিলেন না। কারণ ত্রিপুরী অধিবেশনের তখন আর দেরি নেই। এই সময় নতুন করে কোন বিতর্ক শুরু করতে চাইলেন না সুভাষ। কারণ বিশদ উত্তর দিতে গেলে সহকর্মীদের সম্পর্কেই কটাক্ষ করতে হয়। তবে সুভাষ এটুকু লিখলেন : প্রিয় জওহর, কলকাতাতেই তোমার দীর্ঘ চিঠি পেয়েছি। তুমি আমার অনেক ত্রুটির কথা বলেছ। আমি আমার ত্রুটি সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। তবে এই কাহিনীর আর একটা দিকও আছে। তা ছাড়া আমাকে যেসব বাধাবিপত্তির মোকাবিলা করতে হয়েছে তার কথাও ভুললে চলবে না।

এই চিঠিতে এর বেশি কিছু না বললেও সুভাষ কিন্তু তাঁর ২৮ মার্চের চিঠিতে জওহরের উত্থাপিত বেশ কিছু প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তখন ত্রিপুরীতে যা হওয়ার হয়ে গেছে। সুভাষ তখন পুরোপুরি আক্রমণাত্মক। তাই সুভাষ লিখলেন : জওহর বলেছেন সুভাষের সভাপতিত্বের সময় ফেডারেশন প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে কংগ্রেসে আলোচনাই হয় নি। এ এক আশ্চর্য অভিযোগ। জওহর তো ঐ সময় ছ'মাস দেশের বাইরে ছিলেন। ভুলাভাই দেশাইয়ের লণ্ডনে এক বক্তৃতা নিয়ে যখন ঝড় উঠল তখন সুভাষ ওয়ার্কিং কমিটিতে বলেছিলেন ফেডারেশনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস আবার প্রস্তাব গ্রহণ করুক। জওহর কি জানেন তখন বলা হয়েছিল তার আর দরকার নেই? জওহর কি জানেন পরে সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শেষ পর্যন্ত

ফেডারেশনের সমালোচনা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল?

এরপর সুভাষ আরও সরাসরি আঘাত করেন জওহরকে। জওহর বলেছেন, সুভাষ নির্দেশদানকারী সভাপতির চেয়ে ওয়ার্কিং কমিটিতে কার্যত স্পিকার হিসেবে কাজ চালিয়েছেন। এই মন্তব্যকে সুভাষ বললেন, অত্যন্ত হৃদয়হীন। তারপর জানতে চাইলেন এ কথা বলা কি খুব অন্যায় হবে যে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সময় জওহরই দখল করে রাখতে চাইতেন? যদি ওয়ার্কিং কমিটিতে জওহরের মতো বাক্যবাগীশ আর একজন সদস্য থাকতেন তবে হয়ত কাজকর্ম কোন দিন শেষই হত না! তা ছাড়া জওহর এমন আচরণ করতেন যেন তিনিই সভাপতিত্ব করছেন। সুভাষ অবশ্যই তাঁকে থামিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু তা হলে সকলের সামনে তাঁদের বিরোধ ঘটত। খুব খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, জওহর ওয়ার্কিং কমিটিতে যেন অনেকটা আদুরে ছেলের মতো ভাবভঙ্গি করতেন, প্রায়ই রেগে যেতেন। কিন্তু এত সব করে কী লাভ হত? সাধারণত জওহর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেতেন, তারপর শেষ কালে করতেন আত্মসমর্পণ।

সুভাষের আমলে এ আই সি সির অফিসের কাজকর্মের অনেক অবনতি ঘটেছে, জওহরের এই অভিযোগেরও জবাব দিলেন সুভাষ। লিখলেন: সভাপতির কাজ সম্পর্কে জওহরের কী ধারণা তা তিনি জানেন না। সুভাষের মতে, কংগ্রেস সভাপতি একজন পদমর্যাদায় ভূষিত কেরানি বা সেক্রেটারির চেয়ে বেশি কিছু। সভাপতি হিসেবে জওহরের অভ্যেস ছিল নিজেই সেক্রেটারির কাজ করা। অন্য সভাপতিদেরও তাই করতে হবে এমন কোন কথা নেই। তা ছাড়া সুভাষের একটা বড় অসুবিধে ছিল, এ আই সি সি অফিস ছিল অনেক দূরে (দিল্লিতে) আর কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তাঁর পছন্দসই লোক ছিলেন না। এ-কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে সভাপতির প্রতি সম্পাদকের যেমন অনুগত হওয়া উচিত, সাধারণ সম্পাদক সুভাষের প্রতি তেমন অনুগত ছিলেন না। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃপালনিজিকে (জে বি কৃপালনি) তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া

হয়েছিল। সুভাষ চেয়েছিলেন কাজের সুবিধের জন্য এ আই সি সির দপ্তরের কিছুটা কলকাতায় নিয়ে আসতে। তখন জওহর ও অন্যান্যরাই আপত্তি করেছিলেন। আর এখন তাঁরাই এ আই সি সি দপ্তরের কাজের ত্রুটির জন্য দোষ দিচ্ছেন সুভাষকে! যদি সত্যিই এ আই সি সির কাজে অবনতি ঘটে থাকে তবে তার জন্য দায়ী সাধারণ সম্পাদক, সুভাষ নন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সুভাষের নীতি কী, তা জানতে চেয়েছিলেন জওহর। সুভাষ উত্তরে বললেন: ভুল হোক আর ঠিক হোক আমার মনে হয় আমার একটা নীতি আছে। ত্রিপুরী অধিবেশনে সংক্ষিপ্ত ভাষণে আমি সেই নীতির আভাস দিয়েছি দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। সবিনয়ে বলতে চাই, ভারত এবং বিশ্বের অবস্থার কথা ভেবে এখন আমাদের সামনে সমস্যা একটাই—কর্তব্য একটাই—ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে স্বরাজের প্রশ্নটির চূড়ান্ত ফয়সালা করা। সেই সঙ্গে চাই সারা দেশ জুড়ে দেশীয় রাজ্যের মানুষের আন্দোলনের একটা ব্যাপক পরিকল্পনা। ত্রিপুরীরও আগে শান্তিনিকেতনে এবং আনন্দ ভবনে (এলাহাবাদে) যখন আমাদের দেখা হয়েছিল তখন আমার চিন্তাভাবনার সুস্পষ্ট আভাস আমি তোমাকে দিয়েছিলাম বলে আমার মনে হয়। এখানে এই মাত্র আমি যা লিখলাম সেটা অত্যন্ত নির্দিষ্ট একটা নীতি। আমি এখন তোমায় জিজ্ঞেস করতে পারি তোমার নীতিটা কী?

এই পত্রযুদ্ধের প্রসঙ্গে আমরা আবার ফিরে আসব, আসতেই হবে। আর শুধু এই পত্রযুদ্ধ নিয়েই একটা গোটা বই লিখে ফেলা যায়। কিন্তু তার আগেও ঘটে যাচ্ছে অনেক কিছু। ত্রিপুরীতে অধিবেশন বসবে মার্চের গোড়ায়। তার আগে কথা বলা দরকার গান্ধীজির সঙ্গে। ফেব্রুয়ারির পনের তারিখে সুভাষ গেলেন ওয়ার্ধায়। নির্বাচনে জয়ের পর মহাত্মা যে মন্তব্য করেছেন তাতে সুভাষ রীতিমতো ব্যথিত। গান্ধীজি এই পরাজয়কে তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় বলে মনে করেছেন। সুভাষ সে-কথা মানেন না। তিনি বললেন, নীতির প্রশ্নে গান্ধীজির

সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধায় তিনি কারো চেয়ে কম যান না। সুভাষ সম্পর্কে গান্ধীজির মত যাই হোক না কেন, সুভাষ সর্বদাই চাইবেন তাঁর আস্থা অর্জন করতে; কারণ "আমি যদি অন্য সকলের আস্থা অর্জন করি অথচ ভারতের মহত্তম মানুষটির আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হই তবে সেটা হবে আমার পক্ষে অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার।"

কিন্তু ওয়ার্ধায় গান্ধী-সুভাষ আলোচনায় কিছুই এগোল না। শুধু স্থির হল, ২২ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ধায় বসবে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। কিন্তু নতুন সংকট দেখা দিল এই বৈঠককে কেন্দ্র করেই।

ওয়ার্ধা থেকে কলকাতা ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন সুভাষ। তাই ওয়ার্কিং কমিটির নির্ধারিত বৈঠকের আগের দিন বল্লভভাইকে টেলিগ্রাম পাঠালেন: কাইণ্ডলি সি মাই টেলিগ্রাম টু গান্ধীজি। রিগ্রেটফুলি ফিল ওয়ার্কিং কমিটি মাস্ট বি পোস্টপোন্‌ড টিল দা কংগ্রেস। প্লিজ কনসাল্ট কলিগস্ অ্যাণ্ড ওয়্যার ওপিনিয়ন।

বৈঠক স্থগিত রাখার এই অনুরোধের অন্য ব্যাখ্যা করলেন বল্লভ-ভাই এবং ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। ত্রিপুরী অধিবেশনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার কথা ছিল এই বৈঠকে। তা ছাড়া কিছু প্রথামাফিক কাজকর্মও আছে। সুভাষ অসুস্থ ঠিকই, সে তো আগের কয়েকটি বৈঠকের সময়েও তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাই বলে কি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকই হবে না কংগ্রেসের আগে? বল্লভভাই প্রমুখ সিদ্ধান্তে এলেন, তাঁদের প্রতি সভাপতির আস্থা নেই। জওহর ব্যাখ্যা করলেন, সুভাষ তাঁর অনুপস্থিতিতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রথামাফিক কাজকর্ম করতেও মানা করে দিয়েছেন। (সুভাষ পরে এই ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ করেন। টেলিগ্রামের বয়ান থেকেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। তা ছাড়া সুভাষ বলেছেন: তিনি বৈঠক স্থগিত রাখার কোন হুকুম দেন নি, অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতেও বলেছেন।)

এর পরই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ইস্তফা। তাঁরা হলেন:

মৌলানা আজাদ, সরোজিনী নাইডু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, বল্লভভাই, যমুনালাল বাজাজ (কোষাধ্যক্ষ), জয়রামদাস দৌলতরাম, গফফর খান (সীমান্ত গান্ধী), ভুলাভাই দেশাই, পট্টভি সীতারামাইয়া, হরেকৃষ্ণ মহতাব, শংকররাও দেও এবং জে বি কৃপালনি। বাকি রইলেন শরৎচন্দ্র বসু এবং অবশ্যই জওহরলাল নেহরু।

এই ইস্তফা উপলক্ষেই জওহরের চরিত্রের হ্যামলেট-সুলভ দোলাচলচিত্ততা, তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব যেন সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুভাষ জওহরকে প্রশ্ন করেন চিঠিতে: যাঁরা ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ইস্তফা দিলেন তাঁরা আমাকে সোজাসুজি একটা চিঠি লিখেছেন—ভদ্র চিঠি—তাতে তাঁদের বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। আমার অসুস্থতার কথা ভেবে আমার সম্পর্কে একটি নির্দয় কথাও বলেন নি, যদিও ইচ্ছে করলে তাঁরা আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে পারতেন। কিন্তু তোমার বিবৃতি—তাকে আমি কী বলব? কড়া ভাষা আমি ব্যবহার করব না, শুধু বলব এই বিবৃতি তোমার অযোগ্য। (২৮ মার্চের চিঠি।)

ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে একত্রে ইস্তফাপত্র না পাঠিয়ে ঐ ২২ ফেব্রুয়ারিই ওয়ার্ধা থেকে একটি পৃথক বিবৃতি দিলেন জওহর। তাতে আবার এল সভাপতি নির্বাচন নিয়ে মতবিরোধের প্রসঙ্গ। নানা প্রসঙ্গে সুভাষের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের কথাও বললেন। তারপর জানালেন: ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হল না, এখন হচ্ছেও না। এই কমিটির আপাতত অস্তিত্ব নেই। সম্ভবত সভাপতি নিজে স্বাধীনভাবে কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব রচনা করতে চান। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এমন কি রুটিন মাফিক কাজকর্ম শেষ করার জন্যও এখানে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হল না। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবেও তাঁকে আর সাহায্য করা সম্ভব নয়।

জওহর আরও বললেন: আগেও আমার বারবার মনে হয়েছে আমার ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকা উচিত নয়। বর্তমান অবস্থায় আরও

দৃঢ় হয়েছে সেই বিশ্বাস। কারণ আমার মনে হয় না আজকের পট-ভূমি ও পরিবেশে বিশেষত সভাপতি নির্বাচনের পর আমি এই উচ্চ-পদের দায়িত্ব নিতে পারি।

লক্ষ্য করার বিষয় হল, জওহর একবারও সরাসরি বললেন না যে 'আমি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ইস্তফা দিচ্ছি।' অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাইলেন এই কমিটিতে তাঁর থাকা সম্ভব নয়। সুভাষ তাই জওহরকে লেখেন: তোমার বিবৃতি পড়ে ধারণা হয় আরও বারো জন সদস্যের মতো তুমিও ইস্তফা দিয়েছ—কিন্তু এখনও পর্যন্ত সাধারণ লোকের কাছে তোমার অবস্থাটা রয়ে গেছে রহস্যময়। যখন কোনও সঙ্কট আসে প্রায়ই তুমি মনস্থির করতে পারো না—ফলে সাধারণ মানুষের মনে হয় তুমি যেন দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছ।

সুভাষের এই অভিযোগ কি সত্যি? দেখা যাক জওহর নিজে কী বলেন। যখন ওয়ার্কিং কমিটির নির্ধারিত বৈঠক হল না সেই ২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সদস্যরা একে একে ফিরে গেলেন সেবাগ্রাম থেকে ওয়ার্ধায়। সেবাগ্রাম আশ্রমে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন জওহর এবং কৃপালনি। বাকি সদস্যরা ওঁদের ফেলে রেখে দুটো গাড়িতে করে চলে গেলেন। কৃপালনি আর জওহর তখন ঠিক করলেন হেঁটেই যাবেন এই পাঁচ মাইল পথ। কতবারই তো এই পথ দিয়ে গেছেন। মোটরে, গরুর গাড়িতে, পায়ে হেঁটেও। একটা স্মৃতি চারণের মেজাজ এসে গেল যেন তাঁর।

ওয়ার্ধায় ফিরে গিয়েই জওহর বিবৃতিটি দেন। তারপর একটি লেখাও শুরু করেন। রচনাটির নাম: লখনউ থেকে ত্রিপুরী—কংগ্রেস রাজনীতির পর্যালোচনা :১৯৩৬-৩৯। তাতে এক জায়গায় জওহর লেখেন:

খবরের কাগজে বেরিয়েছে আমি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়েছি। এটা পুরোপুরি ঠিক নয়, আবার অনেকটা ঠিকও বটে। একটা কমিটি থেকে যখন পনের জনের মধ্যে বারো জনই ইস্তফা দেন তখন সেই কমিটির আর বিশেষ কিছু থাকে না। আমার সহকর্মীরা

এক কারণে ইস্তফা দিয়েছেন। আর আমি যা করেছি তার পিছনের কারণগুলি নানা দিক দিয়েই অন্য ধরনের। কিন্তু নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াও যে-কোন কমিটির বাইরে থেকে বিনা বাধায় নিজের ইচ্ছা মত কাজ করার একটা প্রবল ইচ্ছা আমায় পেয়ে বসেছে। যার দিন ফুরিয়ে এসেছে এমন একটি মুমূর্ষু কমিটি থেকে ইস্তফা দেওয়া খুবই সহজ। কিন্তু আমার কাছে সমস্যাটা ছিল আরও গভীর। আমি যা করতে যাচ্ছি তাতে আমার অন্য সংযোগগুলিও ছিন্ন হয়ে যাবে। লোকে ভাবছে আমি পদত্যাগী দ্বাদশের সঙ্গেই যোগ দিয়েছি। সত্যিই তাই দিয়েছি। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মানসিক দূরত্ব বেড়েই গেছে। গত তিন বছর ধরে ওয়ার্কিং কমিটি যে ভাবে গড়া হয়েছে তেমন কোন কমিটির সদস্য আমি আর কোন দিনই হব না।

অর্থাৎ জওহরের বিবৃতিতে রয়েছে শুধু হ্যামলেট-সুলভ দোলাচল-চিত্ততাই নয়, ডেনমার্কের রাজকুমারের মতো এক ধরনের বিষাদও—যে-বিষাদ তাঁকে পেয়ে বসেছে কমলার মৃত্যুর পর থেকে, গভীরতর হয়েছে যে বিষাদ লখনউ কংগ্রেসে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর।

*

ত্রিপুরী অধিবেশন সুতরাং শুরু হল এক বিচিত্র পরিবেশে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি সুভাষ অসুস্থ। গান্ধীজি আসেন নি। তিনি রাজকোটে স্থানীয় আন্দোলনে ব্যস্ত। ওয়ার্কিং কমিটির বিদায়ী সদস্যদের প্রায় সকলেই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে। আর দ্বিধায় দুলছেন জওহরলাল। এদিকে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক না-হওয়ায় অধিবেশনের কর্মসূচীও পাকা হয় নি।

জওহরের 'দা ইউনিটি অব ইণ্ডিয়া' রচনা সংকলনের পরিশিষ্টে একটি অধ্যায় আছে—ত্রিপুরী এবং তারপর। এই অধ্যায়টি সংকলনের সম্পাদক ভি কে কৃষ্ণ মেননের রচনা। যেমন দাবি করেছেন, ত্রিপুরী অধিবেশনের আগে যে বিতর্ক শুরু হয় তাতে যেসব নেতা বিশেষ জড়িত ছিলেন না জওহর তাঁদের অন্যতম। প্রধানত তাঁর চেষ্টাতেই ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের ঐক্য রক্ষা সম্ভবপর হয়েছিল। শরৎ বসুকে

জওহর যে চিঠি লেখেন (২৪ মার্চ ১৯৩৯) তাতে দেখি জওহরও দাবি করছেন তিনি ত্রিপুরীতে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। সুভাষ কিন্তু এই দাবি মানতে একেবারেই নারাজ। তিনি সরাসরি অভিযোগ করছেন জওহরের বিরুদ্ধে: তুমি দাবি করছ ত্রিপুরী অধিবেশনে এবং তার আগে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার জন্য তুমি চেষ্টা করেছিলে। এ বিষয়ে অন্যান্য লোকের মত যে আলাদা, এই অপ্রিয় সত্যটা কি আমি তোমাকে বলতে পারি? তাঁদের মতে, ত্রিপুরী কংগ্রেসে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে যে দুস্তর পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তার দায়িত্ব থেকে তুমি রেহাই পেতে পার না।

ত্রিপুরী অধিবেশনের বিশদ বিবরণ দেওয়ার স্থান এখানে নয়। মূলত বহু বিতর্কিত 'পন্থ প্রস্তাব' ও জওহরের ভূমিকা কী ছিল তাই দেখার চেষ্টা করব।

সতের

ত্রিপুরীতে এ আই সি সির বৈঠক বসল ৮ মার্চ। অসুস্থ সুভাষ বসে আছেন ইনভ্যালিড চেয়ারে। পাশে ডাক্তার। উত্তর প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ একটি প্রস্তাব তুললেন। তার মূল কথা: (এক) মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস এত দিন যে নীতি অনুসরণ করে এসেছে তার থেকে কোন বিচ্যুতি চলবে না; (দুই) বিগত বছরের ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি পূর্ণ আস্থা জানানো হচ্ছে এবং এই কমিটির কোন সদস্যের সম্পর্কে যদি কোন দোষারোপ করা হয়ে থাকে তবে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হচ্ছে; এবং (তিন) দেশে গুরুতর সংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা, এই সময় মহাত্মা গান্ধীই একমাত্র দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারেন, তাই রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করা হচ্ছে তিনি যেন গান্ধীজির ইচ্ছা অনুযায়ীই মনোনীত করেন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের।

স্পষ্টতই এটি একটি অগণতান্ত্রিক প্রস্তাব। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়নের অধিকার একমাত্র সভাপতির। ঠিকই, গত কয়েক বছর ধরে গান্ধীজির পরামর্শ অনুযায়ীই গঠিত হয়ে এসেছে এই কমিটি। কিন্তু সেই প্রথাকে লিখিতভাবে বিধিবদ্ধ রূপ দেওয়ার প্রয়াসের কোন নজির নেই। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রেও নেই এমন কোন নির্দেশ। তা ছাড়া, ঐ যে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের উপর দোষারোপের জন্য দুঃখ-প্রকাশ—এ তো সরাসরি সুভাষকেই আক্রমণ, কারণ ঐ দোষারোপের অভিযোগ তো তাঁর বিরুদ্ধেই উঠেছিল।

সভাপতি হিসেবে সুভাষ অনায়াসেই পারতেন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে। কিন্তু তিনি অন্যান্য সদস্যের মত জানতে চাইলেন। তারপর সুভাষ বললেন, এ আই সি সিতে নয়, বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে (সাবজেক্টস্ কমিটি) আলোচনা হতে পারে এই বিষয়ে। কিন্তু সুভাষের সমর্থকেরা তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলেন। বললেন, এটা সভাপতির বিরুদ্ধেই নিন্দা প্রস্তাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হয়ে গেল প্রস্তাবটি।

পরের দিন সুভাষের শরীর আরও খারাপ। আসতেই পারলেন না বৈঠকে। সভাপতির আসনে মৌলানা আজাদ। এ দিন এম এস আনে একটি প্রস্তাব আনলেন। তিনি বললেন, আগের দিন প্রস্তাবটি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে উত্থাপন করার আর দরকার নেই, বরং এ আই সি সির পরবর্তী অধিবেশনে এটি তোলা হবে। কারণ হিসেবে বলা হল, সুভাষের অসুস্থতার সময় এই প্রস্তাব নিয়ে আর আলোচনা না করাই ভালো। কিন্তু আসলে দক্ষিণপন্থী নেতৃগোষ্ঠী কিছুটা পিছিয়ে আসতে চাইছিলেন এই ভয়ে যে প্রকাশ্য অধিবেশনে সাধারণ প্রতিনিধিদের মধ্যে সুভাষের সমর্থক থাকবেন বিপুল সংখ্যায়, দেখা দেবে তীব্র বিরোধিতা।

বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে যখন আনের প্রস্তাবটি এল তখনই প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন সুভাষের সমর্থকেরা। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড গোলমাল। অবস্থা শান্ত করতে উঠলেন জওহরলাল। আর তা

করতে গিয়ে তাঁর যা অভিজ্ঞতা হল তা আর কখনও হয়নি। জওহর উঠে দাঁড়িয়েছেন কিছু বলবেন বলে। কিন্তু প্রবল বাধার মুখে একটি কথাও বলতে পারছেন না। আধ ঘণ্টা ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন জওহর, তারপর নিজস্ব ভঙ্গিতে শুরু করলেন : যথেষ্ট হয়েছে, এবার চুপ করুন। চোখের সামনে দেখছি বেদনাদায়ক দৃশ্য, দুঃখজনক দৃশ্য। এখন সময় এসেছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, শৃংখলাবদ্ধ হওয়ার। গত ছাব্বিশ বছর ধরে বছরের পর বছর আমি কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়েছি, অনেক বিচিত্র জিনিস আমি দেখেছি, কিন্তু এমন কাণ্ড কখনও দেখিনি।

শরৎচন্দ্র বসেছিলেন পাশে। তাঁর দিকে ফিরে জওহর বললেন, এ সব কী হচ্ছে শরৎবাবু, এ তো গুণ্ডামি, ফ্যাসিস্ট আচরণ। জওহর ভুলে গিয়েছিলেন তিনি শরতের উদ্দেশ্যে কথাগুলি বললেও সামনে ছিল মাইক। তার মন্তব্য লাউডস্পিকার মারফৎ ভেসে গেল সদস্যদের কাছে। শুরু হয়ে গেল আরও হৈ চৈ। (জওহরের এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সুভাষ পরে লিখেছেন : সভাপতি নির্বাচনের আগে ও পরে বিশেষত ত্রিপুরীতে জওহরের ভূমিকায় এমন কি তাঁর আগের অনুরাগীদের মধ্যেও তাঁর মর্যাদায় বেশ ঘা খেয়েছে। প্রতিনিধিরা ঘণ্টা দেড়েক ধরে তাঁর কথা শুনতে অস্বীকার করেন। মেজদাদা তাঁদের শান্ত হতে আবেদন জানানোর পর তবেই তাঁরা শান্ত হন। অশ্রুতপূর্ব ঘটনা!)

প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে আনে তাঁর প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিলেন। তৃতীয় দিনে প্রকাশ্য অধিবেশনে গোবিন্দবল্লভ তুললেন তাঁর মূল প্রস্তাবটি। তর্কবিতর্ক অনেক হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়ে গেল প্রস্তাবটি। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে যাঁদের সমর্থন পেয়েছিলেন সুভাষ তাঁরাও সকলে এখানে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন না। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল রইল নিরপেক্ষ। জওহরের জীবনীকার মাইকেল ব্রেশার লিখেছেন : জওহর কোন্ দিকে ভোট দেন তা জানা যায় না। কিন্তু সুভাষের জবানিতে

আমরা জানতে পারি জওহর কোন পক্ষেই ভোট দেননি।

অর্থাৎ সভাপতি নির্বাচনে জয়ী হলেও ত্রিপুরীতে পরাজিত হলেন সুভাষ। পন্থ-প্রস্তাবে বেঁধে দেওয়া হল তাঁর হাত। জাতীয় দাবি নিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল। সুভাষ চেয়েছিলেন এই প্রস্তাবে ইংরেজ সরকারকে দেওয়া হোক ভারত ছাড়ার চরমপত্র। সভাপতির ভাষণেই বলেছিলেন সে-কথা। কিন্তু তার কোন উল্লেখ প্রস্তাবে রইল না। শরৎ তাই সংশোধন প্রস্তাব এনে বলতে চেয়েছিলেন: এ প্রস্তাবের মূল্য কী, এ তো শুধু কথা, কথা, কথা, অর্থহীন, আন্তরিকতাহীন কথা, কোন কর্মসূচী নেই।

ত্রিপুরীর পর সুভাষ সরাসরি জানতে চেয়েছেন জওহরের কাছে— পন্থ-প্রস্তাব সম্পর্কে তোমার মত কী? উত্তরে জওহর জানিয়েছেন এই প্রস্তাবের পটভূমি।

ত্রিপুরীতে পৌঁছেই জওহর শুনলেন, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে সুভাষ যে কটাক্ষ করেছেন সেই বিষয়টার ফয়সালার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান বল্লভভাই, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ। জওহর চেয়েছিলেন এ আই সি সির বৈঠকে সুভাষ বা রাজেনবাবু কেউ এই বিষয়টির উল্লেখ করুন, তবে কোন প্রস্তাব আনার দরকার নেই। কিন্তু অন্যেরা এতে রাজি নন। কথা উঠল, এ আই সি সির বৈঠকে বিবেচনার জন্য একটি প্রস্তাব তৈরি করা হোক। এই প্রস্তাব রচনার ভার পড়ল জওহরেরই উপর। তিনি বললেন, প্রস্তাবটিতে তিনি বল্লভভাই প্রমুখের মতামত প্রকাশের চেষ্টা করবেন, যদিও তিনি সেই মতের সমর্থক নন। জওহরের রচিত প্রস্তাবটিতে বিদায়ী ওয়ার্কিং কমিটি আর গান্ধীজির নীতি ও নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করা হল, এ-কথাও বলা হল যে নীতিগত কোন পরিবর্তন চলবে না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে কটাক্ষ অথবা গান্ধীজির ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের কোন কথা সেখানে ছিল না।

কিন্তু এই প্রস্তাবের খসড়াটি পছন্দ হল না ওঁদের। পরে রাজেন্দ্র প্রসাদ তৈরি করলেন আরও দীর্ঘ একটি প্রস্তাব। গোবিন্দবল্লভ পন্থ

তখনও এসে পৌঁছননি। কিন্তু জওহর জানাচ্ছেন, এই প্রস্তাবের খসড়াটি তাঁর পছন্দ হয় না। ঐ কটাক্ষ বা দোষারোপের ব্যাপারটার উল্লেখ যে এমনিতে দোষের তা নয়, তবু জওহরের মনে হয়েছিল এটা অবাঞ্ছনীয়, এতে ক্ষোভ বাড়বে, বিশেষ করে সুভাষ যখন অসুস্থ। কিন্তু তখন ওঁরা জওহরকে বললেন, এটা তাঁদের সম্মানের ব্যাপার, তাঁদের সুনাম কলঙ্কিত হয়েছে, এই ব্যাপারটার ফয়সালা না হলে সুভাষের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা করা অসম্ভব। তা ছাড়া প্রস্তাবের মধ্যে ব্যাপারটা যতটা সম্ভব মোলায়েম করেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর কমে ওঁরা রাজি নন।

জওহর বলছেন: তারপর আমি আর কী বলতে পারি? আমি পরিষ্কার করেই জানিয়ে দিলাম, কোন্ কোন্ দিক দিয়ে প্রস্তাবটি পরিতাপজনক। তবে এটা যদি ওঁদের সম্মানের ব্যাপার হয় তবে আমার আর কিছু করার নেই। এই প্রস্তাবের আলোচনায় আমি যোগ দেব না। তারপর কী হল আমি জানি না। এ আই সি সির বৈঠকে দেখলাম গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রস্তাবটি তুলছেন।

পরে যখন বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে এল প্রস্তাবটি জওহর আবার কয়েকজন উদ্যোক্তার কাছে গেলেন, বললেন, কিছু রদবদল করা দরকার। মূল প্রস্তাবটি তৈরি করা হয়েছিল এ আই সি সির জন্য। এখন কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তোলা হচ্ছে এই প্রস্তাব, সুতরাং অন্যভাবে বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। কিন্তু তখনও আবার বলা হল, এটি ওঁদের সম্মানের প্রশ্ন। এই প্রস্তাব পাস না হলে তাঁদের পক্ষে সুভাষের সঙ্গে সহযোগিতা সম্ভব নয়।

জওহর সুভাষকে লিখছেন: প্রকাশ্য অধিবেশনের ঠিক আগে, তুমি তখন গুরুতর অসুস্থ, আমি আর একবার চেষ্টা করলাম প্রস্তাবটি রদবদল করার। কিন্তু পারলাম না। অবশ্য প্রস্তাবটি এ আই সি সিতে পাঠানোর জন্য শ্রী আনে যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সে-ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গেই মতৈক্য দেখা দিয়েছিল। আনের ধারণা হয়েছিল, আর তিনি আমাদের সেই কথাই বলেছিলেন, তাঁর উদ্যোগে বাংলার অনেক

বন্ধুর অনুমোদন আছে। আমাদেরও এই ধারণা হয়েছিল (হয়ত সেটা ভুল) যে তোমারও অনুমোদন আছে এই উদ্যোগে। পরে কী হল তা তো তুমি জানোই।

প্রকাশ্য অধিবেশনে গোবিন্দবল্লভ যখন মূল প্রস্তাবটি তুলছেন তখন বাংলার প্রতিনিধি সুরেশ মজুমদার জওহরের কাছে এলেন। শ্রীআনে যে প্রস্তাবটি এনেছিলেন তা ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সুরেশবাবু জওহরকে বললেন, শ্রীআনের প্রস্তাবমতো মূল প্রস্তাবটি এ আই সি সি-তেই পাঠানো হোক। আগের রাতে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। জওহর তখন বললেন, এখন তো গোবিন্দবল্লভ প্রস্তাবটি তোলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন, এই অবস্থায় তিনি আর কী করতে পারেন। তিনি তো আগে নানাভাবেই চেষ্টা করেছেন, সুরেশবাবু বরং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কাছে যান।

জওহরলাল দেখাতে চেয়েছেন তিনি পন্থ প্রস্তাব নিয়ে একটা বোঝাপড়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, যে আকারে প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত গৃহীত হল তা তাঁর পছন্দসই ছিল না। কিন্তু সুভাষ যখন তাঁকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছেন এই ব্যাপারে তখন জওহর স্বভাব অনুযায়ী স্পষ্ট উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন। সুভাষ জানতে চান: পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে তোমার মত কী? জওহর উত্তর দেন: এই প্রস্তাবটি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র বিরোধী বা অবৈধ তা তুমিই ঠিক করবে। এ বিষয় আমার মতামতের খুব একটা দাম নেই। আবার বলেন: আমি মনে করি না পন্থ-প্রস্তাব একটা অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব, তবে তোমার বিচক্ষণতা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থার অভাবের ইঙ্গিত তো এই প্রস্তাবে আছেই। নিশ্চিতভাবেই এই প্রস্তাব গান্ধীজির প্রতি আস্থাজ্ঞাপক ভোট।

পন্থ-প্রস্তাব জওহরলালের পুরোপুরি পছন্দ হয়ে না থাকলেও এই প্রস্তাবের পিছনে বিদায়ী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের যে তথাকথিত 'মানসম্মানের' প্রশ্ন জড়িত ছিল, সে বিষয়ে তাঁর কিছুটা সহানুভূতি

ছিলই। ফেডারেশনের প্রশ্নে এক শ্রেণীর কংগ্রেস নেতা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করছেন, এমন কি প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্ভাব্য মন্ত্রীদের নামও ঠিক হয়ে গেছে—এই ধরনের অভিযোগ তুলে সুভাষ যে মোটেই ভাল করেন নি, এ-কথা জওহর বারবার বলেছেন। সুভাষকে অনুরোধও করেছেন, গান্ধীজি এবং বল্লভভাই প্রমুখের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দুটি অংশ। একটিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা, আর একটিতে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য নিয়ে ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব। প্রথম অংশটি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মেনে নেয়, নির্বাচনে নামে এবং কয়েকটি প্রদেশে সরকারের যোগ দেয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্তরে যে ধরনের শাসন ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয় তার তীব্র বিরোধিতা করে কংগ্রেস। ত্রিপুরী কংগ্রেসের আগে সুভাষ যখন এই প্রশ্নে আপস করার চেষ্টার অভিযোগ আনলেন তখন শুরু হয়ে গেল তুমুল সোরগোল।

সুভাষ এই অভিযোগের কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ দেন নি। কিন্তু বারবার একই অভিযোগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে জওহরের কাছে লিখেছেন: আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করব। তুমি কি ভুলে গেছ, লর্ড লোথিয়ান যখন ভারত সফর করছিলেন তখন প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে ফেডারেল ব্যবস্থা সম্পর্কে জওহরলাল নেহরুর দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে কংগ্রেস নেতা একমত নন? এই মন্তব্যের অর্থ ও তাৎপর্য কী?

এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডঃ তারাচাঁদের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গের ইতি টানা যায়। 'স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে তিনি লিখছেন: এ-কথা সত্যি যে এই সময়ে অল্প দিনের মধ্যে ফেডারেল ইউনিয়ন স্থাপনের ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা চলছিল। ১৮৩৮ সালের ১৬ এপ্রিল গান্ধীজি দেখা করেন বড়লাট লিনলিথগোর সঙ্গে। বড়লাটকে তিনি বলেন, লর্ড লোথিয়ানের কাছে তিনি যে ফর্মুলার আভাস দিয়েছেন

তার প্রতি তিনি খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। ভারতকে ব্রিটেন পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দিতে চায় কিনা তার প্রকৃত পরীক্ষা হবে এই ফর্মুলা গ্রহণের দ্বারা। লিনলিথগোর এই ধারণা হয় যে, যদি কয়েকটি বড় দেশীয় রাজ্যে নির্বাচনের রীতি প্রবর্তিত হয় তবে গান্ধীজি ফেডারেশন মেনে নেবেন। লিনলিথগো লণ্ডনে ভারত সচিবের কাছে ঐ তারিখেই যে রিপোর্ট পাঠান তাতেই এ-কথা লেখেন তিনি। ইংরেজ সরকারের নথিপত্র থেকে এই বিবরণ উদ্ধার করেছেন ডঃ তারাচাঁদ।

জওহর বারবারই বলতে চেয়েছেন, ফেডারেশনের প্রশ্ন নিয়ে মিছেই চিন্তিত হচ্ছেন সুভাষ, ফেডারেশন আর কোন ইস্যুই নয়, কংগ্রেস তো ফেডারেশনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত মত প্রকাশ করেছে আগেই। জওহরের এই কথার মধ্যে নিশ্চয়ই যুক্তি আছে। কিন্তু এই বিরোধিতা সত্যিই কতটা 'চূড়ান্ত' সে-বিষয়ে সন্দেহ দেখাও কি অস্বাভাবিক?

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে দেশের উপর যে সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল কংগ্রেস এই আইন অনুসারেই প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে যোগ দিল এবং সাফল্যও পেল বড় রকম। অবশ্যই বোম্বাইয়ে এ আই সি সি-র বৈঠকে (২২ আগস্ট ১৯৩৬) অনুমোদিত নির্বাচনী ইশ্‌তাহারে বলা হয়েছিল, নির্বাচনে এই যোগদান শুধু সংবিধানটিকে আইন সভার ভিতরে থেকেই বিনাশ করা। নির্বাচনের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্নটি তখন রাখা হয়েছিল মুলতুবি। কিন্তু নির্বাচনের (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭) পরই এই প্রশ্ন আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ নিয়ে কংগ্রেসে বিতর্ক চলেছে তীব্র। জওহর, সুভাষ ও বামপন্থী গোষ্ঠী এই প্রচেষ্টার বিরোধিতায় ছিলেন সরব (অস্ট্রিয়া থেকে জওহরের কাছে লেখা সুভাষের চিঠি স্মরণীয়)। কিন্তু বল্লভভাই, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজাগোপালাচারি প্রমুখের অনীহা ছিল না এই প্রস্তাবে। নির্বাচনে লড়াইয়ের জন্য যে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, সেই

যুক্তিই দেওয়া শুরু হল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে—অর্থাৎ মন্ত্রিত্ব নিয়ে সংবিধানটিকেই বানচাল করে দেবে কংগ্রেস। দিল্লিতে এ আই সি সি-র বৈঠকে (মার্চ ১৯৩৭) দেখা গেল মন্ত্রিত্ব গ্রহণসম্পর্কে প্রস্তাব উঠল, সেই প্রস্তাবের অন্যতম রচয়িতা মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। অবশ্যই এই প্রস্তাবেও বলা হল, সংবিধানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে কংগ্রেস। কিন্তু সেই সঙ্গে মন্ত্রিত্ব গ্রহণেও অনুমতি দেওয়া হল, যদিও এক-আধটি শর্ত জুড়ে।

এই প্রস্তাব গ্রহণের পরেই জনমনে দেখা দেয় গভীর সংশয়। কংগ্রেস কি তবে সংগ্রামের পথ ছেড়ে এবার আইন সভার নিরাপদ আশ্রয়ে প্রবেশের পথ ধরল? স্বয়ং জওহরের নানা রচনাতেও দেখতে পাই জনমনের এই সংশয়ের কথা তিনি উল্লেখ করছেন বারবার। আশ্বস্ত করছেন, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ মানেই "ক্রীতদাসের সংবিধান" মেনে নেওয়া নয়। ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যখন প্রস্তাবটি প্রথম অনুমোদিত হয় তারপরই সাংবাদিকেরা জওহরকে (তিনিই তখন কংগ্রেস সভাপতি) ছেঁকে ধরেন: এই প্রস্তাব সম্পর্কে আপনার মত কী? জওহর প্রথমে উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। হেসে বলেন, ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্যের কাছে ওয়ার্কিং কমিটির যে কোন সিদ্ধান্তই নির্ভুল! কিন্তু পরে বুঝতে পারেন, ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। তাই সকলকে আশ্বস্ত করার জন্য কলম ধরতে হয় তাঁকে।

সুভাষও স্বীকার করেছেন, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ আর ফেডারেশনের প্রস্তাব মেনে নেওয়া এক কথা নয়। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রীরা যখন প্রদেশে-প্রদেশে ক্ষমতায় আসীন তখনও তিনি মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে (আগস্ট ১৯৩৮) সতর্ক করছেন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার বিপদ সম্পর্কে। প্রশ্ন তুলছেন এই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের দ্বারা কংগ্রেসের যে "বিদ্রোহী মনোভাব" তা কি নষ্ট হবে না?

নতুন সংবিধান যেদিন চালু হল (১ এপ্রিল '১৯৩৭) সেদিন হরতাল হল দেশজুড়ে, কংগ্রেস নতুন করে ধিক্কার জানাল 'দাসত্বের এই

শৃংখলকে'। গান্ধীজির এই সময়ের একটি বিবৃতিতে শোনা গেল কয়েকটি নতুন শব্দ—বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের হাতে সুশৃংখলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর।

সংগ্রাম নয়, ক্ষমতা হস্তান্তর। এই চিন্তাই তখন শুরু হয়ে গেছে। ত্রিপুরীতে সুভাষ বৃটেনকে চরমপত্র দেওয়ার যে-ডাক দিয়েছিলেন তা যে অগ্রাহ্য হবে তাতে আর সন্দেহ কি!

আঠারো

ত্রিপুরীকে কেন্দ্র করেই আমরা জওহর-সুভাষ কাহিনীর সব চেয়ে বিচিত্র অধ্যায়ে প্রবেশ করি। আর মার্কিন ঐতিহাসিক লিনার্ড গর্ডন যে বলেছেন এই দুই নায়কের সম্পর্ক ঠিকমতো বোঝার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ইতিহাসকারের নয়, একজন মনোবিজ্ঞানীর সেই কথাটা সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য এই অধ্যায় সম্পর্কেই।

আমরা সুভাষকে দেখছি দীর্ঘতম চিঠি লিখতে (২৮ মার্চ ১৯৩৯), জওহরকে দেখছি তার প্রায় সমান দীর্ঘ জবাব দিতে (৩ এপ্রিল)। চিঠিতে রাজনৈতিক প্রশ্ন, নীতি আদর্শের প্রশ্ন যথেষ্টই উঠছে, এর আগেই আমরা তার কিছু উদ্ধৃতি ও উদাহরণ দিয়েছি। কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রতি আক্রমণও কিছু কম নেই।

সুভাষ সরাসরি বলছেন: গত কিছু দিন ধরেই দেখছি আমার সম্পর্কে তোমার ঘোর বিরাগ জন্মেছে। আমি এ-কথা বলছি কারণ দেখছি আমার বিরুদ্ধে কোন বিষয় থাকলেই তুমি সানন্দে সেটা মেনে নাও, আমার সম্পর্কে যদি কিছু বলার থাকে তাতে তুমি কান দাও না। আমার রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষ আমার বিরুদ্ধে যা বলে তুমি তা মেনে নাও। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যদি কিছু বলার থাকে সে ব্যাপারে তুমি চোখ বুজে থাকো।

সুভাষ অবশ্য চিঠির শেষে নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি খোলা-

খুলি সব বলতে চেয়েছেন। সেই 'খোলাখুলি বলার' আরও কিছু উদাহরণ :

সভাপতি নির্বাচনের পর থেকে আমাকে জনসমক্ষে হেয় করার ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্য সকলে মিলে যতটা না করেছেন তুমি তার চেয়ে বেশি করেছ।

বোম্বাই ট্রেডস্ ডিসপিউট বিল প্রসঙ্গে সুভাষ লিখছেন : ইদানীং তুমি আমার ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা না-জেনেই অভিযোগ আনার—অনেক সময় প্রকাশ্যেই—কায়দা রপ্ত করেছ।

ত্রিপুরী অধিবেশনের কিছু দিন পরেই জওহর এক তারবার্তা পাঠান সুভাষকে। তাড়াতাড়ি ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে তাগাদা দেন। সেই প্রসঙ্গে সুভাষ লেখেন : তুমি টেলিগ্রামে লিখেছ কংগ্রেসে অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য আমি দায়ী। তুমি এত নিরপেক্ষ কিন্তু তোমার একবারও মনে হল না যে ত্রিপুরী কংগ্রেসে যখন পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হল তখন ভালোভাবেই জানা ছিল যে আমি গুরুতর অসুস্থ, গান্ধীজি ত্রিপুরীতে আসেন নি এবং নিকট ভবিষ্যতে আমাদের দেখা হওয়া কঠিন।···ত্রিপুরী কংগ্রেস শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন শুরু করে দিলে, যদিও তুমি জানতে আমার শরীরের কী অবস্থা, আর আমার হাতে পৌঁছাবার আগেই তোমার টেলিগ্রামের কথা খবরের কাগজে বেরিয়ে গেল। ত্রিপুরীর আগে ওয়ার্কিং কমিটির দ্বাদশ সদস্যের ইস্তফার ফলে কংগ্রেসে যখন অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল তখন তুমি প্রতিবাদে একটা কথাও বলেছিলে? আমার প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছিলে একটি কথা বলে?

উদাহরণ এমন আরও দেওয়া যায়। রাজনৈতিক প্রশ্নের ক্ষেত্রেও সুভাষ সরাসরি আক্রমণ করছেন জওহরকে। কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন জওহর। সুভাষ সেই সম্পর্কে লিখছেন : তোমার এলাহাবাদে বসে বসে এমন জ্ঞানের কথা বলে লাভ কি যার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই?···বাংলা সম্পর্কে বলতে গেলে

তুমি কিছুই জানো না। তুমি যে দুই বছর কংগ্রেস সভাপতি ছিলে তুমি এই প্রদেশে সফর করা দরকারই মনে করো নি, যদিও এই প্রদেশে তোমার অনেক বেশি নজর দেওয়া উচিত ছিল, কারণ এখানে চলেছে নির্মম নির্যাতন।

সুভাষের চিঠি পেয়েই উত্তর লিখতে বসেন জওহর। সুভাষ যে খোলাখুলি সব কথা লিখেছেন তাতে খুশিই হয়েছেন তিনি। সুভাষের চিঠিকে তিনি আখ্যা দেন তাঁর বিরুদ্ধে "এক অভিযোগ পত্র এবং তাঁর ক্রটিবিচ্যুতির অনুসন্ধান"। এই ধরনের অভিযোগের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন ও অস্বস্তিকর। ক্রটিবিচ্যুতি সম্পর্কেও তিনি বিশেষ কিছু বলতে চান না। বরং দোষ স্বীকার করে নেন নিজের।

তারপর লেখেন: তুমি লিখেছ ১৯৩৭ সালে অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার পর তুমি সাধারণ্যে ও ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি অত্যন্ত সুবিবেচনা ও প্রীতিপূর্ণ আচরণ করেছ। আমি এই কথার সত্যতা পুরোপুরিই মানি। এ জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। অনেক সময় তুমি যা করেছ অথবা যেমনভাবে তা করেছ তা আমার পছন্দ হয়নি মোটেই, তবু ব্যক্তিগতভাবে তোমার প্রতি সর্বদাই আমার প্রীতি ও ভালোবাসা বজায় থেকেছে এবং এখনও আছে। আমার মনে হয় কিছুটা পরিমাণে আমাদের মেজাজের তফাৎ আছে, জীবন ও তার নানা সমস্যা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও এক নয়।

এরপর জওহর একে একে সুভাষের অনেক অভিযোগেরই উত্তর দেন। তাঁর ভাষা কখনোই সুভাষের মতো তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু ৪ ফেব্রুয়ারির চিঠির মতো এখানেও তিনি সুভাষের নানা ক্রটিবিচ্যুতির কথা তুলে ধরতে কুণ্ঠিত হন নি।

আবার উঠেছে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে সুভাষের কটাক্ষের প্রসঙ্গ। জওহর লিখছেন: তিনি সুভাষকে বলেছিলেন গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে, কারণ এক হিসেবে ঐ সদস্যরা গান্ধীজিরই প্রতিভূ। কিন্তু পরে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও

গান্ধীজির কাছে তিনি যখন জানলেন যে সুভাষ প্রসঙ্গটি উত্থাপনই করেন নি তখন অবাক হয়ে গেলেন জওহর। "তখনই বুঝতে পারলাম তোমার সঙ্গে কাজ করা কত কঠিন।"

সভাপতি নির্বাচনে সুভাষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নও আবার উঠল। জওহর বলছেন: একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তিনি খোলাখুলিই বলতে চান। তাঁর সর্বদাই মনে হয়েছে পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে সুভাষ বড় বেশি আগ্রহী ছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে এতে অবশ্য কোন অন্যায় নেই, অবশ্যই সুভাষ পুনর্নির্বাচিত হতে চাইতে পারেন, তার জন্য চেষ্টাও করতে পারেন। কিন্তু জওহর এতে ব্যথিতই হয়েছিলেন কারণ তাঁর মনে হয়েছিল সুভাষের মর্যাদা অনেক বেশি, সুভাষ এ সবের উর্ধ্বে থাকবেন।

কেন জওহর সুভাষের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে ছিলেন তাও ব্যাখ্যা করলেন: বর্তমান অবস্থায় এর অর্থ হবে গান্ধীজির সঙ্গে সম্পর্কছেদ এবং তিনি তা চান না। কেন যে এই সম্পর্কছেদ ঘটবে তা অবশ্য তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। শুধু বলেছেন, তাঁর মনে হয়েছে এই রকমই ঘটবে। দ্বিতীয় কারণ: এর ফলে প্রকৃত বামপন্থীর ক্ষতিই হবে। সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার মতো শক্তি বামপন্থী গোষ্ঠীর নেই। কংগ্রেসের মধ্যে সত্যিই যখন লড়াই লাগবে তখন বামপন্থীরা হেরে যাবে, তখন দেখা দেবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। পট্টভির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুভাষ জিততে পারেন, এমন ধারণা তাঁর হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীবাদের সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে কংগ্রেসকে সুভাষ নিজের দিকে রাখতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে জওহরের ঘোরতর সন্দেহ ছিল।

জওহর আরও লিখলেন: ইদানিং সুভাষ যাঁদের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিচ্ছেন তাঁদেরও তেমন পছন্দ নয় তাঁর। ভাসা-ভাসা বামপন্থী শ্লোগান ইদানীং ইউরোপে যথেষ্ট শোনা গেছে। এ থেকেই জন্ম হয়েছে ফ্যাসিবাদের। "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তোমার আর আমার মতের ফারাক আছে। নাৎসি জার্মানি বা ফ্যাসিস্ত ইতালির আমরা

যে নিন্দা করেছি তা তুমি পুরোপুরি অনুমোদন করো নি। সামগ্রিক-ভাবে ছবিটার দিকে তাকালে, তুমি আমাদের যে দিকে নিয়ে যেতে চাও তা আমার মোটেই ভালো লাগে নি।"

চিঠিপত্রে এই ধরনের আদান প্রদানের পর সাধারণত আশা করা হয় দুই নায়কের মুখ দেখাদেখিই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতই কি হতে দেখি আমরা?

ত্রিপুরী অধিবেশনের কিছু দিন পর থেকেই শুরু হল গান্ধীজির সঙ্গে সুভাষের চিঠিপত্র ও তারবার্তার আদান-প্রদান। না করে উপায়ও ছিল না, কারণ কংগ্রেস সভাপতির পরবর্তী কর্তব্য ওয়ার্কিং কমিটি গঠন। পন্থ-প্রস্তাব অনুযায়ী এই ব্যাপারে তিনি গান্ধীজির পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য। সুভাষ তাই-ই চাইলেন। জানতে চাইলেন, পন্থ-প্রস্তাবের পর প্রথম অবস্থাটা কী দাঁড়াল? তাঁর কি আর কোন ভূমিকা রইল? এখন নানা বাধাবিপত্তির মুখে সুভাষ কীভাবে কাজ করবেন তা গান্ধীজি বলে দিন।

সুভাষ জানালেন, শুধু সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের প্রস্তাবের তিনি বরাবরই বিরোধিতা করে এসেছেন। কিন্তু গান্ধীজি কি এখনও ঐ মতেই অটল আছেন? তা যদি হয় তবে তো সুভাষ আর সর্দার প্যাটেলের মতো লোক এক কমিটিতে থাকতে পারেন না। আর যদি বরাবরের মতো বিভিন্ন গোষ্ঠীর অর্থাৎ বিভিন্ন মতাবলম্বীদের নিয়েই কমিটি গঠন করতে হয় তবে সুভাষ সাত জনের নাম প্রস্তাব করতে পারেন, বাকি সাত জনের নাম প্রস্তাব করুন বল্লভভাই।

আবার লিখলেন সুভাষ: যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন মূল সমস্যা হল দু'পক্ষ অতীতের কথা ভুলে গিয়ে একত্রে কাজ শুরু করতে পারে কিনা। আর তা নির্ভর করছে একান্তভাবেই গান্ধীজির উপর। তিনি যদি প্রকৃত নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে দু' পক্ষের আস্থা অর্জনে এগিয়ে আসেন তবে তিনিই বাঁচাতে পারেন কংগ্রেসকে। সুভাষ লিখলেন: "মেজাজের দিক দিয়ে আমি প্রতিশোধপরায়ণ নই এবং

মনে ক্ষোভও পুষে রাখি না। একদিক থেকে আমার মনোভাব অনেকটা মুষ্টিযোদ্ধার মতো—অর্থাৎ লড়াই শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি হাসিমুখে করমর্দন করি এবং ফলাফল মেনে নিই খেলোয়াড়োচিত মনোভাব নিয়ে।”

সুভাষ গান্ধীজিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি দু'জনের আলোচনার কথা। সেই সময় আলোচনা হয়েছিল ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে। সুভাষ প্রস্তাব করেছিলেন, ইংরেজ সরকারকে চরমপত্র দেওয়া হোক, কারণ এখনই তার প্রকৃষ্ট সময়। দেখা যাচ্ছে, এই চরমপত্র দিতে গান্ধীজি ও জওহরলালের অনীহা। সুভাষ প্রশ্ন তুললেন: কিন্তু কেন? গান্ধীজি নিজেই কি বারবার চরমপত্র দেন নি? সুভাষ এখনও তাঁর ধারণায় অটল। তাঁর ধারণা, সাহস করে যদি এগিয়ে যাওয়া যায় তবে দেড় বছরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে। এই বিশ্বাস তাঁর এতই দৃঢ় যে তিনি এর জন্য যে কোন ধরনের আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত।

আমরা দেখছি সুভাষ গান্ধীজিকে প্রস্তাব দিচ্ছেন, যদি গান্ধীজি মনে করেন অন্য কেউ সভাপতি হলে সংগ্রাম জোরদার হবে তবে সুভাষ সানন্দে সরে দাঁড়াবেন। যদি গান্ধীজি মনে করেন তাঁর মনোনীত ওয়ার্কিং কমিটি দিয়ে সংগ্রাম আরও ভালোভাবে চালানো যাবে তা হলে সুভাষ সানন্দে মেনে নেবেন তাঁর ইচ্ছা। সুভাষ শুধু চান এই সঙ্কটের মুহূর্তে গান্ধীজির নেতৃত্বে আবার শুরু হোক স্বরাজ অর্জনের সংগ্রাম। যদি সুভাষ নিজেকে সরিয়ে নিলেই সংগ্রামের কাজে সহায়তা হয় তবে সুভাষ তাই-ই করবেন।

কিন্তু দেখা গেল সুভাষের সব আর্জি, সব প্রস্তাব, সব উদ্যোগ মহাত্মার অনড়-অচল মতামতের প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। গান্ধীজি বলছেন, সমস্যার সুরাহার উদ্যোগ নেওয়ার দায় তাঁর নয়, সুভাষের। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মনোনীত করুন সুভাষ, গান্ধীজি তাতে হাত দিতে চান না। তিনি চাপিয়ে দিতে চান না কোন কমিটি। মূলনীতি নিয়েই যখন বিরোধ রয়েছে তখন বিভিন্ন

মতাবলম্বীদের কমিটি গড়া উচিত নয়। তাতে ক্ষতিই হবে।

তা ছাড়া সুভাষের চিঠি থেকে গান্ধীজি বুঝতে পারছেন যে তাঁর ও অন্যান্যদের মত এবং সুভাষের মত একেবারে বিপরীত। সেখান কোন সেতুবন্ধনের অবকাশ নেই। এই মতবিরোধ অবশ্য তেমন কিছু অন্যায় ব্যাপার নয়, আসলে পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসটাই চলে গেছে।

স্বরাজের জন্য সংগ্রাম আবার শুরু করতে বলেছেন সুভাষ। কিন্তু গান্ধীজি জানালেন, এখন তার সময় নয়। এখন চতুর্দিকে তিনি পাচ্ছেন হিংসার গন্ধ। কংগ্রেসে দেখা দিয়েছে দুর্নীতি। তা ছাড়া তিনি এখন বুড়ো হয়েছেন, হয়ত ভয় পান, বেশি মাত্রায় সতর্ক হয়ে পড়েছেন। সুভাষই হয়ত ঠিক বলছেন, তিনিই ভ্রান্ত।

গান্ধীজির এই মনোভাবের সামনে পড়ে সুভাষ এখন কী করবেন? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুরোধও টলাতে পারছে না মাহাত্মাকে এই অবস্থায় সুভাষ কার সঙ্গে পরামর্শ করবেন? মেজদা শরৎচন্দ্র অবশ্যই আছেন। কিন্তু আর কে? আমরা কিছুটা বিস্মিত হয়েই দেখি সুভাষ পরামর্শ চাইছেন জওহরলালেরই কাছে। জিয়ালগোড়া (মানভূম) থেকে সুভাষ চিঠি লিখছেন জওহরকে (১৫ এপ্রিল)। জানাচ্ছেন গান্ধীজির সঙ্গে তার পত্রালাপের সারমর্ম। তারপর বলছেন, অতঃপর আমি কী করব তুমি জানাও।

তারপর চিঠির শেষে লিখছেন: তুমি কি কয়েক ঘণ্টার জন্য এখানে আসতে পারবে? তা হলে আমরা কথা বলতে পারি, এরপরে কী করব সে বিষয়ে তোমার পরামর্শ পেতে পারি। যদি সময় করতে পারো তবে তুফান এক্সপ্রেসে (৮ ডাউন) এলে সময় বাঁচবে! ট্রেনটা ধানবাদে পৌঁছয় বিকেল সাড়ে চারটেয়। বোম্বে মেইলে তুমি ফিরে যেতে পারো। ঐ ট্রেন ধানবাদে আসে মাঝরাতে। ধানবাদ থেকে জামাডোবা ন' মাইল। স্টেশনে গাড়ি থাকবে।

সুভাষের এই অনুরোধ কিন্তু তিক্ত মতবিরোধ সত্ত্বেও ঠেলতে পারলেন না জওহর। গান্ধীজিকে লেখা চিঠিতে (১৭ এপ্রিল)

তাঁকে বলতে দেখি: এই মাত্র সুভাষের চিঠি পেলাম। ও লিখেছে কয়েক ঘণ্টার জন্য ওর কাছে গিয়ে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে। আমার আশঙ্কা এই কথাবার্তায় নির্দিষ্ট কিছু ফললাভ হবে না, কারণ আমি তো ফয়সালা করতে পারব না। তবু ওকে তো আমি না বলতে পারি না। দু' এক দিনের মধ্যেই আমি ওখানে যাব।

জওহর জামাডোবায় গেলেন ১৯ তারিখেই। গান্ধীজির কাছে সুভাষের চিঠি ও তারবার্তা (২০ এপ্রিল) থেকে আমরা জানতে পারি, কথাবার্তা একেবারেই নিস্ফলা হয় নি। সুভাষ জানাচ্ছেন, সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে দু' জনে একমতই হয়েছিলেন। এও ঠিক হয়েছিল কলকাতার কাছে কোন এক জায়গায় গান্ধীজি যদি আসেন তবে জওহর ও সুভাষ দু'জনে তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন।

এই মতৈক্যের কিছুটা আভাস গান্ধীজির কাছে জওহরের লেখা ঐ ১৭ তারিখের চিঠিতেই আমরা পাই। চিঠিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এখানে জওহর স্পষ্টভাষায় লিখছেন: "আমি এখন মনে করি, এবং দিল্লিতেও তাই বলেছিলাম, সুভাষকে আপনার সভাপতি হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত। ওকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আমার মতে অত্যন্ত গর্হিত কাজ।" জওহর অনুরোধ করছেন গান্ধীজিকে আপনি যদি দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে না-নেন তবে মীমাংসার কোন পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না। আপনাকেই অগ্রণী হতে হবে, শুধু ঘটনা ঘটার আশায় বসে থাকলে আপনার চলবে না। সুভাষের অনেক ত্রুটি আছে, কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এগোলে সে সাড়া দেয়। আপনি যদি মনস্থ করেন তবে নিশ্চয়ই সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে পারবেন। জওহর গান্ধীজির কাছে সমাধানের পথের কয়েকটি ইঙ্গিতও দিলেন। তিনি সুভাষকে বলবেন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারটা পুরোপুরি গান্ধীজির হাতে ছেড়ে দিতে। সুভাষ কয়েকটা নাম দিতে পারে, কিন্তু তা মানা বা না-মানা নির্ভর করবে গান্ধীজির উপর। শুধু সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের

নিয়েই কমিটি গঠিত হবে এ কথায় জওহরের সায় নেই। কিছু পরিমাণে মতের সমতা থাকতেই হবে। তা না হলে তো কাজই করা যাবে না। কিন্তু তাকে সংকীর্ণ অর্থে দেখলে চলবে না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকার ব্যাপারে জওহরের নিজের অনীহা বেশ কিছু দিনের। কিন্তু সঙ্কট মীমাংসায় যদি সাহায্য হয় তবে তিনি কমিটিতে থাকতে রাজি।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে জওহরের প্রস্তাব: ত্রিপুরী অধিবেশনে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে এই কর্মসূচী। তাতে তো স্পষ্টই বলা হয়েছে, অতীতের কর্মপন্থা থেকে বিচ্যুত হবে না কংগ্রেস।

সুভাষ নিশ্চয়ই জানতেন না, জওহর ১৭ এপ্রিল গান্ধীজিকে এই মর্মে চিঠি লিখেছেন। কারণ আমরা দেখি ঠিক ঐ দিনই তিনি অমিয়নাথকে লিখছেন, জওহরলাল ব্যক্তিগতভাবে তাঁর যত ক্ষতি করেছেন তেমন আর কেউ করেন নি।

এ থেকে এই কথাই মনে হয় যে, এই সময়ে দুই নায়কের মধ্যে ঘটেছিল যাকে বলা যায় 'কম্যুনিকেশন গ্যাপ'।

উনিশ

কলকাতায় বসবে এ আই সি সি-র অধিবেশন এপ্রিলের শেষে। তার আগে গান্ধীজি এলেন। কিন্তু তিনি এ আই সি সি-র বৈঠকে যোগ দেবেন না। থাকবেন সোদপুরে। নিজের অসুস্থতার জন্য সুভাষ এতদিন গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করে মুখোমুখি কথা বলতে পারেন নি। সেই সুযোগ এতদিনে এল। গান্ধীজি এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষ ছুটলেন তাঁর কাছে। দিলেন মীমাংসার জন্য প্রস্তাব।

কিন্তু গান্ধীজি তাঁর নিজের মতে অটল। তিনি ওয়ার্কিং কমিটির

সদস্যদের মনোনীত করবেন না। সুভাষ যদি চান বিদায়ী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে আপস মীমাংসার চেষ্টা করতে পারেন। গান্ধীজি জানেন, পন্থ-প্রস্তাবের দড়ি দিয়ে সুভাষের হাত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজির পরামর্শ নিয়েই কমিটি গড়তে হবে। কিন্তু তিনি কোন মতামত দেবেন না। তা হলে সুভাষ কী করবেন? গান্ধীজিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে তিনি জওহরলালকেও সঙ্গী করে নিলেন।

কলকাতায় জওহর যথারীতি উঠেছেন বসু বাড়িতেই। শিশিরকুমার বসু জানিয়েছেন: সুভাষ প্রায়ই খুব সকালে উডবার্ণ পার্কের বাড়িতে (শরৎ বসুর বাড়ি) আসতেন। পণ্ডিতজিকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে সোদপুরে যেতেন। গান্ধীজির সঙ্গে অনেক আলোচনা করেও মীমাংসার কোন সূত্র পাওয়া গেল না। একদিন দেখি রাঙাকাকাবাবু ও জওহরলাল একটু বেলায় উডবার্ণ পার্কের বাড়িতে ফিরে সামনের বারান্দায় গম্ভীর মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। যেন গুরুতর কিছু ঘটে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর রাঙাকাকাবাবুই স্তব্ধতা ভাঙলেন। বললেন: যাও, খাওয়াদাওয়া কর। আফটার অল ম্যান মাস্ট লিভ। জওহরলাল উত্তরে শুধু বললেন, ইয়েস ম্যান মাস্ট লিভ। তারপর দু'জনে দুদিকে চলে গেলেন।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। এ আই সি সির বৈঠকে সুভাষ জানালেন, ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর যে সংকট দেখা দিয়েছে তার নিরসন হয় নি। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারেন নি তিনি। গান্ধীজিকে তিনি এই প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে, গান্ধীজি যে কমিটি গঠন করবেন তাই তিনি মেনে নেবেন। কিন্তু তাতেও রাজি হন নি মহাত্মা। তাই অনেক ভাবনাচিন্তার পর সুভাষ স্থির করেছেন তিনি ইস্তফাই দেবেন। কংগ্রেসের সামনে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার নিরসনের জন্যই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। এ আই সি সি হয়ত নতুন কোন সভাপতি নিয়োগ করতে পারে, তাতে সংকট নিরসন

সহজ হবে। তা ছাড়া এখন এ আই সি সি এমন একটি কমিটি গড়তে পারে যেখানে সুভাষকে ঠিক মানাবে না। (ইস্তফা সম্পর্কে বিবৃতি)।

এই সময় জওহরলালকে দেখি একটা নতুন প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসতে। তিনি বললেন, সুভাষ পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নিন এবং ১৯৩৮ সালে যাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন তাঁদেরই আবার মনোনীত করুন। দু'জন সদস্য কিছু দিনের মধ্যেই ইস্তফা দেবেন। তখন সুভাষ সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন দু'জন সদস্য মনোনীত করতে পারবেন।

জওহরের এই প্রস্তাব কিন্তু সুভাষের মনোমত হয় নি। তাঁর সমর্থকেরা বরং বিপরীত ব্যাখ্যা করলেন জওহরের প্রস্তাবের। তাঁরা বললেন, এটা সুভাষের উপর আবার সেই পুরানো ওয়ার্কিং কমিটিই চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। সুভাষের সমর্থনে তাঁরা বিক্ষোভও দেখালেন রীতিমতো এবং সেই বিক্ষোভ খুব শান্তও ছিল না। সুভাষকেই উদ্যোগী হয়ে প্রশমিত করতে হল সেই বিক্ষোভ।

পর দিনের বৈঠকে জওহর আবার জানতে চাইলেন তাঁর প্রস্তাবে সুভাষের সায় আছে কিনা। সুভাষ জবাব দিলেন: জওহরলালের মতো একজন নেতা যে তাঁকে পদত্যাগ প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করেছেন তার জন্য তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। কিন্তু তিনি তো তা ভেবেচিন্তে হঠাৎ ইস্তফা দিয়ে বসেন নি। পদত্যাগের আগে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন সবদিক।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন সম্পর্কে বললেন: গত বছর হরিপুরায় তিনি কমিটিতে নতুন সদস্য নিয়েছিলেন তিন জন। প্রতি বছরই কিছু নতুন সদস্য নেওয়া উচিত। নীতির পরম্পরা বজায় রাখার জন্য পুরানো কমিটির অধিকাংশ সদস্য থাকতে পারেন। কিন্তু ভারতের মতো বিশাল দেশে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মসমিতি বিশেষ কিছু লোকের একচেটিয়া অধিকারে থাকা উচিত নয়। যদি

আমরা চাই একটি গতিশীল, শক্তিশালী কমিটি তবে কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতিনিধি গ্রহণ করা উচিত। যদি নতুন সদস্য গ্রহণ করা না হয় তবে কমিটির শক্তি সামর্থ্য কমে যাবে। ১৯২১ সালের পর থেকে কংগ্রেসে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। ওয়ার্কিং কমিটিতেও তার ছাপ পড়া উচিত। গত সভাপতি নির্বাচনের তাৎপর্য ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না।

সুভাষ জানালেন, পদত্যাগ প্রত্যাহারের কথা তিনি বিবেচনা করতে পারেন যদি তাঁর এই মত এ আই সি সির সমর্থন পায়। তা না হলে তিনি সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চান। "আমি যদি সভাপতির গদিতে না থাকি তাতে কী আসে যায়? আমি চিরদিনই কংগ্রেসের সেবা করে যাব।"

সরোজিনী নাইডু সেদিন সভাপতির আসনে। তিনি আবার সুভাষকে অনুরোধ করলেন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার। কিন্তু সুভাষ জানালেন, তিনি তাঁর মত স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন, নতুন কিছু বলার আর নেই। তখন জওহর প্রত্যাহার করে নিলেন তাঁর প্রস্তাবটি। সরোজিনী এ আই সি সি-র সদস্যদের অনুরোধ করলেন নতুন সভাপতি মনোনীত করতে। সুভাষের শূন্য আসনে বসলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ। নতুন ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকতে রাজি হলেন না সুভাষ। জওহর বললেন, তিনিও থাকবেন না এই কমিটিতে।

এ আই সি সি-র এই বৈঠকের মাসখানেকের মধ্যেই (২৪ মে) এই সম্পর্কে আমরা কলম ধরতে দেখি জওহরকে। সেই প্রবন্ধটির নাম 'এ আই সি সি অ্যাণ্ড আফটার'। জওহর লিখছেন: কলকাতায় সুভাষবাবু যে-সব প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার সব কটি সম্পর্কেই যে আমি একমত ছিলাম তা নয়, কিন্তু আমার নিশ্চিতই মনে হয়েছিল তিনি ত্রিপুরীর সিদ্ধান্তগুলি মেনে নিয়ে কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধ কাজকর্মের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন। এই ব্যাপারে সফলতা আসা কেন কঠিন হবে তার কোন কারণই আমি খুঁজে পাই নি, কিন্তু বিরোধিতা এল (আমার মতে এই বিরোধিতা

একেবারেই অযৌক্তিক) এবং তার পরিণতিতে তিনি ইস্তফা দিলেন। ঐ অবস্থায় পদত্যাগ হয়ত অনিবার্য ছিল, তবু এতে আমি খুবই পরিতাপ বোধ করেছি, কারণ এর ফলে কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মধ্যে ব্যবধানটা আরও গভীর হয়ে পড়ে। কলকাতায় এ আই সি সি-র বৈঠকে একটা বোঝাপড়ার মনোভাবের অভাবে আমি পরিতাপ বোধ করেছি আরও বেশি।

জওহর আরও লিখলেন: এই অবস্থায় আমি নতুন ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগ দিতে পারিনি। পুরানো কমিটির সঙ্গে দীর্ঘদিনই আমার মনের মিল হচ্ছিল না, তবু আমি সদস্য থেকেছি, কারণ আমার মনে হয়েছে বড় স্বার্থে থাকা দরকার। কলকাতায় যে সব নতুন ঘটনা ঘটল তারপর আমার স্থান (কমিটির) বাইরে, অবশ্য বিরোধিতা বা অসহযোগের মনোভাব নিয়ে নয়।

ইস্তফা দেওয়ার আগে জওহরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল সুভাষের। সেই আলোচনাকে সুভাষ নিজেই বলেছেন 'ইণ্টারেস্টিং'। সুভাষ জানালেন, তিনি কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দিচ্ছেন, আর তারপর গঠন করছেন নতুন একটি দল। এই কথায় খুব একটা উৎসাহিত হলেন না জওহর। বললেন, এর ফলে তো কংগ্রেসে ভাঙন দেখা দেবে, এই সংকটের মুহূর্তে সংগঠন হয়ে পড়বে দুর্বল।

সুভাষ তখন বললেন, সংগঠনের ঐক্য নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু ঐক্যও তো দুই ধরনের। এক ধরনের ঐক্য হল যার দ্বারা প্রকৃত সংগ্রামের কাজ করা যায়। আর এক ধরনের ঐক্য সকলকে করে তোলে অকর্মণ্য। কংগ্রেসে এই মুহূর্তে ঐক্য বজায় থাকতে পারে একটি মাত্র উপায়েই—গান্ধী গোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণের দ্বারা। কিন্তু ঐ গোষ্ঠী এখন জাতীয় সংগ্রাম চায় না। সুতরাং এখন যদি ঐক্য বজায় রাখাই প্রধান কথা হয়, তবে তো ভবিষ্যতে সব আন্দোলনের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সুভাষ তাই বললেন, এখন যদি কংগ্রেসের মধ্যেই একটা নতুন দল (গোষ্ঠী) গঠন করা যায় যার কার্যধারা হবে গতিশীল, তবে

একদিন হয়ত এই গোষ্ঠী গান্ধীবাদীদের তথা গোটা কংগ্রেসকে আন্দোলনের পথে নিয়ে যেতে পারে। বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন, সেই সুযোগ নেওয়ার জন্যও নতুন দল দরকার।

জওহর অবশ্য এই সব যুক্তি মানলেন না। কংগ্রেসে ভাঙনের কোনরকম প্রস্তাবই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই সুভাষ গঠন করলেন ফরওয়ার্ড ব্লক। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই বামপন্থী শক্তিকে সংহত করা এর উদ্দেশ্য। ত্রিপুরীর অভিজ্ঞতার পরই সুভাষ বুঝতে পেরেছিলেন (এখন নিশ্চয়ই মনে হবে একটু বেশি দেরিতেই বুঝেছিলেন) গান্ধী গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়তে গেলে বামপন্থী শক্তিগুলির ঐক্য বিশেষত প্রয়োজন। ভবিষ্যতে যদি ঐ গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়তে হয়, তবে ফরওয়ার্ড ব্লকের মতো একটা নিজস্ব গোষ্ঠী থাকলে লড়াই করা সুবিধে হবে। একদিন হয়ত গোটা কংগ্রেসকেও তাঁর পথ অবলম্বন করাতে তিনি সমর্থ হবেন। আর যদি না-ও হয়, তবু প্রয়োজনে নিজেই আন্দোলনে নামতে পারবেন।

বছর চারেক পরে প্রবাসে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সুভাষ এই সব কথা লেখেন। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের সময়েই 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও সুভাষ ব্যাখ্যা করেন নতুন গোষ্ঠী গঠনের উদ্দেশ্য। বামপন্থী শক্তিকে সংহত করা, কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে দলে টেনে আনা, আর আবার জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা—এই হল নতুন গোষ্ঠীর তিন লক্ষ্য (দা রোল অব ফরওয়ার্ড ব্লক, ১২ আগস্ট ১৯৩৯)। ১৯৪০ সালে শেষ কারাবাসের সময়েও সুভাষ শুরু করেন একটি রচনা: দা ফরওয়ার্ড ব্লক ইন পারস্‌পেকটিভ। এটিকে তিনি বিশদ আকার দেন ১৯৪১ সালে দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর কাবুলে। কংগ্রেস আন্দোলনের নিজস্ব প্রয়োজনেই ঐতিহাসিক অনিবার্যতা নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিকাশের পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন সুভাষ।

সুভাষকে নিজে কলম ধরতে হল, কারণ নতুন গোষ্ঠীর লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছিলেন। তাঁদের অন্যতম

জওহরলাল। তিনি বললেন: সুভাষবাবু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেছেন। যা সব ঘটে গেল তারপর এই পদক্ষেপের কারণ বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু তাই বলে এটা যে বাঞ্ছনীয় তা নয়। কারণ এর মধ্যে স্পষ্টই রয়েছে বিপদের আশঙ্কা। ফরওয়ার্ড ব্লককে জওহর চিহ্নিত করলেন নেতিবাচক গোষ্ঠী, 'অ্যান্টি-ব্লক' হিসেবে। এদের ঐক্যের সূত্র একটাই। আজ যারা কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের বিরোধিতা। নির্দিষ্ট লক্ষ্য-আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত কোন নীতি নেই। একমাত্র কংগ্রেসের লক্ষ্য-আদর্শকে কিছুটা ঝাঁঝালো করে তোলা ছাড়া। (দা এ আই সি সি অ্যাণ্ড আফটার—২৪ মে ১৯৩৯)

আমরা দেখি জওহরের শঙ্কা শুধু নীতি-আদর্শের প্রশ্নেই নয়। যাঁরা এই গোষ্ঠীতে আছেন বা আসবেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন তিনি। বলছেন: ব্লকের দ্বার অবারিত। রাজনৈতিক বা অন্যান্য দিক দিয়ে যারা অবাঞ্ছিত তাদের প্রবেশে কোন বাধানিষেধ নেই। কংগ্রেসের মধ্যেই ঢুকে পড়েছে অনেক হঠকারী, সুযোগ-সন্ধানীর দল। তা নিয়েই অনেক ঝামেলা। কংগ্রেসের দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং অন্তর্নিহিত শক্তির জন্য তাদের কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা গেছে। কিন্তু নতুন সংগঠনে বিপদ আরও বেশি। খুবই সম্ভব যে ফ্যাসিস্ত ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব-সম্পন্ন লোকেরা এই দলে ভিড়ে পড়বে এবং কংগ্রেস ও তার ফ্যাসিবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে নতুন দলকে কাজে লাগাবে। এই অবস্থা দেখা দিলে তখন সুভাষবাবু কী করবেন? মনে রাখতে হবে বিপ্লবী শ্লোগান আর লোক-ভোলানো বাক্যজালের আড়ালেই ইউরোপে ফ্যাসিবাদের বিকাশ ঘটেছে।

ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে জওহর নিজের "অসুবিধার" আরও অন্তত দুটি কারণ জানিয়েছেন। নির্দিষ্ট নীতি-আদর্শের অভাবের প্রসঙ্গে জওহর বলছেন, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কিছু বক্তৃতা ও রচনার মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের কিছু নির্দিষ্ট নীতির কথা তিনি জানতে পেরেছেন। মানবেন্দ্রনাথের এই সব বক্তব্য থেকে তাঁর মনে হয়েছে, কংগ্রেসের এতদিনের নীতি থেকে তিনি একেবারেই সরে যেতে চান। এই

বক্তব্য ত্রিপুরীতে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। এমন কি, বর্তমানের নানা সমস্যা নিয়ে সুভাষবাবুরও যে চিন্তাধারা তার সঙ্গেও এই বক্তব্যের মিল নেই। জওহর নিজেও কংগ্রেসে অনেক পরিবর্তন চান, কিন্তু সেই পরিবর্তন অতীতের কাজের ধারা বেয়েই আসা উচিত, খুব বড় রকমের বদল ঘটাও উচিত নয়।

এ ছাড়াও জওহরের মনে হয়েছে, ফরওয়ার্ড ব্লক অথবা এই ধরনের কোন গোষ্ঠী গড়ে তুললে এর বিরোধী গোষ্ঠীগুলিও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে। এটা অবশ্য কোন গোষ্ঠী গঠন না করার কোন কারণ হতে পারে না, কিন্তু ঠিক সময়ে এবং ঠিকভাবে গোষ্ঠী গঠনের কারণ হতে পারে বৈকি। এর ফল হবে কি, সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন কমিটি দখল করার জন্য দেখা দেবে তিক্ত সংঘর্ষ। গণতান্ত্রিক সংগঠনে এই ধরনের সংঘর্ষ দেখা দিতেই পারে। কিন্তু ভিতরে-বাইরে সংকটের মুহূর্তে এই ধরনের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া হবে পরিতাপের বিষয়।

সুভাষ এই সমালোচনার জবাব দিয়েছেন একাধিক রচনায়। অনেক ক্ষেত্রেই নাম না উল্লেখ করলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁর বক্তব্যের লক্ষ্য জওহর। যেমন 'আওয়ার ক্রিটিকস' (ফরওয়ার্ড ব্লক ১৯ আগস্ট ১৯৩৯)। নতুন গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট নীতি-আদর্শের অভাব আছে, এটা যে একটা 'অ্যান্টি ব্লক', কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরোধিতা করাই এর লক্ষ্য—জওহরের এই সব মন্তব্যেরই উল্লেখ করছেন সুভাষ।

বলছেন, এখন ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, এই গোষ্ঠীতে নাকি সুবিধাবাদী আর ফ্যাসিস্তদের ভিড়। সুভাষের প্রশ্ন: সুবিধাবাদীরা ফরওয়ার্ড ব্লকে আসতে যাবেন কেন? এই গোষ্ঠীতে এলে তো দু' দিক থেকে নির্যাতনের শিকার হতে হবে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং কংগ্রেসী আমলাতন্ত্র। আসল সুবিধাবাদীদের দেখা পাওয়া যাবে দক্ষিণপন্থী শিবিরে। এরপর 'তথাকথিত বামপন্থীদের' সম্পর্কে সুভাষের মন্তব্যটির লক্ষ্য কে তা বুঝতে অসুবিধে

হওয়ার কথা নয়ঃ "মুখে বামপন্থী, কাজে দক্ষিণপন্থী—মুখের কথায় গান্ধীজিকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, তারপর দক্ষিণপন্থীদের প্রথম ধমকেই নতি স্বীকার—ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বর্জন করা এবং তারপরও কমিটির আলোচনায় যোগদান—এগুলিই সম্ভবত সুবিধাবাদের চমৎকার উদাহরণ।"

এই সময়েই আমরা দেখি সুভাষ বারবার জওহরকে অভিহিত করছেন প্রাক্তন বামপন্থী নেতা হিসেবে। জওহর যে বামপন্থীদের পক্ষ ত্যাগ করে পুরোপুরিই দক্ষিণপন্থীদের শিবিরে চলে গেছেন তাতেই সুভাষের ক্ষোভ, সুভাষের আক্ষেপ। 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইয়ের দ্বিতীয় পর্বে স্মৃতিচারণ করতে গিয়েও এসেছে ফরওয়ার্ড ব্লক ও জওহর প্রসঙ্গ।

সুভাষ বলেছেনঃ ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্মের ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তীক্ষ্ণতর হল। কারো পক্ষেই আর কোন নির্দিষ্ট পক্ষ অবলম্বন করা বা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। এই অভ্যন্তরীণ সংকটে সবচেয়ে অসুবিধেয় পড়লেন জওহরলাল নেহরু। এতদিন পর্যন্ত তিনি চমৎকার দক্ষতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে দুই নৌকায় পা দিয়ে চলেছেন। বামপন্থীদের বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক হয়ে থেকেছেন, আবার গান্ধী গোষ্ঠীরও সমর্থন আদায়ে সমর্থ হয়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে তাঁকে একটা পথ বেছে নিতে হল এবং তিনি দক্ষিণপন্থী—গান্ধী গোষ্ঠীর দিকে ঝুঁকলেন। গান্ধী গোষ্ঠী এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে সম্পর্ক যখন তিক্ত হয়ে উঠতে লাগল, নেহরু তখন ক্রমেই আরও বেশি করে মহাত্মার সমর্থনে এগিয়ে গেলেন।

কংগ্রেসের এবং নিজের রাজনৈতিক জীবনের চরম সংকটে জওহরলালের সুস্পষ্ট সমর্থন না পাওয়ায় সুভাষের আক্ষেপ ও ক্ষোভের যথেষ্ট কারণ ছিল। মুখে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কাজে গান্ধীবাদের সমর্থন—জওহরের আচরণ সম্পর্কে তাঁর এই বিশ্লেষণও ভুল নয়। কিন্তু জওহর এই সময়ে পুরোপুরি গান্ধী গোষ্ঠীতেই নাম লিখিয়েছেন, এ-কথাও ঠিক নয়। আসলে তিনি

এই সংকটের মধ্যে নিজেও সংকটে পড়েছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর সংসর্গ যে তাঁর পছন্দ নয় তা তিনি বারবারই বলছেন, এদিকে সুভাষের সমর্থনেও পুরোপুরি এগিয়ে আসতে পারছেন না। দুলছেন তাঁর স্বভাবসুলভ দোদুল্যমানতায়।

কুড়ি

সভাপতি পদে ইস্তফা দেওয়ার পর কয়েক মাসও গেল না, কংগ্রেস থেকে কার্যত বহিষ্কৃত হলেন সুভাষ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, দলের নিয়মশৃংখলা মানছেন না তিনি। এ আই সি সি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সংশ্লিষ্ট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোন কংগ্রেস কর্মী সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে পারবে না। আর একটি সিদ্ধান্ত : কোন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সঙ্গে যদি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বিবাদ দেখা দেয়, তবে তা মেটাবার দায়িত্ব পড়বে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর।

সুভাষ এবং বামপন্থীরা এই দুটির কোন সিদ্ধান্তই মানতে রাজি ছিলেন না। বেশ কয়েকটি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাল। ৯ জুলাই সুভাষের নেতৃত্বে বাম সংহতি কমিটি ডাক দিল দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের। কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও পালিত হল প্রতিবাদ দিবস।

কংগ্রেস নেতৃত্ব কৈফিয়ৎ চাইলেন সুভাষের। সেই কৈফিয়ৎ যথেষ্ট জোরালো ভাষাতেই দিয়েছিলেন সুভাষ। কংগ্রেসের যে-কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করার গণতান্ত্রিক অধিকার তাঁর আছে বলে দাবি করলেন তিনি। তিনি যা করেছেন জেনে-বুঝেই করেছেন, তার জন্য সাজা পেতেও তিনি প্রস্তুত।

সাজা পেতে অবশ্য দেরি হল না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ থেকে তাঁকে অপসারিত করা হল। আরও সিদ্ধান্ত হল, পরবর্তী তিন বছর তিনি কংগ্রেসের কোন নির্বাচিত পদে

থাকতে পারবেন না। গান্ধীজি নিজের হাতে রচনা করলেন সেই প্রস্তাব (আগস্ট ১৯৩৯)। কংগ্রেসের ইতিহাসে আবার ঘটল নজিরবিহীন ঘটনা। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতিই হলেন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত। জওহরলাল বলেছেন, এই সাজা দেওয়াটা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে একটা খুবই অসাধারণ বা অস্বাভাবিক ব্যবস্থা (আনইউজুয়াল স্টেপ)। কিন্তু তাঁর মন্তব্য থেকে মনে হয় না যে, ওয়ার্কিং কমিটি খুব একটা অন্যায় কাজ করেছে বলে তিনি মনে করেছিলেন (ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া—নবম অধ্যায়)।

সুভাষের এই সাজার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হল মহাত্মা গান্ধীর সুভাষ হঠাও অভিযান। ঐতিহাসিকেরা কেউ কেউ এই অভিযানের নাম দিয়েছেন অহিংস পদ্ধতিতে নিধন। কেউ বলেছেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে এতদিন গান্ধীজি যে অসহযোগ আন্দোলন করে এসেছেন এবার তিনি সেই অস্ত্র সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করলেন সুভাষের বিরুদ্ধে। মাইকেল ব্রেশার খোলাখুলিই বলেছেন: ত্রিপুরীর নাটকের কুশীলবদের মধ্যে একমাত্র গান্ধীজিরই ছিল সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য—সুভাষকে অপসারণ। শেষ পর্যন্ত তিনি তাই করলেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, এই মহামানবকে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে মনে হয়েছে নিতান্তই ক্ষুদ্রমনা।

কিন্তু কেন গান্ধীজির এই আচরণ? সুভাষের নিজের ব্যাখ্যা এই রকম: কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটেনের সঙ্গে কোন রকম আপসরফার প্রয়াসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে। এতে গান্ধীজির ঘনিষ্ঠ মহল অখুশি হন, কারণ তখন তাঁরা চেষ্টা করছিলেন ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বোঝা-পড়ায় আসার। ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠনের পর গান্ধীজি আরও ক্ষুব্ধ হন, কারণ এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের শিল্পায়নের নক্শা প্রস্তুত করা এবং গান্ধীজি ছিলেন শিল্পায়নের বিরোধী। মিউনিখ চুক্তির পর সুভাষ দেশব্যাপী প্রচার শুরু করেছিলেন ইউরোপে আসন্ন যুদ্ধের কথা মনে রেখে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার

জন্য। তাঁর এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের সমর্থন পেলেও গান্ধীবাদীদের পছন্দ হয়নি, কারণ তখন তাঁরা মন্ত্রিত্ব আর সংসদীয় কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার ঝামেলায় আর যেতে চাইছিলেন না (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল)।

জাতীয় সংগ্রাম নতুন করে শুরু করার জন্য সুভাষের আর্জিতে গান্ধীজি কর্ণপাত করেননি কিছুতেই। শেষবার গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে সেবাগ্রামে ছুটে যান সুভাষ ১৯৪০ সালে জুন মাসে। সেখানেও তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আবার সংগ্রাম শুরু করতে গান্ধীজিকে রাজি করানো। কিন্তু গান্ধীজি সুভাষকে অনেক ভালো ভালো কথা বললেও (সুভাষ, আমি তোমাকে সব সময়েই ভালোবাসি। দেশপ্রেম আর স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্পে তুমি কারো চেয়ে কম যাও না। তোমার আন্তরিকতা স্পষ্ট। আত্মত্যাগ আর নির্যাতন সহ্য করার সংকল্পে কেউই তোমাকে পিছনে ফেলে যেতে পারবে না। এক মহান নেতা হওয়ার সব গুণই তোমার আছে। ইত্যাদি।) তাঁর আবেদনে সাড়া দেননি। এমন কি সুভাষ যখন নিজে আন্দোলন শুরু করার জন্য আশীর্বাদ চেয়েছেন তখনও তিনি তা দিতে চাননি।

ইংরেজদের চরমপত্র দিয়ে জাতীয় আন্দোলন শুরু করার প্রশ্নেই শেষ পর্যন্ত গান্ধীজির সঙ্গে সুভাষের রাজনৈতিক বিরোধ চরম রূপ নেয়। গান্ধীজির মতে, নতুন আন্দোলন শুরু করার সময় তখনও আসেনি। কারণ তাঁর মতে, দেশ তখনও নতুন আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত নয়। কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্নীতি। তা ছাড়া, এই মুহূর্তে আন্দোলন শুরু করলে তা হিংসাত্মক রূপ নেওয়ার আশঙ্কা।

সুভাষ মানতে পারেননি এই যুক্তি। তাঁর মতে, জনগণ তৈরিই আছে, নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হচ্ছে কংগ্রেস। গান্ধীজি কিন্তু মনে করছেন তখনও যে আন্দোলন শুরু করার পক্ষে আরও ভালো সময় আসবে অথবা দেশব্যাপী আন্দোলন ছাড়াই ইংরেজ বোঝাপড়ায়

আসবে কংগ্রেসের সঙ্গে

কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস কী প্রমাণ করে? সুভাষের সঙ্গে সেবাগ্রামে ঐ আলোচনার কয়েক মাস পরেই গান্ধীজি সিদ্ধান্ত নিলেন 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ' শুরু করার। সেই কর্মসূচীতে প্রথম সত্যাগ্রহী বিনোবাভাবে এবং দ্বিতীয় জওহরলাল নেহরু। এই কর্মসূচী অবশ্যই ছিল অনেকটা প্রতীকী ধরনের, তবু তো বেশ কয়েক বছর পরে কংগ্রেসকে দেখা গেল একটু নড়ে-চড়ে বসতে। আর এর বছর দুয়েকের মধ্যে, ইংরেজ সরকারের সদাশয়তায় বিশ্বাস হারিয়ে শেষ পর্যন্ত যে ইংরেজকে চরমপত্র দিয়ে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার ডাক দিতে বাধ্য হলেন গান্ধীজি (আগস্ট ১৯৪২) তা কি সুভাষের বক্তব্যের সারবত্তাই প্রমাণ করল না? ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কংগ্রেস থেকে দূর হয়ে যায়নি সব দুর্নীতি, অথবা দেশ থেকে দূর হয়ে যায়নি হিংসার আবহাওয়া।

গান্ধী-সুভাষ দীর্ঘ পত্রালাপের মধ্যে গান্ধীজিকে এক জায়গায় আমরা লিখতে দেখি: রাজনৈতিক মঞ্চে আমরা কী ভাবে মিলিত হতে পারি? সেখানে আমাদের মতপার্থক্য বরং বজায় থাকুক, আমরা সামাজিক, নৈতিক পৌর মঞ্চে মিলিত হই। আমি অর্থনৈতিক মঞ্চের কথা বলতে পারলাম না, কারণ ঐ মঞ্চেও যে আমাদের মতবিরোধ আছে, তা আমরা দেখতে পেয়েছি। (রাজকোট থেকে চিঠি, ১০ এপ্রিল ১৯৩৯)।

সুভাষ নিজেও আভাস দিয়েছেন এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মতবিরোধের, যখন তিনি ন্যাশনাল প্ল্যানিং সম্পর্কে গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের বিরোধিতার কথা বলেছেন। জওহরলালকে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির শিরোমণি করে গান্ধীবাদীদের বিরোধিতা কিছুটা ভোঁতা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সুভাষ। কিন্তু এই ব্যাপারে গান্ধীজির দ্বিধা-সন্দেহ মোটেই দূর হয়নি। জওহরকে তিনি স্পষ্টই লিখেছেন (১১ আগস্ট ১৯৩৯): এই কমিটি যে কী কাজ করছে তা আমি কখনোই বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারিনি। এত যে

অসংখ্য সাব কমিটি তৈরি করা হয়েছে তার উদ্দেশ্যও আমি বুঝতে পারিনি। আমার মনে হয়েছে এমন একটা ব্যাপারে শ্রম আর অর্থের অপচয় করা হচ্ছে, যা থেকে বিশেষ বা আদৌ কোন ফল পাওয়া যাবে না।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বৃহৎ শিল্পের প্রসার ঘটবে, কুটীর ও গ্রামীণ শিল্প মার খাবে—এমন আশঙ্কা দূর করতে বারবারই উদ্যোগী হয়েছেন সুভাষ ও জওহর। কিন্তু তবু গান্ধীজির আশঙ্কা যায়নি। তা ছাড়া, গান্ধীজি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিলেন যে, হরিপুরা ভাষণে সুভাষ যে সমাজতান্ত্রিক পথে ভবিষ্যৎ দেশগঠনের কথা বলেছিলেন তা নিশ্চয়ই কথার কথা নয়, ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি সেই স্বপ্ন রূপায়ণের পথে একটি সোপান। আর সুভাষ তো শুধু আধুনিক ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার কথাই বলেন নি, ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের কথাও বলেছিলেন। ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ যে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পথেই ঘটবে, সুভাষের অহরহ এই ঘোষণা নিশ্চয়ই গান্ধীজি ও তাঁর নিষ্ঠাবান অনুগামীদের কানে সুধাবর্ষণ করেনি।

গান্ধীজিও এক ধরনের সমাজবাদে অবশ্যই বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তার মূল কথা ছিল মানবতাবাদ। রাষ্ট্রের উদ্যোগে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনা নয়। তিনি মনে করতেন একজন রাজাও সমাজবাদী হতে পারেন যদি তিনি প্রজাবৎসল হন। কিন্তু যাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ তাতে তাঁর আস্থা ছিল না। কংগ্রেসের মধ্যে যখন সমাজবাদীরা একত্র হতে শুরু করলেন তখন গান্ধীজি বললেন: কংগ্রেসে যদি সমাজবাদীরা প্রাধান্য পায়, এবং তা পেতেই পারে, তবে আমি কংগ্রেসে থাকতে পারি না (সেপ্টেম্বর ১৯৩৪)।

মৌলিক ব্যাপারে সুভাষের সঙ্গে গুরুতর মতবিরোধের কথা স্বয়ং গান্ধীজি স্বীকার করছেন বারবার: দা ভিউজ ইউ এক্সপ্রেস সিম টু মি টু বি সো ডায়ামেট্রিকালি অপোজড্ টু দোজ অব দা আদার্স অ্যাণ্ড মাই ওন ভাট আই ডু নট সি এনি পসিবিলিটি অব ব্রিজিং

দেন (২ এপ্রিল ১৯৩৯, দিল্লি থেকে চিঠি)। আবার আট দিন পরে রাজকোট থেকে লিখছেন: দা গালফ ইজ টু ওয়াইড, সাসপিসন্ টু ডিপ। আই সি নো ওয়ে অব ক্লোজিং দা র‍্যাকস্। ঐ চিঠিতেই গান্ধীজির আর একটি মন্তব্য থেকেও এ-কথা স্পষ্ট যে, মতবিরোধটা নিছক ব্যক্তিগত নয়। গান্ধীজি সুভাষকে বলছেন, তুমি যদি মনে করে থাকো ওল্ড গার্ডের মধ্যে তোমার একজনও ব্যক্তিগত শত্রু আছে তবে তুমি ভুল করবে।

কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, ত্রিপুরী ঘিরে যে সংকট, জওহরলাল তাকে আগাগোড়া ব্যক্তিগত বিরোধ বলেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, এর পিছনে নীতি-আদর্শের কোন ব্যাপার আছে বলে স্বীকার করতে চাননি। সুভাষের কাছে যখন চিঠি লিখছেন অথবা প্রবন্ধ লিখছেন ন্যাশনাল হেরল্ডে, তখন বারবার বলছেন বর্তমান সংকটের পিছনে কোন আদর্শের দ্বন্দ্ব নেই, নেই বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী লড়াই। বরং সুভাষ যে বাম ও দক্ষিণ শব্দ ব্যবহার করছেন তাতে রীতিমতো আপত্তি করছেন জওহর। সুভাষ অবশ্য ক্ষুব্ধ হয়ে বলছেন: তুমি অনায়াসে বাম-দক্ষিণের কথা বলতে পারো, আর আমি বললেই যত দোষ?

জওহর ত্রিপুরী সংকটকে শুধুই ব্যক্তিগত বিরোধ হিসেবে দেখেন নি। আমরা লক্ষ্য করি, তিনি এই ব্যাপারের মধ্যে প্রাদেশিকতাও এনে ফেলেছেন। ভি কে কৃষ্ণমেননকে তিনি যে-কথা বলেছিলেন (৪ এপ্রিল ১৯৩৯), তা থেকে আমরা আর কোন্ সিদ্ধান্তে আসতে পারি? জওহর বলেছিলেন: এই মুহূর্তে সুভাষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন বাংলার প্রতীক। প্রতীকের সঙ্গে বা প্রতীককে নিয়ে তর্ক করা নিতান্তই অসম্ভব।

অবশ্য জওহরলাল বলতে পারতেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিষয়টিকে বাংলার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। কংগ্রেস সভাপতি পদে সুভাষের ইস্তফার পর কবি যে বিবৃতি দেন (মে মাসে) তাতে এসে যায় বাংলার কথা। সুভাষের কাছে বাণীতে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

চরম উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে তুমি যে মহত্ত্ব ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছ তাতে তোমার নেতৃত্বে আমার আস্থা জেগেছে। নিজের আত্মমর্যাদার জন্যই বাংলাকে এখনও একই ধরনের শিষ্টতা বজায় রেখে চলতে হবে এবং তার দ্বারাই তোমার আপাত পরাজয়কে চিরকালীন বিজয়ে রূপান্তরিত করতে হবে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর কবি গান্ধীজিকে যে চিঠি লেখেন (২৯ মার্চ ১৯৩৯), সেখানেও তিনি বলেছিলেন 'সাম রুড হ্যাণ্ডস হ্যাভ হার্ট বেঙ্গল'। আরও পরে কংগ্রেস থেকে সুভাষ যখন কার্যত বিতাড়িত, তখন রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত রচনা তো এখন ইতিহাসের অঙ্গ। কবি লেখেন :

সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার অবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে যখন রাষ্ট্র জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।...

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা—তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্য দিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট।...

বহুকাল পূর্বে এক দিন আর এক সভায় আমি বাঙালি সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।...আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে। (দেশনায়ক—

কালান্তর ১৯৩৯।)

রবীন্দ্রনাথকে আর যে-ভাবেই চিহ্নিত করা যাক অন্তত বাঙালি জাতি-অভিমানী হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। তিনি যে সুভাষ ও জওহরকে একত্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেখতে চেয়েছিলেন, তার কারণ এই দু'জনকেই তিনি মনে করতেন আধুনিক মনোভাবাপন্ন নেতা বলে। কিন্তু গান্ধীজি তাঁর কথায় কর্ণপাত করেন নি, তাঁর আবেগময় আবেদনের জবাবে দিয়েছেন নিরুত্তাপ উত্তর। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে কবি যে আগ্রহ দেখাচ্ছেন তাতে খুশি হননি জওহরও।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে-চিঠি লেখেন (নভেম্বর ১৯৩৮) জওহর তাঁর একটি ভদ্র উত্তর দেন, কিন্তু কবির অনুরোধ মতো সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসেন নি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী বৈঠক পর্যন্ত যাওয়া পিছিয়ে দিতে চান তিনি। ঐ বৈঠকেই পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল।

রবীন্দ্রনাথকে ভদ্রতাসূচক উত্তর দিলেও তাঁর সচিব অনিলকুমার চন্দকে জওহর যে চিঠি দেন (১ ডিসেম্বর) তা খুব স্পষ্ট ভাষায় লেখা। জওহর লিখলেন: কংগ্রেস সভাপতি পদের উপর কবি অযথা গুরুত্ব আরোপ করছেন। কংগ্রেস সভাপতি নিজে বড় কোন নীতি নির্ধারণ করেন না, তা ছাড়া কোন পদে না থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যেতে পারে।

ফেব্রুয়ারিতে শান্তিনিকেতনে জওহর-সুভাষ বৈঠক যে ফলপ্রসূ হয়নি, তা আমরা আগেই দেখেছি। বিশ্বভারতীর হিন্দি ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন জওহর। সুভাষকেও ঐ সময় আনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বিশ্বভারতী নিউজ' সূত্রে জানা যায়, দু'জনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

ত্রিপুরী সংকটে জওহরের ভূমিকায় খুশি হতে পারেন নি

রবীন্দ্রনাথ। দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ আগাথা হ্যারিসনকে ঐ সময় (৩ মে) এক চিঠিতে লেখেন: জওহরলাল নেহরু যে ভূমিকা নিয়েছেন তাতে গুরুদেব অত্যন্তই ক্ষুণ্ন হয়েছেন।

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব যখন সুপরিকল্পিত ভাবে-সুভাষকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করলেন, তখনই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেশনায়ক হিসেবে বরণ করে নিলেন 'বাঙালি কবি' হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রাদেশিকতার সম্ভাব্য অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চয়ই সচেতন ছিলেন। তাই নিজেই বলেছেন: এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই, অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসনে স্থাপন করতে চাই রাষ্ট্রধর্মে যিনি পৃথিবীতে নতুন যুগের উদ্বোধন করেছেন···সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মুল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে আমার এই আবেদন।

কিন্তু বাঙালির ও বাংলার অবমাননার প্রসঙ্গটি কবির মন থেকে দূর হয়নি। তাই অমিয় চক্রবর্তীকে মংপু থেকে লেখেন (২০ মে ১৯৩৯):

গত কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবহারে বাঙালি জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে, এই অভিযোগ বাংলাদেশে ব্যাপ্ত। এই নালিশটাকে বিশ্বাস করে নেওয়ার মধ্যে দুর্বলতা আছে।

তবু কবি স্বীকার করেন, সমস্ত বাংলাদেশের সঙ্গে কংগ্রেসের বন্ধনে টান পড়েছে ছেঁড়বার মুখে। এর আবশ্যকতা ছিল না। সমগ্র একটা বড়ো প্রদেশের এ রকম মনশ্চাঞ্চল্যের অবস্থায় বাংলাদেশের নেতাদের ঠিক পথে চলা দুঃসাধ্য হবে।

কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে তখন যে মূল রোগ দেখা দিয়েছিল তার বিশ্লেষণে কবির ভুল হয়নি। আর আমরা দেখি, জওহরলাল যতই আদর্শগত বিরোধের কথা অস্বীকার করুন, তিনিও কংগ্রেসের একই ধরনের রোগের ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

সভাপতি নির্বাচনের পরই জওহরকে আমরা বলতে শুনি: সভাপতির পুনর্নির্বাচন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তারই জয়। এর দ্বারা কংগ্রেস প্রতিনিধিরা (ডেলিগেট) দেখাতে চেয়েছেন যে, তাঁরা চান আমাদের নীতি আরও কঠোর হয়ে উঠুক। এর দ্বারা (কংগ্রেসের) উপর তলায় যে একনায়কতন্ত্রী মনোভাব (অথরিটারিয়ানিজম) দেখা দিয়েছে তার সম্পর্কে বিরাগও প্রকাশ পেয়েছে।

কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে এই স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের কথা একাধিকবারই বলেছেন জওহর ঐ রচনায় (ফ্রম লখনউ টু ত্রিপুরী)। রবীন্দ্রনাথও কি একই কথা বলছেন না? 'ইমপিরিয়ালিজম বলো, ফ্যাসিজম বলো, অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। কংগ্রেসেরও অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়ত অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। যাঁরা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্টভাবে অধিকার করে আছেন, সঙ্কটের সময় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচারবুদ্ধি সোজাপথে চলেনি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য, যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থভাবে কংগ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হত, তার ব্যভিচার ঘটতে দেখা গেছে, এই ব্যবহার বিকৃতির মূলে আছে শক্তিস্পর্ধার প্রভাব।...

মুক্তির সাধনা তপস্যার সাধনা। সেই তপস্যা সাত্ত্বিক, এই জানি মহাত্মার উপদেশ। এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন, তাঁদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত? তাঁরা পারস্পরিক আঘাত করে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্য? তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারেই নেই, যে উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত? ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গড়ে উঠেছে, তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাইনি—যখন মহাত্মাজিকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলিনি ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন? সত্যের যজ্ঞে যে কংগ্রেসকে গড়ে তুলেছেন তপস্বী, তার বিশুদ্ধতা কি তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন— শক্তিপূজায় নরবলি সংগ্রহের কাপালিক মুসোলিনি ও হিটলার

যাদের আদর্শ ?···আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহরলালকে।··· আমি তাঁকে প্রশ্ন করি কংগ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করেনি ? (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি।)

জওহর যাকে অথরিটারিয়ানিজম বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ অথবা একাধিপত্যপ্রিয়তা।

ঐ সময়ে সুভাষ ও তাঁর বামপন্থী অনুগামীদের কাজকর্ম থেকে ফ্যাসিস্ত কর্মকাণ্ডের সূচনা হতে পারে—এমন আশঙ্কা জওহরকে একাধিকবার প্রকাশ করতে দেখি। কিন্তু কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর শক্তিমদমত্ততা সম্পর্কে তিনি ইঙ্গিত দিলেও তার নিন্দায় তিনি তেমন সরব নন, তার প্রকাশে নন তত উদ্বিগ্নও।

একুশ

অসুস্থ কমলার চিকিৎসার জন্য জওহর তখন ইউরোপে। লোসানে রয়েছেন তিনি। কমলার যেখানে চিকিৎসা হচ্ছিল সেই ক্লিনিকে অসুস্থ হয়ে ভর্তি হয়েছেন, ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট নেতা বেন ব্র্যাডলিও। ব্র্যাডলিকে দেখতে এসেছেন আর এক কম্যুনিস্ট তাত্ত্বিক রজনী পাল্‌মে দত্ত। সেই সময়ে জওহর আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট মহলে পরিচিত ছিলেন 'প্রোফেসর' নামে। 'প্রোফেসরের' সঙ্গে রজনী পাল্‌মে দত্তের গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা হল দিন তিনেক ধরে।

ইতিমধ্যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে কম্যুনিস্ট দুনিয়ার মতামত বদল হতে শুরু করেছে। জওহর যে-বছর প্রথম কংগ্রেস সভাপতি হলেন, তখন এক দিন মজফফর আমেদ বলেছিলেন পি সি যোশীকে : জওহরলাল নেহরু তোমাকে কী বলেছে তা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন ? তার মতো একজন ভীরু সংস্কারবাদীর

(রিফর্মিস্ট) কাছ থেকে এর চেয়ে আর বেশি কী আশা কর? (১ মার্চ ১৯২৯)।

এর পরের বছরই কম্যুনিস্ট পার্টির একটি পুস্তিকায় বলা হল: জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থীরা যে আন্দোলন চালাচ্ছে সেটাই হল ভারতীয় বিপ্লবের জয়ের পথে সবচেয়ে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক বাধা। আমাদের দলের প্রধান কাজ হল বামপন্থী কংগ্রেস নেতাদের মুখোশ খুলে দেওয়া।

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে শুধু জওহর সুভাষ সম্পর্কেই নয়, কংগ্রেসের গোটা আন্দোলন সম্পর্কেই ভিন্ন সুরে কথা বলতে শুরু করেছেন কম্যুনিস্টরা। সোভিয়েত নেতা দিমিত্রভ রচনা করেছেন নতুন তত্ত্ব। ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয় আন্দোলন কম্যুনিস্টদের চোখে তখন আর নিছক প্রতিবিপ্লব নয়। তাঁরা যখন সচেষ্ট জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে সামিল হতে, সেই আন্দোলনকে প্রভাবিত করতে।

রজনী পাল্মে দত্ত যখন জওহরের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন তখন দেখলেন 'প্রোফেসরও' কম্যুনিস্টদের এবং তাঁদের ধ্যানধারণা সম্পর্কে রীতিমতো আগ্রহী। পাল্মে দত্তকে তিনি বললেন, কংগ্রেস যে সামগ্রিকভাবে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে ঝুঁকছে, এ-কথা তিনিও মানেন। তিনি নিজে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে রাজি। মার্কসবাদ তিনি খুব গভীরভাবে পড়েননি, কিন্তু মার্কসবাদের মূল তত্ত্বের যৌক্তিকতা তিনি মানেন। মনের দিক থেকেও তাঁর টান আছে এই দিকে।

জওহর আরও জানালেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কীর্তিতে তিনি মুগ্ধ। রাশিয়াই হল ভবিষ্যতের দেশ। তিনি আশা করেন রাশিয়ায় যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে তারই একটা রূপ চালু হবে ভারতেও, কিন্তু তিনি বলপ্রয়োগের পথে তা করার পক্ষপাতী নন। ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য তাঁর কাছে অসীম। সে-কথাটা

কম্যুনিস্টদের মনে রাখতে হবে সব সময়ে।

কম্যুনিস্টরা জওহরের কাছে কী প্রত্যাশা করেন তার আভাসও পাল্মে দত্ত দিয়েছিলেন সেদিন। কংগ্রেসের তথাকথিত 'গঠনমূলক কার্যক্রম' আর নেতৃত্বে অবশ্য বদল আনতে হবে। শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলিকে যুক্ত করতে হবে কংগ্রেসের সঙ্গে। কোন ব্যক্তির একনায়কত্ব চলবে না, আনতে হবে বিকেন্দ্রীকরণ। অহিংস নীতি একটা দুর্বলতা, কংগ্রেসের আদর্শ থেকে তাকে বাদ দিতে হবে। এই প্রশ্নে চালাতে হবে তাত্ত্বিক সংগ্রাম। তবে তার জন্যে দলে ভাঙন ঘটাবার দরকার নেই।

এই আলোচনার কিছু দিন পরেই দেশে ফিরে এসে দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি হলেন জওহর। লখনউ অধিবেশনে তাঁর ভাষণ এবং তিনি যে সব প্রস্তাব এনেছিলেন সেগুলি এই আলোচনার দ্বারা নিশ্চয়ই বেশ কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল।

কিন্তু জওহরের সেই উদ্যোগের কী পরিণতি হয়েছিল তা আমরা আগেই দেখেছি (একাদশ অধ্যায়)। দক্ষিণপন্থী নেতাদের সঙ্গে সংঘর্ষের মুখে কীভাবে বারবার পদত্যাগের বাসনা তাঁর প্রবল হয়ে উঠেছে, ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কীভাবে তিনি কোণ্ঠাসা হয়ে পড়েছেন তা আমরা সবই দেখেছি। ১৯৩৬-৩৭ সালের সভাপতিত্বের অভিজ্ঞতার পর জওহর যে বারবার বলছেন তিনি আর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকতে চান না, তার কারণ নিছক রাজনৈতিক সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা নয়। কমিটির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সহকর্মীর সঙ্গে আদর্শগত দিক দিয়ে তাঁর এক সঙ্গে চলা সম্ভব হচ্ছিল না বলেই নিশ্চয়ই কমিটির বাইরে থেকে দেশ ও কংগ্রেসের সেবা করার যৌক্তিকতা তাঁকে আবিষ্কার করতে হচ্ছিল।

লখনউ কংগ্রেসে জওহরের উদ্দীপনাময় ভাষণ সত্ত্বেও সেখানে যে বামপন্থার জয় সূচিত হয় নি সে-কথা স্পষ্ট। বরং এই অধিবেশনের ফলাফলে খুশি হওয়ার কারণ ঘটেছিল দক্ষিণপন্থীদের। তাই আমরা দেখি ঘনশ্যামদাস বিড়লা বলছেন,—

মহাত্মাজি কথা রেখেছেন। তিনি একটি কথাও বলেন নি (লখনউ অধিবেশনে), কিন্তু নতুন কোন চিন্তাদর্শ যাতে গৃহীত না হয় সেদিকে নজর রেখেছেন। এক হিসেবে দেখতে গেলে জওহরলালের বক্তৃতাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে। (পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসকে চিঠি, ২০ এপ্রিল ১৯৩৬।)

জওহর দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার আগে সুভাষ তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন নিজের ক্ষমতাকে খাটো করে না-দেখতে, বরং সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে, কারণ এক হিসেবে জওহর গান্ধীজির চেয়েও শক্তিমান। কিন্তু জওহরকে ১৯৩৬-৩৭ সালে আমরা সেই শক্তিকে তেমনভাবে কাজে লাগাতে দেখি না, বরং সংঘর্ষের মুখে পড়ে বারবার সরে আসার বাসনাই ব্যক্ত করেন তিনি। আর তিরিশের দশকের শেষার্ধে কংগ্রেসের মধ্যে যে সংকট দেখা দেয় তাকে তিনি আদর্শগত বিরোধ হিসেবে চিহ্নিত করতে চান না, নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং ক্ষমতা দখলের লড়াই হিসেবে দেখতে চান।

আমরা আরও আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি, ওয়ার্কিং কমিটির যেসব দক্ষিণপন্থী সদস্যের সংসর্গে তিনি হাঁফিয়ে ওঠেন তাঁদেরই পরোক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসেন তিনি বারবার, কংগ্রেসের সংকটের জন্য দোষারোপ করেন সমাজতন্ত্রীদের এবং পরে সুভাষ ও তাঁর অনুগামীদের। এই শেষোক্তের দল সমাজতন্ত্র, প্রগতিশীলতা ও বামপন্থার নামে সংগঠন দখল করতে চায় বলেই কংগ্রেসে যত সংকট। যেন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে কোন গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের চেষ্টার মধ্যে কোন অন্যায় আছে। ফৈজপুর কংগ্রেসের জন্যও (১৯৩৭) যখন জওহর সভাপতি মনোনীত হলেন তখন বল্লভভাই কি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেন নি যে তাঁরা দলের শাসনযন্ত্রকে কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না?

আসলে তিরিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল ও বামপন্থী চিন্তাভাবনার বিকাশ দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে শঙ্কার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। কংগ্রেসের সমাজতন্ত্রী দলের অভ্যুদয়কে তাঁরা ভালো চোখে দেখেন নি। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯—এই চার বছর

যাঁরা কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন তাঁরা অনেক বিষয়ে কথা বললেন একই সুরে।

জওহর ও সুভাষ দু'জনেই ভবিষ্যৎ ভারতকে সমাজতান্ত্রিক পথে পুনর্গঠনের সংকল্প ঘোষণায় অকুণ্ঠ। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখাতে চেয়েছেন, সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে জওহর ছিলেন বেশি আগ্রহী কারণ তিনি চেয়েছিলেন জাতীয় আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন একই সঙ্গে চলুক। আর সুভাষ জাতীয় আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র আমাদের লক্ষ্য হলেও সে-কথা পরে ভাবা যাবে।

হরিপুরা ভাষণ ও অন্যত্র এই ধরনের কথা বললেও সুভাষ সমাজতান্ত্রিক প্রচার চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব অস্বীকার করেন নি কখনোই। (সোস্যালিজ্‌ম ইজ নট অ্যান ইমিডিয়েট প্রোবলেম ফর আস—নেভার দা লেস সোস্যালিস্ট প্রোপাগাণ্ডা ইজ নেসেসারি টু প্রিপেয়ার দা কান্ট্রি ফর সোস্যালিজম হোয়েন পোলিটিক্যাল ফ্রিডম হ্যাজ বিন ওয়ান।—হরিপুরা ভাষণ।)

জওহরও প্রায় ঐ একই সময়ে বলেন: আমি মনে করি ভারত ও সারা পৃথিবীকে সমাজবাদের দিকেই অগ্রসর হতে হবে।...তবে ভারত এখনও এই আদর্শ গ্রহণ করে নি। আমাদের আশু লক্ষ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রশ্নটাকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না, কারণ তা হলে সমাজবাদও আসবে না, স্বাধীনতাও মিলবে না। (ফ্রম লখনউ টু ত্রিপুরী—ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৩৯।)

কিন্তু একথা বললেও পর পর দুই কংগ্রেস সভাপতিই যে ভাবে সমাজবাদী পুনর্গঠনের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, নিজেরা সক্রিয়ভাবে যোগ না দিলেও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের, তাতে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর উদ্বেগ দেখা দেওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না।

জওহর ও সুভাষ দু'জনেই চাইছিলেন শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলি আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হোক কংগ্রেসের সঙ্গে, ব্যাপকতম ভিত্তিতে গড়ে

উঠুক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্ট। কিন্তু কংগ্রেসের ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী এই উদ্যোগে ভীত হয়ে পড়েন, কারণ এর ফলে সংগঠনের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা।

হরিপুরা ভাষণে সুভাষকে আমরা বলতে শুনি: কংগ্রেসের মধ্যে আমার মতো অনেকে আছেন যাঁরা চান দেশীয় রাজ্যের মানুষের আন্দোলনে কংগ্রেস আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হোক। আমি ব্যক্তিগতভাবে আশা করি অদূর ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এক ধাপ এগিয়ে যাবে এবং দেশীয় রাজ্যে আমাদের সহকর্মীদের সংগ্রামে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে।

জওহরও অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। প্রায় এই সময়েই আমরা তাকে দেখি স্টেটস্ পিপলস্ কনফারেন্সের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে। কিন্তু জওহর যখন কংগ্রেস সভাপতি তখন মহীশূরে প্রজা নির্যাতনের নিন্দা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে তাঁকে কী ভাবে গান্ধীজির রোষের মুখে পড়তে হয় তা আমরা দেখেছি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকেই বরাবরের মতো সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন তিনি।

কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সঙ্গে উঠতে-বসতে যে তাঁর মোটেই ভালো লাগছে না, নিজের চিন্তা আদর্শ অনুযায়ী কংগ্রেসকে চালাতে পারছেন না বলে যে তিনি ফুঁসছেন, এ-কথা জওহরের আচরণে মোটেই অস্পষ্ট নয়। আদর্শগত দিক দিয়ে তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্রমুখের চেয়ে সুভাষের অনেক কাছাকাছি কোন কোন প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্ত্বেও।

তবু জওহরকে আমরা সুভাষের পাশে দ্বিধাহীনভাবে দাঁড়াতে দেখি না, কংগ্রেসের সংকটের সঙ্গে আদর্শগত সংগ্রামের কোন যোগ আছে তা স্বীকার করতে দেখি না।

একটা কারণ, কংগ্রেসের মধ্যে কোনও ভাঙনের পক্ষপাতী নন জওহর। আরও বড় কারণ, মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে তাঁর মনোভাব।

বাইশ

এই বার তুমি আমাকে মুস্কিলে ফেললে, দিলীপ। কারণ ওকে আমার প্রায়ই মনে হয় স্ফিংসের মতো রহস্যময়।

কলকাতায় এক দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল সুভাষের। আলোচ্য—জওহরলাল নেহরু। সেই প্রসঙ্গেই ঐ মন্তব্য সুভাষের।

কথায় কথায় দিলীপ বলেছিলেন, জওহরলাল এক মনোহর ব্যক্তিত্ব। হঠাৎ এই কথা তোলার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল—জওহরলাল সম্পর্কে সুভাষের মতটা জেনে নেওয়া। আবার একটু ভয়ও পাচ্ছিলেন দিলীপ। সুভাষ আবার কী বলে বসেন। কারণ জওহরকে সত্যি-সত্যিই পছন্দ করতেন দিলীপ।

সুভাষ কিন্তু সত্যি-সত্যিই সেই দুপুরে কথা বলেছিলেন অকপটে (তার কিছু আভাস প্রথম অধ্যায়েই পেয়েছি আমরা)। ধর্ম প্রসঙ্গে জওহরের মতের কথা আবার উঠল। সুভাষ বললেন, ধর্ম সম্পর্কে জওহরের মতকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই, কারণ ঐ ব্যাপারে ওর কোন এক্তিয়ার নেই, ঐ ব্যাপারটা জওহর অন্তর দিয়ে অনুভব করেন নি।

এর আগেও এক দিন এই প্রসঙ্গে দিলীপ সুভাষ কথা হয়েছিল। আত্মজীবনীতে জওহর যে লিখেছেন, পশ্চিমের দেশে অথবা ভারতে—কোথাওই ঠিক তিনি মানিয়ে নিতে পারেন না, উঠেছিল সেই কথাও। সুভাষ বলেছিলেন, জওহর যে নিজেকে ভারতে পরবাসী বলে মনে করে তার কারণ অনেক আগে থেকেই তার অবচেতন প্রভাবিত হয়েছে ইউরোপের জড়বাদ এবং রাশিয়ার ঈশ্বরহীন কম্যুনিজমের দ্বারা।

তারপর সুভাষ বলেছিলেন, আমি সব দেশকেই ভালোবাসতে

পারি, সব সংস্কৃতিরই যা কিছু ভালো তার তারিফ করতে পারি, কিন্তু আমি শান্তি পাই স্বস্তি পাই শুধু ভারতেই। তাই জওহরলাল বিদেশ থেকে নির্দেশ নিতে পারে, আমি পশ্চিম থেকে আমদানি করা কোন জীবনদর্শন অনুসরণ করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, রুশ ডিক্টেটরদের বড় বড় কথা দিয়ে ভারতের দুর্বল ও পঙ্গু মানুষদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ করে তোলার তো কথাই ওঠে না।

জওহর আর সুভাষের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এই কথোপকথনের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৩৯ সালের সেই দুপুরে দুই বন্ধুর সংলাপ থেকে দুই নায়কের রাজনৈতিক পার্থক্য বুঝতে আমাদের আরও বেশি সুবিধে হয়। ব্যক্তি জওহর সম্পর্কেও সুভাষের মত আমরা জানতে পারি।

ধর্ম বিষয়ে জওহরের কথা বলার এক্তিয়ার সুভাষ মানতে না চাইলেও তিনি এ-কথা স্বীকার করেন যে, রাজনীতি, সমাজ সংগঠন, নীতিবোধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, আনুগত্য—ইত্যাকার নানা বিষয়ে জওহর যখনই যা বলেন তা শোনার মতো। তা ছাড়া তিনি চমৎকার লোক (চার্মিং ম্যান)। তবে শুধু ব্যক্তিগত আকর্ষণ দিয়ে তো জনগণের নেতা হওয়া যায় না। অবশ্যই জওহরের আরও অনেক গুণ আছে। তবে ভাগ্যদেবীর আশীর্বাদও তিনি অনেক পেয়েছেন।

এই কথা শুনে দিলীপকুমার প্রকাশ করেছিলেন বিস্ময়। তখন সুভাষ বললেন: তা না হলে জওহরের এই জনপ্রিয়তার ব্যাখ্যা কী? ও তো আছে সকলের সঙ্গেই। ও সত্যিই একজন সৎ মানুষ, তা না হলে বলতে পারতাম ও হল বরের ঘরের মাসি কনের ঘরের পিসি। কৃষকরা ওকে মনে ভাবে তাদের মুখপাত্র, শ্রমিকরা ওকে ভাবে তাদের নেতা, কম্যুনিস্টরা ওর পৃষ্ঠপোষকতা করে পুঁজিবাদীরা তোষামোদ করে কল-কারখানার মালিকেরা কুমারী মেয়ের মতো ওর কাছে ছুটে যায়। ওদের মনেও থাকে না যে গান্ধীজির যোগ্য উত্তরসূরী হওয়ার জন্য এবং দরিদ্রনারায়ণের (কথাটা অবশ্য ওর পছন্দ নয়) বন্ধু হওয়ার জন্য জওহর অন্তরের সায় না থাকলেও চরকার

সুতো কেটে চলেছে। ও আসলে বহুরূপী ছাড়া কিছুই নয়। একবার আমি ওকে খোলাখুলি বলেছিলাম ও সত্যিকার কী তা বলুক। ও বলেছিল, মেজাজের দিক থেকে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, কিন্তু বুদ্ধির দিক দিয়ে সমাজবাদী। এমন কথা কখনও শুনেছ?

খুবই স্পষ্ট ভাষণ। কিন্তু জওহরলালের আচরণ সম্পর্কে সুভাষের প্রকৃত আপত্তির কথা আমরা জানতে পারি আরও একটু পরে। সুভাষ জানান, জওহর যে নিজের মত বিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত অটল থাকতে পারেন না, 'গান্ধীজি অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড' যেভাবে তাঁকে চালিত করেন সেইভাবেই চলেন, আপত্তি এখানেই। যদি কেউ শিল্পী হয় তবে সে দোটানায় থাকতে পারে। কিন্তু যদি কেউ রাষ্ট্রনেতা হতে চায়, প্রশাসক হতে চায়, পরিচিত হতে চায় সারা বিশ্বে, তার মেরুদণ্ড না থাকলে চলে না। যে কর্মোদ্যোগী হবে তাকে একটা কিছু বেছে নিতেই হবে।

গান্ধীজির প্রতি এই যুক্তিহীন আনুগত্যের কথা উঠতে দিলীপ বললেন, সুভাষ, জওহর গান্ধীজিকে ভালোবাসে, তুমি বাসো না। ভালোবাসা যার নেই সে এই ভালোবাসার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না।

সুভাষ এই যুক্তিও মানতে পারেন নি। বলেছিলেন: ব্যক্তিগতভাবে এই নিয়ে জওহরের সঙ্গে তাঁর কোন বিবাদ নেই। কিন্তু এই ব্যক্তিগত আনুগত্য ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে সঙ্কুচিত করে ফেলা মোটেই ঠিক নয়, বিশেষত রাজনীতিতে ব্যাপারটা বড় ছোঁয়াচে।

খুবই সরাসরি অভিযোগ। আমরা মানবেন্দ্রনাথ রায়কেও দেখেছি একই ধরনের অভিযোগ করতে: জওহরের মন তাঁর হৃদয়ের কাছে ক্রীতদাস হয়ে আছে। জনপ্রিয় হয়ে ওঠার জন্য গান্ধীজির মানস সন্তান হিসেবে ভারতের জাতীয়তাবাদের নায়ক হয়ে ওঠার জন্য তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে দাবিয়ে রেখেছেন নিজের ব্যক্তিত্বকে।

গান্ধীজির সঙ্গে জওহরের সম্পর্কের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা

যাবে এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। জওহরের আত্মজীবনীর পাতায় পাতায়, দু'জনের চিঠিপত্রের ছত্রেছত্রে ছড়িয়ে আছে এর প্রমাণ। আমরা আগেই এর অনেক উদাহরণ দেখেছি। অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার, গান্ধী-আরউইন চুক্তি ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক বিষয়ে যেমন, নানা সামাজিক বিষয়েও মহাত্মার সঙ্গে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য গোপন করার চেষ্টা করেন নি জওহর। তবু গান্ধীজির চূড়ান্ত বিরোধিতা করতে পারেন নি তিনি।

গান্ধীজি যে প্রায়ই রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলতেন তা জওহর কোন দিনই পছন্দ করেন নি। আপত্তি তুলেছেন সেই ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই। গান্ধীজির কিছু কিছু কথা খুবই কানে বাজত তাঁর। যেমন, বারবার 'রাম রাজ্যের' কথা বলা। কিন্তু প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থাকলেও করতে পারতেন না। মনকে বোঝাতেন, গান্ধীজি এই ধরনের কথা বলেন কারণ জনসাধারণ এই ধরনের কথাই ভালো বোঝে। সাধারণ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর।

১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর। জওহর তখন জেলে। হঠাৎ খবর পেলেন, ইংরেজ সরকার জাতপাত আর সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে যে নির্বাচনী ব্যবস্থা করছেন তার প্রতিবাদে আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গান্ধীজি। ব্যক্তিগতভাবে জওহর তো মহাত্মার জন্য উদ্বিগ্ন হলেনই। সত্যিই যদি মহাত্মা আমরণ অনশন করেন, সত্যিই যদি তিনি শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন দেন তবে কী হবে! গান্ধীজিকে কি তিনি আর দেখতে পাবেন না?

কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্নে আমরণ অনশনের সিদ্ধান্তকে তিনি মেনে নিতে পারলেন না। চরম আত্মত্যাগের জন্য গান্ধীজি যে প্রশ্নটাকে বেছে নিয়েছেন তা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক সেই সময়ে নিশ্চয়ই সেটি মূল প্রশ্ন নয়। গান্ধীজির অনশনে দেশ জুড়ে অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল, নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রশ্নে সরকার একটা সমঝোতায়

আসতেও বাধ্য হয়েছিলেন, তবু জওহর মনে করেছিলেন এর দ্বারা মূল-আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষতিই হয়েছিল।

আবার পরের বছর মে মাসে একুশ দিন অনশন করলেন গান্ধীজি। এবারও জওহরের মনে দেখা দিল একই ধরনের ভাবনা। গান্ধীজির কর্মপদ্ধতিতে তাঁর ঘোর আপত্তি। কোন রকমে নিজেকে দমন করেন তিনি। আঘাত করতে চান না গান্ধীজিকে। এবারও মহাত্মার অনশনে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা দেশ।

কিন্তু জওহরের মনে হয়ঃ এটাই কি রাজনীতিতে সঠিক পথ? এ তো সেই সনাতনী মনোভাবকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা, এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বচ্ছ চিন্তাধারার সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই নেই। গোটা ভারত শ্রদ্ধায় অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে মহাত্মার দিকে। আশা করছে গান্ধীজি একটার পর একটা অবাক কাণ্ড করে যাবেন, দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর হয়ে যাবে, এসে যাবে স্বাধীনতা, আর কাউকে কিছু করতে হবে না।

জওহর লিখছেনঃ আমার মনে হল তাঁর (গান্ধীজির) সঙ্গে আমার আবেগজনিত বন্ধন যতই দৃঢ় হোক না কেন, মনের দিক থেকে আমি তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। রাজনৈতিক কার্যকলাপে তিনি প্রায়ই চালিত হয়েছেন নির্ভুল সহজাত প্রেরণার দ্বারা। কর্মোদ্যোগেও তিনি পারঙ্গম। কিন্তু দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে বিশ্বাসের পথই কি যথার্থ? কিছু দিনের জন্য তাতে লাভ হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে?

আত্মজীবনীতেই আবার লেখেনঃ রাজনীতির প্রশ্নে তাঁর ধর্মীয় ও আবেগচালিত মনোভাবে এবং বারবার ঈশ্বরের কথা বলায় আমি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছি। মনে হয় তিনি বলতে চান, ঈশ্বর যেন তাঁর অনশনের দিনটিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ কী ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করছেন।

সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রশ্নে তো বটেই, আরও কত বিষয়েই না গান্ধীজির সঙ্গে জওহরের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ। কংগ্রেস সদস্যপদের-

মানদণ্ড হিসেবে যখন গান্ধীজি চরকা কাটা আবশ্যিক করার কথা বলেন তখন তাঁর মন বিদ্রোহ করে ওঠে। ১৯৩৪ সালে বিহারে ভূমিকম্পের পর গান্ধীজির মন্তব্যে (জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে এ হল ঈশ্বরের রোষ) তিনি সায় দিতে পারেন না মোটেই, কারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতায় এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কিছুই হতে পারে না। বরং গান্ধীজির উক্তির প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ যা বলেন তাকেই সমর্থন করেন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে জমিদারি ব্যবস্থার গুণগান করেন গান্ধীজি। অবাক হয়ে যান জওহর। জগৎজুড়ে যে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধিকার উঠেছে তার তারিফ করছেন মহাত্মা। বলছেন, গরিবদের হয়ে জাতীয় ধনসম্পত্তির অছি হয়ে থাকবে ধনীরা। জওহর লেখেন : আমার আবার মনে হল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমার কত না তফাৎ। ভাবতে লাগলাম, আমি তাঁর সঙ্গে কত দূর পর্যন্ত সহযোগিতা করতে পারি।

আমরা দেখি দু'জনের সম্পর্কে আরও সংকট দেখা দেয় যখন ১৯৩৪ সালে চূড়ান্তভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন গান্ধীজি। জওহর তখন আলিপুর জেলে। খবরের কাগজে মহাত্মার বিবৃতি পড়ে অবাক হয়ে গেলেন জওহর। তাঁর কোন এক শিষ্য সত্যাগ্রহের নিয়মকানুন ঠিক ঠিক মানে নি, তার পরিণামেই গান্ধীজি প্রত্যাহার করে নিলেন এই আন্দোলন।

জওহরের মনে প্রশ্ন জাগল : শুধু একটি লোক কোন একটা ভুল করেছে বলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে? সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নিয়ে তিনি ঠিক করেছেন, কিন্তু তার জন্য কী যুক্তি দেখালেন তিনি! এটা তো মানুষের বুদ্ধির অবমাননা, জাতীয় আন্দোলনের নেতার পক্ষে এক অবাক কাণ্ড!

জওহর আরও ভাবলেন : গান্ধীজির আশ্রমের শিষ্যরা অনেক শপথ নিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস তো তা নেই নি। জওহর

নিজেও তো তা নেন নি। তা হলে কেন এই সব দার্শনিক কারণে তাঁদের নিয়ে এই ধরনের খেলা? এই ভিত্তিতে কি কোন জাতীয় আন্দোলন চলে?

এই সব প্রশ্ন কুরে কুরে খেতে থাকে জওহরের মনকে আলিপুর জেলের নিঃসঙ্গতায়। কংগ্রেস কর্মীদের জন্য যে কর্মসূচী গান্ধীজি নির্দিষ্ট করে দেন তাতে আরও বিমূঢ় বোধ করেন তিনি। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে মেনে নাও, সুতো কাটো, খদ্দরের প্রচার করো, অস্পৃশ্যতা দূর করো, মাদক বর্জনের প্রচার চালাও ইত্যাদি।

আত্মজীবনীতে জওহর লেখেন: এই রাজনৈতিক কর্মসূচী আমাদের অনুসরণ করতে হবে। মনে হল, তাঁর আর আমার মধ্যে গড়ে উঠেছে বিরাট এক দূরত্ব। গভীর বেদনায় আমি অনুভব করলাম এত বছর ধরে যে আনুগত্যের বন্ধনে আমি তাঁর সঙ্গে বাঁধা ছিলাম তা যেন ছিঁড়ে গেল।

দীর্ঘ দিন ধরেই গান্ধীজির সঙ্গে মেজাজের ফারাকের কথা তিনি অনুভব করেছেন। গান্ধীজিও বলেছেন সে-কথা। আর তফাৎ তো শুধু মেজাজ-মর্জির নয়, আরও গভীরে। তবু বৃহত্তর স্বার্থে, জাতীয় আন্দোলনের স্বার্থে নিজের বিচার-বিবেচনা বিশ্বাসকে চাপা দিয়ে জওহর চেষ্টা করেছেন গান্ধীজি ও অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে। আপস করেছেন। মনে হয়েছে, আপস করে ভুলই করেছেন। নিজের বিশ্বাসকে ত্যাগ করা উচিত হয় নি। তবু মতাদর্শের সংঘাতের মধ্যেও সহকর্মীদের প্রতি আনুগত্যকেই আঁকড়ে থেকেছেন।

সেদিন আলিপুর জেলের সেলে জওহরের যেন বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হল নিজেকে।

*

স্ববিরোধিতার এক অসাধারণ উদাহরণ গান্ধীজি।

এই রায় তাঁরই প্রিয় শিষ্য জওহরলালের। উদাহরণ হিসেবে জওহর বলেন: নিচের তলার মানুষের জন্য তাঁর এত ভালোবাসা,

অথচ তিনি এমন একটা সমাজ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন যাতে এই সব মানুষই পিষ্ট হয়। তিনি অহিংসার পূজারী, অথচ তিনি এমন এক রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর পক্ষপাতী যার মূলে রয়েছে হিংসা।

কিন্তু মহাত্মা সম্পর্কে জওহরের মনোভাবেও কি মেলে না স্ববিরোধিতার অসাধারণ উদাহরণ? তিনি নিজেও যে সব মতপার্থক্যের কথা বলেন তার পরেও গান্ধীজিকে ছেড়ে ভিন্ন পথে যাওয়ার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। গান্ধীজির অহিংসার নীতিকে তিনি যতটা নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করেন কৌশল হিসেবে। গান্ধীজি বেশি জোর দেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের চেয়ে লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতির উপর। জওহর তা পুরোপুরি মানতে পারেন না। বলেন: লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতির উপর জোর দিয়ে গান্ধীজি একটা বড় কাজ করেছেন। তবু আমি মনে করি, লক্ষ্যের উপরই শেষ পর্যন্ত জোর দিতে হবে।

দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য সত্ত্বেও জওহর যে গান্ধীজির বিরুদ্ধে যেতে পারেন নি, তার একটা কারণ একান্ত ব্যক্তিগত। তার আভাস আমরা আগেই দিয়েছি। ১৯১৯ সালে মোতিলালের সঙ্গে গান্ধীজির পরিচয়ের পর শুধু জওহরের সঙ্গে নয়, গোটা নেহরু পরিবারের সঙ্গে একটা বন্ধন গড়ে উঠেছিল গান্ধীজির। এই বন্ধন ছিল রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে, যদিও রাজনীতিকে তা একেবারে প্রভাবিত করেনি এ-কথা বলা যাবে না।

গান্ধীজি নিজেও এ-কথা জানতেন। তাই আগাথা হ্যারিসনকে ওয়ার্ধা থেকে একটি চিঠিতে লেখেন তিনি (৩০ এপ্রিল ১৯৩৬):

জওহর যখন নিজের কর্মপদ্ধতির কথা বলে তখন সে চরমপন্থী, কিন্তু কাজে সে সংযত। আমি যতটা জানি, সে একটা সংঘর্ষ বাধিয়ে তুলবে না। তবে যদি সেই দায়িত্ব তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে সে অবশ্য পিছিয়েও যাবে না। তবে এ ব্যাপারে গোটা কংগ্রেস এক মত নয়। মতপার্থক্য অবশ্যই আছে। আমার

পথ হল সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা। ওর পথ তা নয়। আমার নিজের মনে হয়, জওহর কংগ্রেসের সংখ্যা গরিষ্ঠের মতই মেনে নেবে। তার মেজাজের লোকের পক্ষে এটা খুবই কঠিন। সে সেটা এখনই বুঝতে পারছে। সে যাই করুক, করবে মহত্বের সঙ্গে। জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য যে আরও বেড়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু হৃদয়ের দিক থেকে আমরা আজ যত কাছাকাছি আগে কোন দিনই তা ছিলাম না।

মনে পড়ে আরও বছর ছয়েক বাদে (১৯৪২) গান্ধীজির আর একটি উক্তি :

আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে হলে প্রয়োজন হবে মতপার্থক্যের চেয়ে আরও বেশি কিছু।...যখন থেকে আমরা এক সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেছি তখন থেকেই ঘটেছে আমাদের মতবিরোধ। তবু গত কয়েক বছর ধরেই বলেছি, এখনও বলছি, রাজাজি নয়, জওহরলালই হবে আমার উত্তরাধিকারী। ও বলে, ও আমার ভাষা বোঝে না, আর ও যে-ভাষা বলে তা আমার কাছে দুর্বোধ্য।...(কিন্তু) আমি জানি, আমি যখন থাকব না তখন ও আমার ভাষাতেই কথা বলবে।

তবে গান্ধীজি সম্পর্কে জওহরের মনোভাবকে শুধুই ব্যক্তিগত বন্ধন বা হৃদয়ের সম্পর্ক বলে ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে। গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গি এমন কি তাঁর রাজনৈতিক আচরণ সম্পর্কে তাঁর যতই বিরূপতা থাক, জওহর সব সময়েই উপলব্ধি করেছেন ভারতের জনজীবনে মহাত্মার ভূমিকা অনন্য।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর যখন স্বরাজ্য দল গড়ে ওঠে আইনসভায় যোগ দেওয়ার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পুরোভাগে দেখা যায় মোতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে, তখন অনেকে মন্তব্য করেন (এঁদের মধ্যে ছিলেন সুভাষও) যে তাঁরা গান্ধীজিকে ঠেলে দিয়েছেন পর্দার আড়ালে। জওহর কিন্তু এ-কথা মানতে পারেন নি।

তিনি বলেছেন : এই ধরনের কথা সেই সময়ে তো বটেই, পরেও আরও বহুবার বলা হয়েছে। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক জীবনে

গান্ধীজির আবির্ভাবের পর থেকে তাঁর জনপ্রিয়তায় কখনোই ভাটা পড়ে নি। বরং তা বেড়েছে, এবং আরও বাড়ছে।

জওহরের বারবারই মনে হয়েছে, গান্ধীজি রাজনৈতিক দিক থেকে ভুল করছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, ভারতের মানুষের নাড়ির স্পন্দন তিনি বুঝতে পারেন অভ্রান্তভাবে। সাধারণ মানুষও অভাবিতভাবে সাড়া দেয় তাঁর ডাকে। হয়ত অন্য কোন দেশে গান্ধীজির মতো মানুষকে আজ বেমানান বলে মনে হত, কিন্তু অন্তত ভারতের মানুষ তাঁকে বুঝতে পারে।

এ-কথা তিনি লেখেন ১৯৩৫ সালে কারাগারে বসে। যখন কারাবাসের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে তখন তিনি লেখেন, গান্ধীজিই এখনও ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

কয়েক বছর বাদে ত্রিপুরী সংকটের সময়ও দেখা যায় জওহরের মনোভাবের পরিবর্তন হয় নি। তিনি বলছেন: কংগ্রেসে তাঁর (গান্ধীজির) একাধিপত্য, কিন্তু তার চেয়েও বেশি একাধিপত্য জনগণের উপর। কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত কিনা তাতে কিছু আসে যায় না। আজকের কংগ্রেস তারই হাতে গড়া, তিনি এরই অঙ্গ। তা ছাড়া, আজ দেশে তাঁর যে অবিসম্বাদী ভূমিকা তার সঙ্গে কোন পদের কোন যোগ নেই। যত দিন তিনি জীবিত থাকবেন এবং তার পরেও জনগণের হৃদয়ে তাঁর এই স্থান বজায় থাকবে। যে নীতিই রচিত হোক না কেন তাঁকে উপেক্ষা করা যাবে না। যে-কোন জাতীয় সংগ্রামেই তাঁর সহযোগিতা ও পথনির্দেশ অপরিহার্য। তাঁকে বাদ দিয়ে ভারতের চলবে না। (ফ্রম লখনউ টু ত্রিপুরী ১৯৩৯)।

সুভাষ কি গান্ধীজির এই অপরিহার্য ভূমিকার কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন?

তেইশ

গান্ধীজি এক পুরানো, অকেজো আসবাব।

ভিয়েনার এক হোটেলে বসে এই মন্তব্য করলেন সুভাষ। ১৯৩৩ সালের মে মাস। কিছু দিন আগেই ইউরোপে পৌঁছেছেন সুভাষ। ভিয়েনার হোটেলে রয়েছেন বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে।

আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিতের খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেন দু'জনেই। রচনা করলেন এক কড়া বিবৃতি। খসড়া সুভাষেরই তৈরি। ঐ বিবৃতি রচনার সময়েই গান্ধীজি সম্পর্কে তাঁর ঐ মন্তব্য। অন্তত 'স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট' পত্রিকার প্রতিনিধি আলফ্রেড টাইরনরের বয়ান থেকে সে-কথাই জানা যায়। সেদিন ভিয়েনার হোটেল ড্য ফ্রান্সে হাজির ছিলেন তিনিও।

বিঠলভাই আর সুভাষ যে বিবৃতিটি প্রচার করেছিলেন তাতেও ছিল গান্ধীজি আর গান্ধীপন্থার তীব্র সমালোচনা। তাঁরা বললেন: গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখলেন তার দ্বারা প্রমাণিত হল যে কংগ্রেসের বর্তমান কর্মপদ্ধতি ব্যর্থ। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ—এই হল তাঁদের সুস্পষ্ট অভিমত। তাঁরা চান কংগ্রেসে আমূল পরিবর্তন। চাই নতুন নীতি, চাই নেতৃত্বে বদল।

অন্তত সুভাষের দিক থেকে দেখলে এ-কথা বলতেই হবে যে, গান্ধীজি সম্পর্কে সুভাষের এই মন্তব্য আকস্মিক কোন ক্ষোভের প্রকাশ নয়। এই প্রবাসের সময়েই সুভাষ রচনা করেন 'দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'। এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে মহাত্মা সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়নের পরিচয়।

গান্ধীজির আবির্ভাব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিরাট ঘটনা, এ-কথা স্বীকারে কুণ্ঠিত নন সুভাষ। ১৯২১ সালের

অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই কংগ্রেস যে সত্যিকার রাজনৈতিক সংগঠন হয়ে উঠেছিল, এ-কথাও তিনি মানেন। আর এর জন্য সব কৃতিত্বই তিনি দেন গান্ধীজিকে। কিন্তু গান্ধীজির রাজনৈতিক ভ্রান্তির সমালোচনা করতে তিনি ছাড়েন না, সমালোচনা করেন তাঁর কর্মপদ্ধতিরও।

সুভাষের একটা আপত্তি, কংগ্রেসে গান্ধীজি কার্যত একজন ডিক্টেটর। ১৯২৯ সাল থেকে তিনিই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বাছাই করে আসছেন। তাঁর পুরোপুরি অনুগত না হলে কমিটিতে ঠাঁই মেলে না। ওয়ার্কিং কমিটিতে অনেক যোগ্য লোক আছেন। কিন্তু গান্ধীজি ভুল করতে যাচ্ছেন জেনেও তাঁর মুখের উপর কথা বলার সাহস কারো নেই।

এর একাধিক উদাহরণই দিয়েছেন সুভাষ। যেমন ১৯৩১ সালের গান্ধী-আরউইন চুক্তি। বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজির এই চুক্তিতে আপত্তি থাকলেও কেউ এর বিরোধিতা করতে সাহস পান নি। এমন কি জওহরও নন, যদিও তিনি তখন কংগ্রেস সভাপতি। সুভাষ বলেছেন, মোতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো নেতারা তবু গান্ধীজির সঙ্গে তর্ক করতে পারতেন, কিন্তু তাঁদের অন্তর্ধানের পর কংগ্রেস প্রকৃতই হয়ে দাঁড়ায় 'ওয়ান ম্যান শো'।

গান্ধীজির রাজনৈতিক ভ্রান্তির উদাহরণও তিনি দিয়েছেন একাধিক। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার, আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার, গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান ইত্যাদি। আমরা দেখেছি, জওহরও গান্ধীজির এই সব সিদ্ধান্তে মন থেকে সায় দিতে পারেন নি। আবার দেখি সুভাষও জওহরের মতো স্বীকার করছেন, বারবার 'হিমালয়-সদৃশ ভ্রান্তি' সত্ত্বেও গান্ধীজি জনগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। কারণ তাঁর কীর্তি এতই বিরাট যে মানুষ তাঁর ভ্রান্তিকে ক্ষমার চোখে দেখতে প্রস্তুত।

গান্ধীজির জাদুর কিছু পরিচয় সুভাষও পেয়েছিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পর্কে ক্ষোভ জানাতে সুভাষ গেলেন বোম্বাই।

তাঁর আপত্তির কথা জানালেন। বোম্বাই থেকে দিল্লি যাওয়ার কথা গান্ধীজির। সুভাষও একই ট্রেনে গেলেন। বড়লাটের সঙ্গে চুক্তিতে সুভাষ প্রমুখের যতই আপত্তি থাক, জনসাধারণ এটাকে নিয়েছে মহাত্মার জয় হিসেবে। সারাপথে তাই অভূতপূর্ব সংবর্ধনা পেলেন তিনি। সুভাষের মনে হল, ১৯২১ সালের জনপ্রিয়তাকে ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। এমন সংবর্ধনা কোন নেতা বোধ হয় কখনও পান নি।

কারণে-অকারণে গান্ধীজির অনশনকে জওহরের মতো সুভাষও সমর্থন করেন নি, কিন্তু তিনি লক্ষ করেছেন এই সব অনশন কী ভাবে জাগিয়ে তুলত সারাদেশকে।

তবুও কেন সুভাষ একাধিকবার বলেছেন, রাজনৈতিক শক্তি হিসবে গান্ধীজি ফুরিয়ে গেছেন? সুভাষ লিখছেন: ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে 'বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষকদের' মনে হয়েছিল, যে কোন কারণেই হোক গান্ধীজি তাঁর গতিশীলতা আর উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেছেন। বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলার সুযোগ এসেছিল জওহরলাল নেহরু, মানবেন্দ্রনাথ রায়, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি অথবা কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে। কিন্তু কেউই সে-সুযোগ নিতে পারে নি।

১৯৩৪ সালে বোম্বাই কংগ্রেসে প্রতিনিধি সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হল। সেই প্রসঙ্গ আলোচনার সময় সুভাষ লিখলেন: ১৯২০ সালে মহাত্মা যখন কংগ্রেসের শাসনযন্ত্র দখল করে পুরানো নেতাদের হটিয়ে দিলেন তখন গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ছিল তাঁরই দিকে।...আজ গান্ধীজি গণতান্ত্রিক শক্তিকে ভয় পাচ্ছেন। সত্যিই, মহাত্মা আর সেই গতিশীল শক্তি নেই। বোধ হয়, এটা তাঁর বয়সেরই ফল।

দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল-এ একটি গোটা অধ্যায় সুভাষ নিয়োগ করেছেন 'ভারতের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা' বিশ্লেষণে। প্রায় জওহরের ভাষাতেই তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যার আবেদন জনগণের কাছে অমোঘ। অন্য কোন দেশে জন্ম হলে তিনি হতেন একেবারেই বেমানান।

গান্ধীজির ঐতিহাসিক সাফল্য বিশ্লেষণে সুভাষ অবশ্য শুধু

সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর মানসিক সাযুজ্যের উপর জোর দেন নি। সুভাষ দেখাতে চেয়েছেন, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এক দিকে কংগ্রেসের সাংবিধানিক পথে আন্দোলন এবং অন্য দিকে বিপ্লবী আন্দোলন—দুইই ব্যর্থতার পথে এগিয়েছে, আর তাইই সুযোগ করে দিয়েছে মহাত্মা গান্ধীর মতো নেতার আবির্ভাবের। তিনি নিজেকে চিনতেন, দেশের প্রয়োজনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন, এও বুঝেছিলেন যে ভারতের সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায়ে নেতৃত্বের মুকুট থাকবে তাঁরই শিরে। অকারণ বিনয়ের ভারে পীড়িত হন নি তিনি। দৃঢ়স্বরে কথা বলেছেন। দেশের মানুষ তাঁর কথা মান্য করেছে।

প্রায় জওহরের ভাষাতেই সুভাষ বলেন: আজকের কংগ্রেস প্রধানত তাঁরই হাতে গড়া। কংগ্রেস সংবিধানের রচয়িতাও তিনি। বাক্যবাগীশ একটি সংস্থা থেকে তিনি কংগ্রেসকে পরিণত করেছেন একটি জীবন্ত, সংগ্রামী সংগঠনে।

গান্ধীজি যত দিন জীবিত থাকবেন ততদিন তাঁর জনপ্রিয়তায় যে ভাটা পড়বে না, এ-কথাও সুভাষ মানতেন। কারণ তাঁর জনপ্রিয়তার ভিত্তি তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব নয়, তাঁর চরিত্রশক্তি।

কিন্তু এই মূল্যায়নের পরও সুভাষ প্রশ্ন তোলেন: তবু কেন মহাত্মা ভারতের মুক্তি আনতে ব্যর্থ হয়েছেন?

এই প্রশ্নের উত্তরও দেন সুভাষ: গান্ধীজির অনুগামীর সংখ্যা বিপুল হতে পারে, কিন্তু তারা চরিত্রশক্তিতে প্রবল নয়। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁর নিজের দেশের মানুষের চরিত্র ঠিক মতো বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁর বিপক্ষের চরিত্র ঠিকমতো বুঝতে পারেন নি। মহাত্মা যে যুক্তি দেখান জন বুলের কাছে তার কোন আবেদন নেই। তিনি হাতের সব তাসই দেখিয়ে দেন প্রতিপক্ষকে। কিন্তু রাজনৈতিক লড়াইয়ে কূটনীতিকে বাদ দেওয়া চলে না। গান্ধীজির ব্যর্থতার আরও কারণ হিসেবে সুভাষ বলেন, আন্তর্জাতিক প্রচারের হাতিয়ারকে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছেন মহাত্মা। অহিংসার পথে যদি স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় তবে কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক প্রচার অপরিহার্য।

ভবিষ্যতে কী হতে পারে, তাও বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন সুভাষ। তাঁর মনে হয়েছে, ভবিষ্যতে কংগ্রেসের মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠবে। গান্ধীজির সাফল্যের মূলমন্ত্র, তিনি ধনী-দরিদ্র, পুঁজিপতি-শ্রমিক, জমিদার-চাষী সকলকে একত্রে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই পথেই আসবে তাঁর ব্যর্থতা। কারণ কায়েমি স্বার্থ ক্রমশই রাজনৈতিক সংগ্রামে গরিবদের থেকে দূরে সরে যাবে এবং ইংরেজ সরকারের দিকে ঝুঁকবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রাম চালাতে হবে পাশাপাশি। যে-দল ভারতের হয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতার লড়াই জিতবে সেই দলই সাধারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর দেশকে অভূতপূর্ব সেবা করেছেন, আরও করবেন। কিন্তু ভারতের মুক্তি (স্যালভেশন) তাঁর নেতৃত্বে আসবে না।

এই সুস্পষ্ট রায় সত্ত্বেও আমরা দেখি মহাত্মা সম্পর্কে স্ববিরোধিতা সুভাষও এড়িয়ে যেতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরেই 'বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষকদের' কাছে মনে হয়েছিল যে গান্ধীজি তাঁর গতিশীলতা ও উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ঐ বছরই ফেব্রুয়ারিতে কংগ্রেস সভাপতির ভাষণ তিনি শেষ করেছিলেন গান্ধীজির প্রতি এই ভাষায় শ্রদ্ধা জানিয়েঃ

সারা ভারত আশা করছে, প্রার্থনা করছে মহাত্মা গান্ধী যেন আরও অনেক বছর ধরে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে থাকেন। আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য তাঁকে আমাদের প্রয়োজন। আমাদের সংগ্রাম যাতে তিক্ততা আর ঘৃণা থেকে মুক্ত থাকে সেইজন্য তাঁকে প্রয়োজন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বার্থেই তাঁকে আমাদের প্রয়োজন। সর্বোপরি—তাঁকে আমাদের প্রয়োজন মানব সমাজের স্বার্থে।

ত্রিপুরী ভাষণও সুভাষ শেষ করেন মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ দিয়েই। কংগ্রেস যে-সংকটের মধ্যে পড়েছে মহাত্মা গান্ধীই তা থেকে সংগঠনকে মুক্ত করুন—এই প্রার্থনা জানান সুভাষ।

ত্রিপুরী সংকটকে ঘিরেই এই স্ববিরোধিতা আরও স্পষ্ট হয়। গান্ধীজির অনেক সমালোচনা করেছেন তিনি, নেতৃত্বের বদলও চেয়েছেন, গান্ধীজির বিরোধিতা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন, গান্ধীজিকে বাদ দিয়ে কিছুই হওয়ার নয়। তাই মহাত্মার কাছে আর্জি জানিয়েছেন বারবার, ছুটে গেছেন বারবার তাঁরই কাছে, বলেছেন, আর কিছু নয়, আপনি জাতীয় সংগ্রাম শুরু করে দিন আবার। গান্ধীজির বয়স যতই হয়ে থাকুক, যতই তিনি গতিশীলতা আর উদ্যোগ হারিয়ে ফেলে থাকুন, তিনি এগিয়ে না এলে প্রকৃত জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা যাবে না।

দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে শেষ যে চিঠি লেখেন সুভাষ (১০ জানুয়ারি, ১৯৪১) গান্ধীজিকে সেখানেও গান্ধীজির নেতৃত্বে আন্দোলনের প্রস্তাব আবার দেন তিনি। মহাত্মা অবশ্য শুধু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানই করেন না, জানিয়ে দেন তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ এতই মৌলিক যে একত্রে আন্দোলনের আর প্রশ্নই ওঠে না।

জওহরের সঙ্গেও এমন মৌলিক মতপার্থক্যের কথা আমরা গান্ধীজিকে বলতে শুনেছি। কিন্তু তাতে গুরু-শিষ্যের একত্রে চলার যে বাধা হয় নি তাও আমরা দেখেছি। যতই হোক জওহর শেষ পর্যন্ত 'তাঁরই ভাষায় কথা বলবে' এই আস্থা গান্ধীজির ছিল। সুভাষ সম্পর্কে তাঁর সেই আস্থা ছিল না।

বরং মহাত্মা শেষ যে চিঠি লিখেন সুভাষকে (ওয়ার্ধা থেকে ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪০) তাঁর একটি বাক্য আমাদের আজও বিমূঢ় করে, ঠিক যেমন সেদিন করেছিল সুভাষকে। গান্ধীজি লিখেছিলেন : যত দিন না আমাদের মধ্যে একজন অন্যজনের মত মেনে নিচ্ছি তত দিন আমাদের ভিন্ন নৌকায় পাড়ি দিতে হবে, যদিও আমাদের লক্ষ্য মনে হতে পারে—শুধু মনেই হতে পারে—অভিন্ন।

সুভাষ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন : আপনি এ-কথা লিখলেন কেন? এর অর্থ কি এই যে আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অভিন্ন নয়?

তা কী করে হতে পারে? আপনি ঠিক কী বোঝাতে চান অনুগ্রহ করে আমাকে জানান।

সুভাষের এই শেষ প্রশ্নের উত্তর গান্ধীজি আর দেন নি।

*

ত্রিপুরী পর্বের উপসংহারে এই জিজ্ঞাসা কিছুতেই পরিহার করা যাবে না যে, সুভাষ যখন 'গান্ধীজি অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেডের' বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস সভাপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ থেকে সরে আসেন নি, তখন তিনি এই চ্যালেঞ্জকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন না কেন? কেন তিনি নিজেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে কংগ্রেসের শাসনযন্ত্র দখল করলেন না?

সুভাষ-অনুরাগী হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখছেন: পন্থ-প্রস্তাব যদি অগণতান্ত্রিক হয়ে থাকে তবে গান্ধীজি তো সুভাষকে তা দিয়ে বেঁধে রাখেন নি, তাঁর ঘাড়ে কোন ক্যাবিনেটও (ওয়ার্কিং কমিটি) চাপিয়ে দেন নি। তখন সুভাষের সামনে একটি পথই খোলা ছিল— সাহস করে নিজেই কমিটি গঠন করা এবং এ আই সি সি-তে তা পেশ করে অনুমোদনের আবেদন করা। যদি এ আই সি সি তাঁর আবেদনে সাড়া দিত তবে সবচেয়ে ভালো হত ঐ কমিটির সাহায্যে কাজ শুরু করে দেওয়া এবং দায়িত্ব বহন করা। আর যদি এ আই সি সি অনুমোদন না দিত তখন তিনি ইস্তফা দিতে পারতেন এবং যত দিন গোটা কংগ্রেস তাঁর মত মেনে না নিচ্ছে তত দিন পুরানো নেতাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু এ আই সি সি-র কাছে আবেদন পেশ করার আগেই ইস্তফা দেওয়া পরাজিতের মনোভাবের আভাস দেয়।

কেউ কেউ বলেছেন, সুভাষ তাঁর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারতেন। ১৯২২ সালে দেশবন্ধুও ইস্তফা দিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি পদে, গড়েছিলেন স্বরাজ্য দল এবং শেষ পর্যন্ত গোটা কংগ্রেসকেই নিয়ে এসেছিলেন তাঁর নিজের পথে।

ত্রিপুরী ভাষণেও আমরা দেখি সুভাষ নিজে কংগ্রেসের তৎকালীন

সংকটকে তুলনা করছেন ১৯২২ সালের সংকটের সঙ্গে। কিন্তু গয়া আর ত্রিপুরী পর্বের উপসংহার যে অভিন্ন হয়নি তার কারণ একাধিক।

তিরিশের দশকের শেষ লগ্নে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে গান্ধীজির ভূমিকার মূল্যায়ন সুভাষ ঠিকমতো করতে পারেন নি। যখন মহাত্মার অপরিহার্য ভূমিকা তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

এককভাবে কংগ্রেস চালানোর দায়িত্ব নেওয়ার কথা তিনিও ভেবেছিলেন। কিন্তু পাশে পান নি কোন সর্বভারতীয় নেতাকে, যেমন চিত্তরঞ্জন পেয়েছিলেন মোতিলালকে। জওহরকে পাশে পাওয়ার আশা শেষ পর্যন্ত ফলবতী হয় নি।

কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণও ছিল।

১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে সুভাষের জয় প্রায় সর্বত্রই চিহ্নিত হয়েছিল বাম শক্তির জয় হিসেবে। অনেকে হরিপুরাতে কংগ্রেস সভাপতির আসনে সুভাষের আবির্ভাবকেই বাম শক্তির সংহতি ও অভ্যুদয় বলে গণ্য করেছেন। সেই সংহতি ও অভ্যুদয় কতটা সত্যিই ঘটেছিল তার পূর্ণাঙ্গ বিচারে না-গিয়েও এ-কথা অন্তত বলা যায় যে ত্রিপুরীতে বাম শক্তির অনৈক্য খুবই প্রকট হয়ে পড়েছিল। গান্ধীজি ও তাঁর দক্ষিণপন্থী অনুগামী বলে যাঁরা পরিচিত ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে দাঁড়াবার কোন লক্ষণ দেখা দেয় নি। তা দেখা দিলে ইতিহাস হয়ত অন্য দিকে মোড় নিতে পারত।

পট্টভির পরাজয়ের পর সুভাষের সামনে ছিল একটিমাত্র কর্তব্য। তাঁর ঐতিহাসিক জয়ে যে-সব শক্তি সাহায্য করেছে সেগুলিকে সংহত করা। সেই উদ্যোগ তিনি বিশেষ নেন নি। তাঁর শারীরিক অসুস্থতা এর একটা বড় কারণ অবশ্যই।

কিন্তু হরিপুরা কংগ্রেসের পর থেকেই বাম শক্তিকে সংহত করার উদ্যোগ যে তেমন ফলপ্রসূ হয়নি তা আমরা সুভাষের নিজের জবানিতেই জানতে পারি (ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়,

১২ আগস্ট, ১৯৩৯)।

এই নিবন্ধে সুভাষ ব্যাখ্যা করেছেন কংগ্রেসের মধ্যে বাম শক্তির অভ্যুদয়ের পটভূমি। আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার এবং সংসদীয় কর্মসূচী গ্রহণের পর কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দেয় 'বামপন্থী বিদ্রোহ'। জন্ম হয় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির (সি এস পি)। অল্প দিনের মধ্যেই সি এস পি হয়ে ওঠে কংগ্রেসের মধ্যে নানা বাম শক্তির মিলনভূমি।

সুভাষ এই কথা বললেও এবং সি এস পি-র প্রতি তাঁর নৈতিক সমর্থন সত্ত্বেও সুভাষ কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও এই গোষ্ঠীতে যোগ দেন নি। জওহরের ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা। জওহরকে অনেকে বর্ণনা করেছেন সি এস পি-র 'গডফাদার' হিসেবে, কিন্তু তিনিও সরকারিভাবে এই গোষ্ঠীতে থাকেন নি।

সুভাষ বলেছেন, ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে সি এস পি-র রীতিমতো অগ্রগতি ঘটলেও ১৯৩৮ সালে দেখা গেল এই গোষ্ঠী আর তেমন এগোতে পারছে না। সুভাষ চাইছিলেন, কংগ্রেসের মধ্যে সি এস পি নিছক সমাজতান্ত্রিক ভূমিকা পালন না করে যদি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বাম পথ নেয় তা হলেই তার অগ্রগতি ঘটবে বেশি।

সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গেও এই নিয়ে আলোচনা হয় সুভাষের। সকলেই একমত হন যে, কংগ্রেসের মধ্যে যে-সব প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অংশ রয়েছে তারা যদি সোস্যালিস্ট বা কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে রাজি না-থাকেন তবে অন্তত একটা ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংগঠিত হতে পারেন। সুভাষ লিখছেন: আমার মনে হয়েছিল, একমাত্র এই পথেই দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে এবং একটি প্রকৃত মার্কস্‌বাদী দলের বিকাশের জমি তৈরি করা যেতে পারে।

কিন্তু এক দিকে যেমন কংগ্রেসের মধ্যে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি সি এস পি-র মঞ্চে মিলিত হতে পারে নি, তেমনই হরিপুরা কংগ্রেসের পর ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে বাম গোষ্ঠীর বিকাশও ঘটে নি।

তবু পট্টভির বিরুদ্ধে সুভাষের জয়ের পিছনে বাম শক্তির দান কিছু কম ছিল না। সুভাষকেই পুনর্নির্বাচিত করা হোক—এই দাবি যে সব মহল থেকে প্রথম তোলা হয় কম্যুনিস্টদের মুখপত্র 'ন্যাশনাল ফ্রণ্ট' ছিল তাদের অন্যতম। নির্বাচনে তিনি কম্যুনিস্টদের সমর্থন তো পেয়েছিলেনই, সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন সি এস পি এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের গোষ্ঠীর সমর্থনও।

কিন্তু ত্রিপুরীতে গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাবের বিরুদ্ধতার ব্যাপারেই স্পষ্ট হয়ে উঠল বাম শক্তির অনৈক্য। সি এস পি-র নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ পিছিয়ে গেলেন, ভোটদানে বিরত রইলেন তিনি। অধিকাংশ সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্টই তাই করলেন। কম্যুনিস্টদের সমর্থন ত্রিপুরীতেও সুভাষ পেয়েছিলেন সোমনাথ লাহিড়ির এই দাবির প্রমাণ নেই। ত্রিপুরীর পর কম্যুনিস্টরা ঘোষণা করেন যে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব নয়, গান্ধীর নির্দেশে ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব। কম্যুনিস্ট নেতা পি সি যোশী বলেন, এখন সবচেয়ে বড় শ্রেণী সংগ্রাম হল আমাদের জাতীয় সংগ্রাম, কংগ্রেস সেই সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার, তার ঐক্য বজায় রাখাই হল প্রথম কাজ। সি এস পির মতও ছিল এই।

জয়প্রকাশ নারায়ণকে অবশ্যই পরে আমরা দেখি (১৯৪০ সালে) অনুশোচনায় ভরা চিঠি লিখছেন সুভাষকে, তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিচ্ছেন, নতুন বামপন্থী দল গঠনে চাইছেন তাঁর নেতৃত্ব (নেতাজি রিসার্চ বুরোয় রক্ষিত জে পি-র অস্বাক্ষরিত চিঠি—দ্রষ্টব্য: ক্রসরোডস্।) সুভাষ এই চিঠির কোন জবাব দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। তখন হয়ত বড় দেরি হয়ে গেছে। দেশ ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন সুভাষ।

কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সুভাষের সম্পর্ক ছিল কিছুটা বিচিত্র ধরনের। সোভিয়েত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন কোন দিকের প্রতি তাঁর সমর্থন থাকলেও তিনি মার্কস্‌বাদ বা কম্যুনিজমকে পুরোপুরি

স্বাগত জানাতে পারেন নি। সেই তুলনায় কম্যুনিজম সম্পর্কে জওহরের দ্বিধা ছিল অনেক কম। তা ছাড়া, সুভাষের ধারণা ছিল, কম্যুনিস্টদের আনুগত্য পুরোপুরি স্বদেশের প্রতি নয়। কম্যুনিজম বনাম ফ্যাসিজম বিতর্ক প্রসঙ্গে জওহরের মন্তব্যের জবাবে তিনি এই রকম আভাসই দিয়েছেন। পরে তাঁর মত যে বদলায় তা আমরা রজনী পালমে দত্তের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণেই (জানুয়ারি, ১৯৩৮) দেখতে পাই।

জওহর বা সুভাষ সম্পর্কে কম্যুনিস্টদের মতও তিরিশের দশকের শেষার্ধে বদলাতে শুরু করে। কিন্তু সুভাষের তুলনায় জওহরই ছিলেন তাঁদের কাছে বেশি 'বাঞ্ছিত' ব্যক্তি। জওহর ও সুভাষ দু'জনেই সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন, কিন্তু কম্যুনিস্টদের মনে হয়েছিল সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুভাষের ধারণা তত্ত্বগত দিক থেকে জওহরের মতো স্বচ্ছ ছিল না। সুভাষ যতটা ছিলেন তাত্ত্বিক, তার চেয়ে বেশি বাস্তববাদী।

সুভাষের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের পুরোপুরি সমঝোতার পথে মনে হয় আরও একটা বাধা ছিল। ফ্যাসিবাদের কোন কোন দিক সম্পর্কে সুভাষের প্রশংসাসূচক উক্তি কম্যুনিস্টদের মনে কিছু সন্দেহ জাগিয়েছিল। তবু হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষের ভাষণকে কম্যুনিস্টরা স্বাগত জানিয়েছিলেন। সুভাষের সমাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের ডাক তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই তাঁরা পট্টভির বিরুদ্ধে নির্বাচনে সুভাষকে সমর্থনও করেছিলেন। কিন্তু সুভাষ সম্পর্কে তাঁদের আস্থা এত গভীর ছিল না যে সে-জন্য তাঁরা ঐ সময়ে কংগ্রেসকে দু'টুকরো করতে রাজি হতে পারতেন।

সব মিলিয়ে এ-কথাই বলতে হবে, তিরিশের দশকের শেষ লগ্নে বাম শক্তি সংহত হতে পারেনি। হয়ত কিছুটা ঝলক দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যই।

॥ চব্বিশ ॥

সুভাষ দেশ ছেড়ে চলে গেলেন ১৯৪১ সালের গোড়ায়। জওহরের সঙ্গে তাঁর আর কোন যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু দুই নায়কের কাহিনীর এইখানেই শেষ হয় না। পরবর্তী নানা ঘটনায় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বাড়ে বৈ কমে না।

সুভাষ যখন অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিলেন তখন দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের এক বছরেরও বেশি পার হয়ে গেছে এবং ব্রিটেন ক্রমশই হয়ে পড়েছে কোণঠাসা। তিনি বরাবরই চেয়েছেন, ব্রিটেনের এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করে তুলতে। কিন্তু এখানেই দেখা দেয় কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বিরোধ।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) ওয়ার্ধায় বসেছিল ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। সুভাষ তখন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত। তবু তিনি বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হলেন। বললেন, তাঁর নিজের মতের কথা: এখনই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে হবে। ১৪ তারিখে যে প্রস্তাব গৃহীত হল তাতে অবশ্য ইংরেজ সরকারকে কোন চরমপত্র দেওয়া হল না, বরং দেওয়া হল যুদ্ধের ব্যাপারে বিশেষ কয়েকটি শর্তাধীনে সহযোগিতার প্রস্তাব।

গান্ধীজি বলে আসছিলেন, ভারতকে স্বাধীনতা দান নিয়ে গুরুতর মতবিরোধ সত্ত্বেও কংগ্রেস যুদ্ধের ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। জওহরও যখন এই ধরনের কথা বললেন তখন সুভাষের কাছে তা আরও বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিল। সুভাষ লিখছেন: ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত কংগ্রেস যত যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তার সব কটিতেই প্রধান ভূমিকা ছিল জওহরের। তাই লোকে আশা করেছিল যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন তিনি যুদ্ধ-বিরোধিতার নীতিতে অগ্রগণ্য ভূমিকাই নেবেন। কিন্তু নেহরু তো সে-নীতি

গ্রহণ করলেনই না, বরং দেখা গেল যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকারকে কংগ্রেস যাতে কিছুতেই বিব্রত না-করে সেই জন্যই তিনি তাঁর যাবতীয় প্রভাব খাটাচ্ছেন (দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল)।

সুভাষ চাইছিলেন, ব্রিটেনের এই বিপদকেই ভারত তার কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করুক। সেই সঙ্গে করুক যুদ্ধের বিরোধিতা। অন্য দিকে জওহরকে আমরা আবার দেখি দোটানার মধ্যে। আদর্শগতভাবে তিনি ছিলেন ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদের বিরোধী। তাই তিনি চাইছিলেন যুদ্ধ প্রয়াসে ইংরেজের সহযোগিতা করতে। কিন্তু পরাধীন একটি দেশ কীভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তথাকথিত স্বাধীনতার সপক্ষে লড়াইয়ে যোগ দিতে পারে? ভারতের স্বাধীনতা যদি স্বীকৃত হয় তবেই ভারত সমান মর্যাদা নিয়ে মিত্রশক্তির পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পারে। জওহর এবং কংগ্রেসের একাংশ তাই ব্রিটেনকে আরও সুযোগ দিতে চাইছিলেন যাতে তার শুভবুদ্ধির উদয় হয়, ভারতের স্বাধীনতার দাবি সে মেনে নেয়।

কিন্তু উইনস্টন চার্চিলের ব্রিটেন সেই দাবি মানতে চায় নি। বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে কংগ্রেসের প্রস্তাব। তাই যুদ্ধের সময়ে আমরা দেখি জওহরকে এক দোটানার মধ্যে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে ওয়ার্কিং কমিটির যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি রচনা করেন স্বয়ং জওহর। এই প্রস্তাবের রচয়িতা সম্পর্কে গান্ধীজির মন্তব্য স্মরণীয়ঃ এই বিবৃতি যিনি রচনা করেছেন তিনি একজন শিল্পী। সাম্রাজ্যবাদের আপসহীন বিরোধিতায় তিনি কারো চেয়ে কম যান না, কিন্তু তিনি ইংরেজ জনগণের সুহৃদ। সত্যি কথা বলতে কি, চিন্তাভাবনায়, মানসিক গড়নে তিনি যতটা না ভারতীয় তার চেয়ে বেশি ইংরেজ। নিজের দেশবাসীর চেয়ে ইংরেজদের সান্নিধ্যেই তিনি আরও স্বস্তি বোধ করেন।

জওহর নিজেই লিখছেনঃ ঐ মুহূর্তে কংগ্রেসের পক্ষে যুদ্ধের প্রয়াসে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব দেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। এই যুদ্ধের সঙ্গে যে-সব আন্তর্জাতিক প্রশ্ন জড়িত ছিল

(অর্থাৎ ফ্যাসিবাদ ইত্যাদি) সে বিষয়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষেরই বিশেষ ধারণা ছিল না। তারা বরং ব্রিটেনের সাম্প্রতিক নীতিতে ক্ষোভই প্রকাশ করছিল।

তবু ইংরেজর সুবুদ্ধির উদয়ের আশায় কংগ্রেস দিয়েছিল সহযোগিতার প্রস্তাব। কিন্তু জওহর নিজেই আক্ষেপ করে লেখেন: তা হবার নয়। আমরা যা কিছু চেয়েছিলাম তার সবই প্রত্যাখ্যান করল ওরা। তা সত্ত্বেও কিন্তু ব্রিটেনের 'শুভবুদ্ধির' উপর কংগ্রেসের ভরসার শেষ হয় না। বিটেনকে 'বিড়ম্বিত' করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যেতে থাকেন জওহর।

১৯৪০ সালের ২০ মে জওহর এক বিবৃতি দিলেন। বললেন: ব্রিটেন যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত তখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ভারতের পক্ষে সম্মানজনক হবে না! সুভাষ এই বিবৃতিকে আখ্যা দিয়েছেন 'বিস্ময়কর'। ডেনমার্ক ও নরওয়ে যখন হিটলারি ফৌজের আক্রমণের শিকার হল, ব্রিটেনের বিপদ আসন্ন হয়ে উঠল, তখন জওহর লক্ষ্য করেছিলেন ভারতে ব্রিটেনের জন্য দেখা দিয়েছিল সহানুভূতি। জওহর যখন বলেন 'কিছু লোক ছিল যারা মনে করত ইংলণ্ডের বিপদই হল ভারতের সুযোগ'—তখন তিনি নিশ্চয়ই প্রধানত সুভাষের কথাই বলতে চান। কংগ্রেস নেতারা অবশ্য তেমন সুযোগ নিতে একেবারেই অনিচ্ছুক। তাঁরা তাই আবার সহযোগিতার প্রস্তাব দেন ইংরেজ সরকারকে। ব্রিটেন ভারতের স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করে নিক, দেশে গঠিত হোক জাতীয় সরকার। তা হলেই যুদ্ধ-প্রয়াসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে কংগ্রেস।

এই প্রস্তাবও (যার প্রধান উদ্যোক্তা চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি) যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হল। জওহর যথারীতি যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই এই প্রস্তাবে মত দিয়েছিলেন। সেটা তেমন কিছু বড় কথা নয়। কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রহণ উপলক্ষে ঘটে গেল আরও অনেক বড় ব্যাপার। গান্ধীজিকে দেখা গেল প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করতে। তিনি বললেন, হিংসাত্মক যুদ্ধ প্রয়াসের সমর্থন তিনি করতে পারেন না।

কিছুতেই। শুধু বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হলেন না তিনি, বললেন, এই প্রস্তাব গ্রহণের পর কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই থাকবে না। কিন্তু ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে তখন কংগ্রেস নেতারা এতই আগ্রহী যে প্রিয় নেতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতেও তাঁরা অরাজি নন। এই মন্তব্য করেছেন স্বয়ং জওহর 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'য়।

কিন্তু ইংরেজ সরকারের মন অত নরম ধাতুতে গড়া নয়। তাদের মন ভেজে না। তাই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে এক ধরনের আন্দোলনের পথেই যেতে হয়। ১৯৪০ সালের শেষে শুরু করতে হয় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ এবং সেখানে আমরা দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী হিসেবে গ্রেপ্তার হতে দেখি জওহরকে। তখনও তাঁর মন থেকে দ্বিধা যায় নি। তবু গান্ধীজির নির্দেশ তিনি মেনে নেন। গান্ধীজিও বুঝতে পারেন তাঁর সংকটের কথা। লেখেন: আমাকে তোমার আনুগত্য দিতে গিয়ে কী মানসিক মন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে তা আমি বুঝি।

সুভাষ বলতে চেয়েছেন (দা ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল) কংগ্রেস যে শেষ পর্যন্ত ছোট আকারে হলেও আন্দোলনের পথে নামল তার জন্য দায়ী ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনের দ্বারা গান্ধীজির বহু অনুগামীও প্রভাবিত হতে শুরু করছিলেন, অনেকে এই আন্দোলনে যোগও দিয়েছিলেন। তাই বাধ্য হয়েই কংগ্রেসকে ব্যাক্তিগত সত্যাগ্রহের ডাক দিতে হয়।

সুভাষপন্থীদের আন্দোলন যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব জিইয়ে রাখতে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছিল। কিন্তু আসলে ব্রিটেনের কাছে আবেদন নিবেদন যখন বারবার প্রত্যাখ্যাত হতে থাকল তখন কংগ্রেসেরও আর কিছু একটা না-করে উপায় ছিল না।

*

গান্ধীজি যাকে জওহরের মানসিক যন্ত্রণা বলেছেন তা বোধ হয় আমরা সবচেয়ে তীব্র হতে দেখি ক্রিপস্ মিশনের ভারত সফরের সময়।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন সিঙ্গাপুর হাতছাড়া হল তখন

ব্রিটেনকেও একটু নড়ে-চড়ে বসতে হল। উদ্ধত উইনস্টন চার্চিলও যেন কিছুটা নরম। মন্ত্রিসভার তরফ থেকে তিনি সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠালেন স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য। ক্রিপস এলেন মার্চ মাসে। অনেক আশা জাগল ভারতবাসীর মনে, কারণ ক্রিপসকে মনে করা হত ভারত-বান্ধব।

কিন্তু ক্রিপস যে প্রস্তাব নিয়ে এলেন দেখা গেল তাতে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন কথা নেই। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই ডোমিনিয়ান স্টেটাসেরই প্রস্তাব। সেই সঙ্গে ভারতকে টুকরো-টুকরো করার অব্যর্থ পরিকল্পনা।

সুভাষ তখন জার্মানিতে। শুরু করেছেন বেতার প্রচার। বার্লিন থেকে তিনি বেতারে ক্রমাগত প্রচার চালাতে লাগলেন ক্রিপস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে আবেদন জানাতে থাকলেন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য। সরাসরি ক্রিপসের উদ্দেশেও তিনি পাঠালেন খোলা চিঠি বেতারেরই মারফৎ।

ক্রিপস ছিলেন জওহরের ব্যক্তিগত বন্ধু। তাঁর মারফৎ এই ধরনের প্রস্তাব এল দেখে জওহর মর্মাহত। তিনি লিখছেন: যতই প্রস্তাব-গুলি পড়ি ততই মন ভেঙে যায়। প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা তো এতে নেইই। কিন্তু জওহর আরও মর্মাহত হলেন ভারতকে শতচ্ছিন্ন করার প্রচ্ছন্ন চক্রান্ত দেখে।

তবু জওহর কিন্তু সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে চাননি ক্রিপস প্রস্তাব। যুদ্ধ চলাকালীন একটা অন্তর্বর্তী সরকার গঠন নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছাবার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যান। ক্রিপসও আশা করেছিলেন, জওহর তাঁর সহকর্মীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে পারবেন। জওহরের প্রতি জানিয়েছিলেন কাতর আবেদন: তোমার নেতৃত্ব প্রমাণের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ (১২ এপ্রিল ১৯৪২ তারিখের চিঠি)। কিন্তু জওহর পারেন নি। কিছুদিন পরে ইভলিন উডকে লেখেন: আমি তাঁকে স্পষ্টই জানিয়ে দিই একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই আমি কংগ্রেসকে নিয়ে যেতে পারি

তার বেশি নয়। কংগ্রেসও দেশের মানুষকে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই নিয়ে যেতে পারে। কংগ্রেস প্রত্যাখ্যানই করল ক্রিপস প্রস্তাব। জার্মানি থেকে মহাত্মা এবং ভারতবাসীকে অভিনন্দন জানালেন সুভাষ।

এই সময়ে জওহরের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিবরণ মেলে মৌলানা আজাদের 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' থেকে। আজাদ লিখছেন (তিনি সেই সময় কংগ্রেস সভাপতি): এই সময়টা জওহর কাটিয়েছেন তীব্র মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের সময় এক দিন তিনি এলেন আমার কাছে। কথাবার্তা বলে আমার দৃঢ় ধারনা হল, ইংরেজরা যদি তাদের মনোভাব না-বদলায় তবু তিনি ক্রিপস প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পক্ষে। তিনি বোঝাতে চাইছিলেন, ক্রিপস যে-সব আশ্বাস দিয়েছেন তার পর আমাদের আর ইতস্তত করা উচিত নয়। ঠিক এইভাবে কথাগুলি না বললেও তাঁর যুক্তির ধারাটা ছিল এই রকমই।

জওহরের এই সব কথাবার্তা শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন আজাদ। ঘুমোতে পারলেন না মাঝরাত পর্যন্ত। পর দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই চলে গেলেন রামেশ্বরী নেহরুর বাড়িতে। সেখানেই ছিলেন জওহর। দু'জনে ঘণ্টাখানেক ধরে কথাবার্তা হল। আজাদ তাঁকে বোঝালেন: জওহর যে-ধরনের ভাবনাচিন্তা করছেন তা আমাদের সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী।

আসলে জওহরকে নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তাতেই ছিলেন আজাদ। ক্রিপস ভারত ছেড়ে যাওয়ার পরই বিলেতের নিউজ ক্রনিকল পত্রিকার প্রতিনিধিকে একটি সাক্ষাৎকার দেন জওহর। আজাদ লিখছেন: সেই সাক্ষাৎকারের সুর থেকে মনে হয়েছিল যে জওহর যেন কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে মতবিরোধকে খাটো করে দেখাতে চাইছেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে যদিও কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, তবু ভারত ইংরেজদের সাহায্য করতে চায়।

এই সময়েই অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে জওহরের একটা বিবৃতি

দেওয়ার কথা হয়। কিন্তু আজাদ ভয় পেয়ে যান। জওহরের বিবৃতিতে হয়ত বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। তিনি জওহরকে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটা নির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, এখন খুব সাবধানে কথা বলতে হবে। তিনি তাই জওহরকে অনুরোধ করেন কোন বিবৃতি না দিতে।

ক্রিপস ভারত ছেড়ে যাওয়ার পর এপ্রিলের শেষে এলাহাবাদে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। ক্রিপস মিশন প্রত্যাখ্যান করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল। সেই সঙ্গে বলা হল: যদি কোন বিদেশী ফৌজ ভারতে প্রবেশ করে তবে অহিংস পথে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে।

গান্ধীজি এই বৈঠকে আসেন নি। তবে তিনি একটি খসড়া প্রস্তাব পাঠান। সেটি জওহরের মোটেই পছন্দ হয় নি। তিনি বললেন: এই প্রস্তাব পড়ে জগৎশুদ্ধ লোক ভাববে যে আমরা অক্ষশক্তির (জাপান-জার্মানি) সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি। জওহরের এই মন্তব্যের কারণ, ঐ প্রস্তাবে গান্ধীজি বলতে চেয়েছিলেন: ভারতকে রক্ষা করার সামর্থ্য ব্রিটেনের নেই।...ভারতীয় সেনাবাহিনী একটা বিচ্ছিন্ন সংগঠন, ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি নয়, এই বাহিনীকে ভারতের মানুষ নিজেদের বাহিনী বলে মনে করে না।...ভারতের সঙ্গে জাপানের কোন কলহ নেই। সে লড়ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ভারত যদি স্বাধীনতা পায় সম্ভবত প্রথম কাজই হবে জাপানের সঙ্গে আলোচনা করা। কংগ্রেস মনে করে, যদি ইংরেজ ভারত ছেড়ে যায়, তবে জাপান বা অপর কেউ আক্রমণ করলে ভারত আত্মরক্ষা করতে পারবে।

গান্ধীজির এই খসড়া বাতিল করে নতুন একটি খসড়া তৈরি করেন জওহর। তাতে সব কথাই বলা হয়, কিন্তু ব্রিটেন যে ভারতকে রক্ষা করতে অক্ষম এই কথাটা বাদ দেওয়া হয়। জাপানের প্রসঙ্গও অনুল্লেখিত থাকে। এই খসড়াটিই গৃহীত হয় শেষ পর্যন্ত।

এই প্রসঙ্গে সুভাষ লিখছেন: বহু সমালোচিত প্রস্তাবটি থেকে

বোঝা যায় গান্ধীজি জওহরের মতো আদর্শগত দিক দিয়ে মাত্রাতিরিক্ত গোঁড়া ছিলেন না, বরং ছিলেন অনেক বেশি বাস্তববাদী। আসলে বার্লিন থেকে সুভাষ যে ধরনের প্রচার চালাচ্ছিলেন তার সঙ্গে গান্ধীজির বক্তব্যের রীতিমতো সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

এই সময়ে সুভাষের চিন্তাধারা কি প্রভাবিত করেছিল গান্ধীজিকে? শোনা যাক মৌলানা আজাদ কী বলেন: সুভাষ যে দেশ ছেড়ে লুকিয়ে জার্মানিতে চলে গিয়েছিলেন তাতে গান্ধীজি রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছিলেন। আগে তিনি সুভাষের অনেক কাজই অনুমোদন করেন নি, কিন্তু এখন দেখলাম তাঁর মনোভাব বদলেছে। তিনি যে-সব মন্তব্য করতেন তা থেকে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, ভারত থেকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সুভাষ যে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তার তিনি রীতিমতো তারিফই করেন। যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁর অজ্ঞাতেই প্রভাবিত হয়েছিল সুভাষ সম্পর্কে তাঁর এই প্রশংসার মনোভাবের দ্বারা। ক্রিপস মিশনের ভারত সফরের সময়ে আলাপ আলোচনার উপরেও ছায়া ফেলেছিল তাঁর এই প্রশংসার মনোভাব।

*

এই পটভূমিতে এই ঘটনা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে ১৯৪২ সালের 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন নিয়েও মতপার্থক্য দেখা দেবে গান্ধীজির সঙ্গে জওহরের।

মে মাসেই গান্ধীজি জানালেন 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের পরিকল্পনার কথা। যুদ্ধের এই সন্ধিক্ষণে ভারতে এই ধরনের আন্দোলনের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন জওহর। এতে ইংরেজের যুদ্ধ প্রয়াস ব্যাহত হবে—তাই উদ্বেগ। জওহরের উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়, কারণ তিনি আশঙ্কা করছিলেন এই বার ভারত আক্রান্ত হবে জাপানের দ্বারা। আর যদি তাইই হয় তবে তা প্রতিরোধ করতে অস্ত্র ধরতেও প্রস্তুত তিনি। কিন্তু গান্ধীজি তখন আর জাপানি আক্রমণের আশঙ্কা করছেন না। আর সুভাষ তো বেতার প্রচারে

বিদেশ থেকে বলছেন, ভারত যদি ব্রিটেনের তরফে যুদ্ধে যোগ না দেয় তবে অক্ষশক্তিভুক্ত কোন দেশের দ্বারা ভারতের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই বললেই চলে।

কুলুতে দিন পনের বিশ্রাম করে ফিরে এসেছেন জওহর। ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতার পর দেশের আবহাওয়া যে বদলে গেছে তা বুঝতে পারছেন। আপস রফার শেষ আশাও নির্মূল। ইংরেজ সরকার এখন পক্ষপাতী দমননীতির। জাতীয় আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চায় তারা। এই সব কি মুখ বুজে মেনে নিতে হবে? কিছু একটা করা দরকার।

জওহর এই সবই বোঝেন। তবু যুদ্ধের সংকট এবং আক্রমণের আশঙ্কার কথা মন থেকে যায় না। জওহর লিখছেন: এত বড় দেশে এই ধরনের একটা সন্ধিক্ষণে মানুষের মধ্যে নানা মত দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃত জাপান-ঘেঁষা মনোভাব ছিল না বললেই চলে। কারণ প্রভু-বদল করতে কেউই চায় না। বরং চীনের প্রতি সমর্থনের মনোভাব ছিল জোরালো ও ব্যাপক। তবে একটা ছোট গোষ্ঠী ছিল পরোক্ষভাবে জাপান-ঘেঁষা। তারা ভাবত জাপানের আক্রমণকে তারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের কাজে লাগাতে পারবে। সুভাষচন্দ্র বসু (বিদেশ থেকে) যে বেতারে প্রচার চালাচ্ছিলেন, তারা প্রভাবিত হচ্ছিল তার দ্বারা (ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া)।

জুলাইয়ে ওয়ার্ধায় আবার বসল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। ৬ তারিখ থেকে টানা ন' দিন তর্কবিতর্কের পর গৃহীত হল 'ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাব। কংগ্রেস নেতৃত্বে মতবিরোধের কারণ সেই একই: এই মুহূর্তে জাতীয় আন্দোলন শুরু করলে ব্রিটেনের যুদ্ধপ্রয়াস ব্যাহত হবে কিনা। একদিকে গান্ধীজি, তিনি আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্তে অটল। অন্য দিকে জওহর, তাঁর পাশে মৌলানা আজাদ। তাঁরা গান্ধীজিকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন। গান্ধীজি কিছুটা বুঝলেনও। কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত থেকে সরলেন না।

আসলে সেই মে মাস থেকে আগস্ট পর্যন্ত ক্রমাগত জওহর চেষ্টা

করে গেছেন আন্দোলন শুরু করা থেকে গান্ধীজিকে নিরস্ত করতে। ঐ সময়ে গোয়েন্দা রিপোর্টেও মেলে গুরু-শিষ্যের এই মতবিরোধের বিবরণ। মার্কিন লেখক লুই ফিশার সেই সময় ছিলেন ওয়ার্ধায়। তাঁর 'আ উইক উইথ গান্ধী' রচনাতেও আমরা পাই মহাত্মা-জওহরের সংঘর্ষের কাহিনী। মৌলানা আজাদ লিখছেন : এর আগেও গান্ধীজির সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আমার মতানৈক্য হয়েছে। কিন্তু কখনোই তা এমন সর্বাত্মক হয়নি। অবস্থা চরমে পৌঁছল যখন তিনি চিঠি লিখে আমাকে বললেন যে, আমার মনোভাব এতই ভিন্ন ধরনের যে আমরা আর এক সঙ্গে কাজ করতে পারব না। কংগ্রেস যদি চায় গান্ধীজিই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিন তবে আমার অবশ্যই উচিত কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দেওয়া এবং ওয়ার্কিং কমিটি থেকে সরে দাঁড়ানো। জওহরলালেরও তাই করা উচিত (ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম)।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য গান্ধীজির ইচ্ছাই জয়ী হল। ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত হল 'ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাব। সুভাষ স্বাগত জানালেন এই প্রস্তাবকে। যদিও এই প্রস্তাবের মধ্যেও আপসরফার কোন কোন পথ খোলা রাখা হয়েছিল তবু সুভাষ খুশি। কারণ, তিনি লিখেছেন, কংগ্রেসের এই প্রস্তাব ভারতের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের মনের কথা প্রকাশের ব্যাপারে সবচেয়ে কাছাকাছি আসতে পেরেছিল। আর এত দিন সুভাষ যে-কথা বলে এসেছেন কংগ্রেস মূলত তারও কাছাকাছি এসে গেল। সুভাষ বরাবরই বলেছেন, ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে চূর্ণ করাই ভারতের সব সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ আর এর জন্য সংগ্রাম করতে হবে ভারতের জনগণকে।

সুভাষ আরও লিখেছেন : অবশ্য তখনও কিছু কংগ্রেস নেতা স্বপ্ন দেখছিলেন যে, ইউনাইটেড নেশনস, বিশেষতঃ আমেরিকা ভারতের স্বাধীনতার দাবির সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারে। তবে তাঁরা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। ওয়ার্ধা বৈঠকের পর এক বিদেশী সাংবাদিক জওহরলাল নেহরুকে প্রশ্ন করেছিলেন : যুদ্ধের পর ভারতকে পূর্ণ

স্বাধীনতা দেওয়া হবে, ব্রিটেনের এই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আমেরিকা যদি গ্যারান্টি দেয় তা হলে কি কাজ হবে? নেহরু আন্তরিকভাবে ছিলেন ব্রিটেনের সঙ্গে আপসরফার পক্ষপাতী। কিন্তু তিনিও ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলছিলেন : না। নেহরু বলেছিলেন : কংগ্রেস চায় এখনই স্বাধীনতা। সন্দেহ নেই, গোটা দেশের মনোভাবও ছিল তাই (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল)।

তবু কিন্তু জওহরের সব দ্বিধার অবসান হয় নি। ৮ আগস্ট বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে 'ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাবটি তুলেছিলেন জওহরই। রাতে ফিরলেন বোন কৃষ্ণার বাড়িতে। তখনও কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি যে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠিক হল কিনা। পরদিন ভোরেই অন্যান্য কংগ্রেস নেতার সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন জওহর। শেষ বারের মতো গেলেন ইংরেজের কারাগারে (আহমেদনগর দুর্গ)।

ক'দিন পরে বড়লাটকে একটি চিঠিতে লিখলেন গান্ধীজি (১৪ আগস্ট):

ঐ যন্ত্রণায় (চীন ও রাশিয়ার আসন্ন সর্বনাশ) সে (জওহর) সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার পুরনো ঝগড়াও ভুলতে চেষ্টা করেছে।... দিনের পর দিন আমি ওর সঙ্গে তর্ক করেছি। সে যে-আবেগ নিয়ে আমার সঙ্গে লড়াই করেছে তা বর্ণনার ভাষা আমার নেই। কিন্তু তথ্যের যুক্তির সামনে সে দাঁড়াতে পারেনি। সে যখন বুঝেছে ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া ঐ দুই দেশের স্বাধীনতাও বিপন্ন হবে তখন সে নতি স্বীকার করেছে। এমন একজন শক্তিমান বন্ধু ও মিত্রকে বন্দি করে আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন।

গান্ধীজি 'প্রকাশ্য বিদ্রোহের' ডাক দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্র। কিন্তু আন্দোলন নির্দিষ্ট কী রূপ নেবে তা বলে যাওয়ার সুযোগ পাননি গ্রেপ্তারের আগে। শীর্ষস্থানীয় সব কংগ্রেস নেতাই বন্দি। গ্রেপ্তারের পরেই দেশের নানা প্রান্তে শুরু হয়ে যায় স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ আন্দোলন।

সুভাষের নিশ্চয়ই ইচ্ছা হচ্ছিল সেই মুহূর্তে দেশে ফিরে আসতে। তা তিনি পারেন নি। কিন্তু আজাদ হিন্দ বেতার থেকে সমানে প্রচার চালিয়ে গেছেন আন্দোলনের পক্ষে। এমন কি তৈরি করে দিয়েছেন একটি কর্মসূচী।

পঁচিশ

একটানা হাজার দিনের বেশি কারাবাসের পর শেষবারের মতো জওহর যখন ইংরেজের বন্দিশালা থেকে বেরিয়ে এলেন (১৫ জুন, ১৯৪৫) তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজি সুভাষের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও সমাপ্তির মুখে। জার্মানি আত্মসমর্পণ করেছে। জাপানের আত্মসমর্পণেরও দেরি নেই।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ইম্ফল অভিযানের পর পার হয়ে গেছে এক বছরেরও বেশি। জাপানি ফৌজ তখন বর্মা থেকে পিছু হটছে, পিছু হটছে আজাদ হিন্দ ফৌজও। দীর্ঘ এক মাস দুস্তর পথ পেরিয়ে নেতাজি এসে পৌঁছেছেন রেঙ্গুন থেকে সিঙ্গাপুর। প্রথমে বর্মা থেকে সেনা সরাতে রাজি হননি তিনি। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে জাপানি সেনানায়কেরা রাজি করান তাঁকে।

ইম্ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজ তুলেছিল তেরঙা পতাকা। কিন্তু সেই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ইংরেজ সেনার পাল্টা আক্রমণে সহযোগী জাপানি সেনাদের সঙ্গে বিপর্যস্ত হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ। ধরা পড়েন এই ফৌজের বহু সেনা। তাঁদের নিয়ে আসা হয় ভারতে। বর্মায় যাঁরা আত্মসমর্পণ করেন তাঁদেরও আনা হল এই দেশে।

তাঁরা কিন্তু কেউ 'যুদ্ধবন্দি' নন। ইংরেজের চোখে তাঁরা নিছকই বিশ্বাসঘাতক। ইংলণ্ডেশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করেছেন তাঁরা—এই অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে। সুতরাং সামরিক

আদালতে বিচার ও সাজাই হল তাঁদের প্রাপ্য। জুলাই মাসেই আজাদ হিন্দ ফৌজের এক দল সেনার বিচার হয়েছিল। আগস্টে শোনা গেল ছ' জনের প্রাণদণ্ড হয়েছে।

সারা দেশে এই খবরে দেখা দিল প্রবল ক্ষোভ। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বগাথা, তাদের ইম্ফল অভিযানের খবর ভারতে এসে পৌঁছেছিল কিছু-কিছু। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কাহিনী জানতে পারেনি দেশের মানুষ। আজাদ হিন্দ ফৌজের সে-সব সেনাকে এদেশে নিয়ে আসা হল তাঁদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল ফৌজের কীর্তিকথা, নেতাজির কীর্তিকথা। ভারতীয় ফৌজের যে-সব সেনা গিয়েছিলেন বর্মা ফ্রণ্টে তাঁদের সঙ্গেও মেলামেশার সুযোগ হল আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের। ইংরেজ চেষ্টার কোন কসুর করেনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে কালিমালিপ্ত করতে, কিন্তু এই বাহিনীর প্রকৃত ভূমিকা ক্রমশই স্পষ্ট উঠতে থাকল ভারতের মানুষের কাছে।

ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদ এবং অক্ষ শক্তি সম্পর্কে জওহরের যে-দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাতে আশা করা যায় না যে, তিনি ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দিদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং জাপানের সহায়তায় ভারত আক্রমণের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবেন। জাপান ভারতে হানা দিলে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার কথা তিনিই ভেবেছিলেন। জাপানি সেনা নিয়ে সুভাষ ভারতে প্রবেশ করলে তিনি বাধা দেবেন—এ-কথাও বলেছিলেন তিনি। তবু আমরা দেখতে পাই আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের যখন বিচার শুরু হল তখন তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে আসছেন জওহর।

জওহর লিখেছেন: যুদ্ধের সময় বর্মা ও মালয়ে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়া হয়েছিল তার কাহিনী অকস্মাৎ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল আর বিস্ময়কর সাড়া জাগাল। সামরিক আদালতে এই ফৌজের জনকয়েক অফিসারের বিচার দেশকে যে-ভাবে জাগিয়ে তুলল আগে আর কোন কিছুই তেমনভাবে জাগাতে পারেনি। তাঁরা হয়ে উঠলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন

ধর্মাবলম্বী মানুষের ঐক্যেরও প্রতীক হয়ে উঠলেন, কারণ ঐ ফৌজের মধ্যে ছিলেন হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সব ধর্মেরই মানুষ। (ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া—সংযোজন : ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪৫)।

এই মন্তব্যের মধ্যে সুভাষের ভূমিকার কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে গঠিত বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে জওহরের মনোভাব স্পষ্ট। এই মন্তব্য লেখার আগে আগস্ট মাসেই তিনি একটি বিবৃতি দেন। তাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের বিচারের বিরোধিতা আছে।

জওহর বললেন : যে-কোন সময়েই আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের কঠোর সাজা দেওয়া অন্যায় হত। কিন্তু এখন ভারতে বড় রকমের পরিবর্তন আসন্ন, এই সময়ে তাঁদের প্রতি সাধারণ বিদ্রোহী হিসেবে আচরণ করলে বড় ভুল করা হবে, পরিণাম হবে সুদূর-প্রসারী। তাঁদের সাজা দিলে গোটা ভারত আর ভারতবাসীকেই সাজা দেওয়া হবে, লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে লাগবে দারুণ আঘাত।

তখনও দেশে সেন্সরশিপ চালু। জওহরের এই বিবৃতি প্রকাশ করতে দেওয়া হল তিন দিন পরে। কিন্তু এই বিবৃতির মধ্যে যে সতর্কবাণী ছিল তাকে ইংরেজ সরকার তেমন গুরুত্ব দিল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাধারণ সেনাদের 'অপরাধ' মার্জনা করলেও সেনাপতি ও বিশেষ অপরাধে অপরাধীদের বিচারের (ফৌজি আদালতে) সিদ্ধান্তের বদল হল না। সারা দেশে ক্ষোভ আরও প্রবল হয়ে উঠল।

এই বিচার সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল কংগ্রেস (২২ সেপ্টেম্বর)। জওহর ঘোষণা করলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ সমর্থনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে। তিনি অন্যান্য দলকেও ডাক দিলেন এই কমিটিতে যোগ দিতে। এই কমিটিতে ছিলেন ১৭ সদস্য—উল্লেখযোগ্য নাম তেজবাহাদুর সাপ্রু, ভুলাভাই দেশাই, কৈলাসনাথ কাটজু, আসফ আলি এবং জওহরলাল। আজাদ হিন্দ সেনাদের সাহায্যের জন্য যে ত্রাণ ও অনুসন্ধান কমিটি গড়া হল তারও সদস্য জওহর। নভেম্বরে লাল কেল্লায় যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের

তিন সেনানায়ক শাহনাওয়াজ খান, জি এস ধীলন এবং প্রেম সায়গলের বিচার শুরু হল তখন বিবাদী পক্ষের অন্যতম কৌঁসুলির ভূমিকায় দেখা গেল জওহরকে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে বিরাট সভা হল আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মুক্তির দাবিতে। সেখানে অন্যতম বক্তা জওহর।

কেন জওহর আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য এতখানি তৎপর হয়ে উঠলেন? জওহরের যিনি সরকারি জীবনীকার সেই সর্বেপল্লী গোপাল বলছেন: জওহরের নিজের মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে এই সেনারা ভুলই করেছিল। কোন বিদেশী শক্তির সহায়তায় স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না, বিশেষত জাপানের সাহায্যে তো নয়ই, কারণ ঐ দেশের রয়েছে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্কময় ইতিহাস। তবে আজাদ হিন্দ ফৌজের কিছু সেনার সঙ্গে পরিচয়ের পর জওহরের ধারণা হয় যে তাঁরা সবাই ভারতীয় ফৌজের সেরা সৈনিক। তাঁরা সাধারণত মহত্তম উদ্দেশ্যের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরা যে কাজটা করেছেন তা ভুল, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে করেছেন তা ছিল সঠিক। সুতরাং তাঁদের দেশ-দ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ইংরেজ সরকার যে চেষ্টা করছে তা একেবারেই অবাস্তব।

সেনারা যদি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে ভুল করে থাকে তবে তার দায়িত্ব প্রধানত সুভাষের উপরই বর্তায়। জাপানি ফৌজের সহায়তায় সুভাষের ভারত আক্রমণের উদ্যোগ সম্পর্কে জওহরের ধারণা কী ছিল?

এক ইংরেজ লেখককে জওহর বলেছিলেন: তাঁদের (আজাদ হিন্দ ফৌজের) ত্রুটি বা ভুল যাই হোক না কেন···এই যুব-তরুণেরা চমৎকার ছেলে····তাঁরা যে উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রধানত চালিত হয়েছিলেন তা হল ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। তাঁরা নিয়মিত সামরিক পোশাক পরা সংগঠিত যোদ্ধাবাহিনী হিসেবেই লড়াই করেছেন, সুতরাং তাঁরা যুদ্ধবন্দি হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার জন্যই তাঁরা জাপানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন (জে এস ব্রাইট—দা গ্রেট নেহরুজ)।

ব্রাইট আরও লিখছেন : বসু (সুভাষ) যুদ্ধ-অপরাধী বলে যে অভিযোগ উঠেছে জওহর তা নাকচ করে দেন। বসু সরকার (প্রবাসে গঠিত ভারতের অস্থায়ী সরকার) যে-সব কর বসিয়েছিলেন (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়) তার যৌক্তিকতা সমর্থন করেন জওহর এবং বলেন, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বসুর আন্তরিক কামনাকে তিনি কোন দিনই সন্দেহের চোখে দেখেন নি (মাইকেল ব্রেশারের জওহর চরিতে উদ্ধৃত)।

তবু আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনে জওহরের এইভাবে এগিয়ে আসার কারণ সকলের কাছে খুব স্পষ্ট হয় নি, বরং মনে হয়েছে কিছুটা অপ্রত্যাশিতই। জওহর এক হিসেবে ছিলেন ভাবাবেগ-চালিত। ইংরেজ সরকারের হাতে কয়েক হাজার ভারতীয়ের নিগ্রহের মধ্যে দিয়ে যে-ভাবে দেশের মর্যাদাবোধ ঘা খাচ্ছিল তা তাঁর মতো মানুষকে নাড়া দিতেই পারে এবং তার ফলেই তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এসে থাকতে পারেন। কিন্তু এর বাইরে অন্য কারণও নিশ্চয়ই ছিল।

'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করেছিল ইংরেজ সরকার। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা ১৯৪২ সালের আগস্ট থেকে বন্দি, সুভাষ চলে গেছেন দেশ ছেড়ে। এক ধরনের রাজনৈতিক শূন্যতা তখন দেশে। নতুন কোন সংগ্রামের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এদিকে মহাযুদ্ধ নিয়ে এসেছে অর্থ নৈতিক দুর্ভোগ।

১৯৪৫ সালের জুনে জওহর প্রমুখ কংগ্রেস নেতা যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁরা ভেবেছিলেন হয়ত তাঁরা দেখবেন দেশবাসীর মনোবল ভেঙে পড়েছে, কোন উদ্দীপনা তাদের মধ্যে আর চোখে পড়বে না। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা দেখলেন অন্য ছবি। তাঁদের কারা-মুক্তির পর সংবর্ধনা জানাতে সমবেত হল হাজার হাজার মানুষ। আহমেদনগর দুর্গের বন্দিশালা থেকে জওহরকে ঐ বছরেরই গোড়ার

দিকে পাঠানো হয়েছিল উত্তর প্রদেশের নৈনি সেণ্ট্রাল জেলে। তারপর সেখান থেকে বেরিলির কাছে ইজ্জতনগর সেণ্ট্রাল জেল হয়ে আলমোড়া। ১৫ জুন যখন জওহর বেরিয়ে আসছেন জেল থেকে তখন দেখেন কারাগারের ফটকের কাছে বিশাল জনতা। বাঁকুড়া জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। সেখানেও জনতা প্রতীক্ষা করছে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে। বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে আসছেন সদ্য-মুক্ত নেতারা। প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক লাখ মানুষ।

জওহর লিখছেন : এই তিন বছর গেছে আমাদের দেশের মানুষের পক্ষে চরম যন্ত্রণার সময়। যার সঙ্গেই দেখা হয়েছে তারই মুখে দেখেছি নির্যাতনের চিহ্ন। ভারত বদলে গেছে। ওপরতলাটা দেখে মনে হচ্ছে শান্ত, নিচে রয়েছে সন্দেহ ও প্রশ্ন, হতাশা ও ক্রোধ আর তার সঙ্গে অবদমিত আবেগ।

জওহর নিজেই লক্ষ করেছেন, কারাগার থেকে তাঁদের মুক্তি এবং তারপর যে-সব ঘটনা ঘটল, তাতে দৃশ্যপট বদলে গেল। ওপরতলায় সেই শান্ত-সুষ্ঠু ভাব আর রইল না, ফাটলের চিহ্ন দেখা দিতে শুরু করল। অসন্তোষের ঢেউ বইতে লাগল দেশ জুড়ে। তিন বছরের নির্যাতন আর অবদমনের পর মানুষ বেরিয়ে আসতে চাইল খোলস ভেঙে। এর আগে এত বিশাল জনতা জওহরও দেখেন নি, এমন উদ্দীপনা দেখেননি, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এমন বিপুল আকাঙ্ক্ষাও চোখে পড়েনি তাঁর। তরুণ-তরুণী কিশোর-কিশোরী সকলেই কিছু একটা করার জন্য যেন জ্বলে উঠেছে। অথচ কী যে তারা করতে চায় তা তারা জানে না।

কংগ্রেস নেতারাও যে খুব একটা স্পষ্ট করে জানতেন তা নয়। জেল থেকে যখন তাঁরা বেরোলেন তখনই বড়লাট ওয়াভেল তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইলেন প্রশাসন পরিষদ নতুন করে গড়ার প্রশ্ন নিয়ে। মুক্তির দিন পাঁচেক পরেই সিমলায় দৌড়লেন জওহর। কিন্তু পরিষদের আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে একমত হতে পারলেন না

কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের নেতারা। বড়লাট জানালেন আলোচনা ব্যর্থ হল।

এদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটেনে ক্ষমতায় এসেছে শ্রমিক দল। ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে উইনস্টন চার্চিলের রক্ষণশীল দলের তুলনায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। ভারতে রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান ঘটাবার প্রয়াসে বড়লাট ঘোষণা করলেন আইন সভায় নতুন নির্বাচনের কথা।

ভারতের মানুষ এই মুহূর্তে চূড়ান্ত একটা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তাদের সামনে কোন কর্মসূচী উপস্থিত করতে অপ্রস্তুত কংগ্রেস নেতৃত্ব। ঠিক এই সময়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের প্রশ্নটি তাঁদের কাছে উপস্থিত হয় প্রায় ঈশ্বর-প্রেরিত হয়ে এবং তাঁরা তা আঁকড়ে ধরেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের বিচারের নামে অবিচারের প্রশ্নে জনমনে যে প্রবল ক্ষোভ দেখা দেয় তাকে সদ্ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।

তা না করে তাঁদের উপায়ও ছিল না। কারণ নেতাজি সুভাষ ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের নামে গোটা দেশই হয়ে উঠেছিল উত্তাল। "সেই মুহূর্তে জাতীয় নেতাদের নামও চাপা পড়ে গিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তিকথায়। মনে হল যেন আজাদ হিন্দ ফৌজ জাতীয় কংগ্রেসকেই মুছে দিয়েছে। বিদেশে যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রামের কাহিনী ঢেকে দিয়েছে স্বদেশে অহিংসা আন্দোলনের কাহিনীকে"—এই মন্তব্য পট্টভি সীতারামাইয়ার। জওহর নিজেই স্বীকার করেছেন, এমন উন্মাদনা দেশে আগে আর কখনও দেখা দেয়নি। রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা তখন অন্য এক ধরনের, ব্যাপকতর সাফল্যের আলোকে উদ্ভাসিত।

গান্ধীজিকে তাই বলতে হয়েছিল কিছুদিন পরে: আজাদ হিন্দ ফৌজের জাদু আমাদের উপর তার মায়া বিস্তার করেছে। নেতাজির নামে জাদু আছে। তাঁর দেশপ্রেম কারো চেয়ে কম নয়। তাঁর সব কাজের মধ্যেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর বীরত্ব। তাঁর দৃষ্টি ছিল খুবই

উঁচুতে, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কেই বা ব্যর্থ হয়নি? আমাদের কাজ হল একটা উচ্চ লক্ষ্য স্থির করা এবং সেই লক্ষ্যের দিকে ঠিক-মতো চালিত হওয়া। প্রত্যেকেই সফল হতে পারে না (হরিজন—২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)।

এই আপাত-ব্যর্থতা সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সাফল্যের কথা গান্ধীজি বলেছিলেন তা হল আত্মত্যাগ, জাতিধর্ম নির্বিশেষে ঐক্য এবং শৃঙ্খলাবোধ। এই ধরনের ঐক্য কংগ্রেস নেতারা আনতে পারেননি, সুভাষ তা এনেছিলেন তাঁর বাহিনীতে। গান্ধীজি চেয়েছিলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের এই তিনটি গুণ ভারতের মানুষ অনুসরণ করুক।

কয়েক মাস পরে গান্ধীজি যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের কাছে ভাষণ দেন তখনও এই প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, তোমরা তোমাদের বাহিনীতে হিন্দু মুসলমান পারসি খ্রীস্টান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সকলের মধ্যে পুরোপুরি একতা আনতে পেরেছ। জওহর ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়ায় লেখেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে, আমরাই বা পারব না কেন?

কিন্তু আরও বড় একটি কথা গান্ধীজিই বলেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের তিনি বলেন, তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে স্বাধীন করা, জাপানিদের সাহায্য করা নয়। তোমাদের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য পূরণে তোমরা ব্যর্থ হয়েছ, অর্থাৎ ইংরেজকে হারাতে পারোনি। কিন্তু তোমরা এ-কথা জেনে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবে যে সারা দেশ জেগে উঠেছে, এমন কি নিয়মিত সেনাবাহিনীতে পর্যন্ত দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক চেতনা, তারাও স্বাধীনতার কথা ভাবছে।

ইংরেজ সরকারের আজ্ঞাবহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব যে নিছক কল্পনা নয় তার প্রমাণ ব্রিটিশ সূত্র থেকেই মেলে। ইংরেজ সেনানায়ক জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস টাকার তাঁর স্মৃতিকথায় (হোয়াইল মেমরি সার্ভস্) লিখেছেন:

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাপারটা যখন তুঙ্গে উঠেছিল তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোটা কাঠামোটাই ধসে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

সেই সময়ে ভারতে ইংরেজ সেনাপতি সার ক্লড অচিনলেক। বড়লাট ওয়াভেলের কাছে রিপোর্টে (২৬ নভেম্বর ১৯৪৫) তিনি জানালেন : এমন কি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মরত সেনাদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল আগ্রহ আর সহানুভূতি (আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে)।

যে-প্রশ্নকে ঘিরে দেশে এই ধরনের অগ্নিগর্ভ অবস্থা তৈরি হয়েছিল তাকে উপেক্ষা করার মতো মূর্খ কংগ্রেস নেতারা ছিলেন না। জওহর তো ননই। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনে এগিয়ে এসে এই প্রশ্নটিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইলেন, এমন কি সুভাষ যে অভিবাদন-বাণী চালু করেছিলেন সেই 'জয় হিন্দ' ধ্বনিটিকেও গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা বা সময় নষ্ট করেননি।

কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা এটাও লক্ষ করি, আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে অথবা অন্যত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজি সুভাষের কীর্তির প্রশংসা জওহর তেমনভাবে করেন নি যেমন করেছেন মহাত্মা গান্ধী, পট্টভি সীতারামাইয়া, রফি আহমেদ কিদোয়াই, এমন কি গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

* * *

আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এলেও এই ফৌজের নাম উঠলেই যে জওহর সব সময়ে বিচলিত হয়েছেন এমন প্রমাণ মেলে না।

কেন্দ্রীয় আইন সভায় এক মুসলমান সদস্য আর্জি জানিয়েছিলেন, বিশেষ অপরাধের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের যে-সব সেনার সাজা হয়েছে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক। জওহর এই প্রস্তাবে আপত্তি করেছিলেন তীব্র ভাষায়। বলেছিলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজে ভালো-মন্দ সব রকমের লোকই ছিল।

বড়লাটের কার্যভার ত্যাগ করে ওয়াভেল ফিরে যাবেন স্বদেশে;

(ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭)। তার আগে অন্তর্বর্তী সরকারে ছোটখাটো একটা সংকট। উপলক্ষ : আজাদ হিন্দ ফৌজের যে-সব সেনা তখনও বন্দি তাঁদের মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব। অন্তত এই প্রশ্নে অন্তর্বর্তী সরকারের কংগ্রেস আর মুসলিম লিগ সদস্যেরা ছিলেন একমত। কিন্তু ওয়াভেল রাজি হলেন না কিছুতেই। নাকচ করে দিলেন সেই প্রস্তাব তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে।

এই প্রশ্নে যে-কোন সরকারেরই ইস্তফা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জওহরের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার তা দেন নি। সর্বেপল্লী গোপাল লিখেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার ঠিক স্বাভাবিক সরকার ছিল না। তা ছাড়া এই প্রশ্নে একমত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগ ইস্তফা দিত কিনা সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ ছিল।

ওয়াভেলের বিদায়ের পর বড়লাট হয়ে এলেন মাউণ্টব্যাটেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মুক্তি দেওয়ার প্রশ্ন উঠল আবার। এই প্রশ্ন নিয়ে পীড়াপীড়ি না করার জন্য জওহরকে চাপ দিতে লাগলেন মাউণ্টব্যাটেন। শেষ পর্যন্ত জওহর রাজি হলেন বিষয়টিকে আদালতে পাঠাতে পরামর্শের জন্য।

মাউণ্টব্যাটেনের কথা উঠতেই এসে যাচ্ছে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিসৌধে জওহরের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের প্রসঙ্গ। সেই বিবরণ প্রথম অধ্যায়েই আমরা দিয়েছি। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁর পত্নী এডুইনা, দু'জনেরই জীবনী রচনা করেছেন রিচার্ড হাফ। তাঁর বিবরণ এবং অন্য সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি লর্ড ও লেডি মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধেই শেষ পর্যন্ত জওহর আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে যাননি।

কিন্তু জওহরের সরকারি জীবনীকার সর্বেপল্লী গোপাল এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন নি। মাউণ্টব্যাটেন অবশ্যই জওহরকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন থেকে। ভারতের ভাবী বড়লাটের ভয় ছিল, জওহর যদি গিয়ে স্মৃতিসৌধে মালা দেন তবে আজাদ হিন্দ ফৌজকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে যাবে।

তবে তিনি ব্যাপারটা দেখাতে চেয়েছিলেন অন্যভাবে। বলেছিলেন, যদি এই উপলক্ষে ভারতীয়দের নিয়ে বড় করে কোন অনুষ্ঠান হয় তবে চীনা এবং স্থানীয় অন্যান্য লোকেরা হয়ত ক্ষুব্ধ হতে পারে।

জওহর মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। বলেছিলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানালে চীনারা ক্ষুব্ধ হবে কেন? মাউন্টব্যাটেন এই যুক্তি খাড়া করতে চেয়েছিলেন যে, জাপান চীনে দেখা দিয়েছিল আক্রমণকারীর ভূমিকায় এবং সেই জাপানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করেছে আজাদ হিন্দ ফৌজ, সুতরাং এই ফৌজকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে চীনারা ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখবে না।

কিন্তু সিঙ্গাপুরে গিয়ে জওহর বুঝতে পারেন এই ধরনের আশঙ্কার কারণ নেই। বরং কিছুটা আশ্চর্য হয়েই তিনি জানতে পারলেন যে, চীনে জাপানি ফৌজকে প্রতিহত করার জন্য যে প্রতিরোধ বাহিনী (রেজিস্টেন্স মুভমেণ্ট) গড়ে উঠেছিল তাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের। চীনারা বুঝতে পেরেছিল, তাদের মতো ভারতীয়রাও লড়াই করছে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য, জাপানের সঙ্গে হাত মেলানোটা নেহাৎই তাৎক্ষণিক ব্যাপার। দেশে ফিরে জওহর যে-বিবৃতি দেন তা থেকেই এই কথা জানা যায়।

মাউন্টব্যাটেন আরও একটা অনুরোধ করেছিলেন জওহরকে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের সভায় ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল জওহরের। মাউন্টব্যাটেন বললেন, সেনারা যেন ফৌজি পোশাক পরে না আসে আর তাদের পোশাকে যেন পদমর্যাদা বোঝাবার জন্য কোন 'ব্যাজ' না-থাকে। তা ছাড়া ঐ সভায় জনসাধারণকে প্রবেশ করতে দেওয়াও উচিত হবে না।

জওহর উত্তরে বলেছিলেন, ফৌজি পোশাকের ব্যাপারে কিছু করার নেই, কারণ অনেক সেনার হয়ত ঐ পোশাক ছাড়া আর কোন পোশাকই নেই। আর 'ব্যাজ'? সাধারণত 'ব্যাজ' পরা হবে না, তবে কেউ যদি পরে তবে আপত্তির কিছু নেই। এই সভায় যাতে

বাইরের লোক না-আসে তার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা হবে, কিন্তু অন্যদের আসতে বাধা দেওয়াটা কাজের কথা নয়।

আসলে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে-সব সদস্য আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের আগেই ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজের অসামরিক সদস্যেরা। সুতরাং 'ব্যাজ' পরা না-পরার প্রশ্ন আর ওঠে নি। বাইরের বহু লোকেও সভায় হাজির ছিল।

তবে জওহর মাউণ্টব্যাটেনের একটা কথা অন্তত শুনেছিলেন। প্রকাশ্য অনুষ্ঠান করে আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিসৌধে মালা দিতে তিনি যাননি। কিন্তু এই স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা থেকে তিনি বিরত থাকেন নি। কোন অনুষ্ঠান না করে একান্তে তিনি এই স্মৃতিসৌধে যান এবং অর্পণ করেন পুষ্প অর্ঘ্য।

গুজরাটি দৈনিক 'জন্মভূমির' সম্পাদক অমৃতলাল শেঠ জওহরের সঙ্গে গিয়েছিলেন সিঙ্গাপুর। দেশে ফিরেই তিনি শরৎচন্দ্র বসুকে জানান, মাউণ্টব্যাটেন পণ্ডিতজিকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় (আগস্ট ১৯৪৫) নেতাজির মৃত্যু হয় নি —সুতরাং জওহর যদি সুভাষ-কাহিনীকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সব সদস্যকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে চাপাচাপি করেন তবে বিপদ আছে—সুভাষ যখন ফিরে আসবেন তখন তা হলে গোটা ভারতকে তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া হবে। এই সতর্কবাণীর পর জওহর শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিসৌধে মালা দিতে যাননি।

কিন্তু জওহর নিজে যখন তাঁর মালয় সফর সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে লিখিত রিপোর্টে (২৮ মার্চ ১৯৪৬) বলেন যে, সকলের অলক্ষে তিনি স্মৃতিসৌধে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন তখন তাঁর মতো নেতা ও মানুষকে আমরা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করতে পারি না।

*

তা পারি বা না পারি, এ-কথাও অস্বীকার করতে পারি না যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও তার নেতা সুভাষ সম্পর্কে জওহরের মনোভাব শেষ পর্যন্ত দ্বিধান্বিতই ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের পক্ষ সমর্থনে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি দেশের শাসনভার গ্রহণের পরও এই ফৌজের সব সদস্য সরকারের কাছ থেকে সুবিচার পাননি। স্বয়ং গান্ধীজি যাঁকে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযানের পর "সব দেশপ্রেমিকের মধ্যে সেরা দেশপ্রেমিক" বলে চিহ্নিত করেছেন সেই নেতাজির ছবি দেশের স্বাধীনতা লাভের পরও ভারতীয় সেনার ব্যারাকে টাঙানো নিষিদ্ধ থেকেছে।

তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর সংবাদ ঘিরে যে-রহস্য ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্যও জওহরের কাছ থেকে আরও উদ্যোগ প্রত্যাশিত ছিল। অবশ্যই পঞ্চাশের দশকে জেনারেল শাহ নাওয়াজের নেতৃত্বে তিনি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। কিন্তু এই কমিটির সিদ্ধান্ত (ঐ বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু) বহু মানুষের কাছে বিশ্বাস্য বা সন্তোষজনক মনে হয়নি। এমন কি স্বয়ং জওহরের মনেও কিছু সংশয় নিশ্চয়ই ছিল।

জওহরের মৃত্যুর কিছু দিন আগে নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয়নাথ বসু জওহরকে একটি চিঠি লেখেন। তাঁর আর্জি ছিল: তাইহোকুর সেই বিমান দুর্ঘটনার ব্যাপারটার একটা চূড়ান্ত ফয়সালা করা হোক সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে দিয়ে তদন্তের ব্যবস্থা করে। এই আর্জির জবাবে জওহর লেখেন: নেতাজির মৃত্যুর ব্যাপারটার চূড়ান্ত ফয়সালা করার জন্য একটা কিছু যে করা দরকার এ-বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত।

এই "কিছু একটা" করার প্রধান সুযোগ ছিল জওহরেরই। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ের যাবতীয় নথিপত্রের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। যাবতীয় গোপন খবরও তাঁর পাওয়ার কথা। কিন্তু তাইহোকু বিমান

দুর্ঘটনার রহস্যের সমাধান হতে পারে এমন কোন কথা তিনি বলেন নি। বরং তাঁর নানা মন্তব্যে বিভ্রান্তি বেড়েছে।

লোকসভায় দাঁড়িয়ে জওহর ১৯৫৬ সালে ঘোষণা করেন, নেতাজির মৃত্যু একটি স্বীকৃত ঘটনা। পরের বছর তিনি গেলেন জাপানে। অনেক ভারতীয় নেতার মতো তিনিও দেখতে গেলেন রেনকোজি মন্দির, যেখানে সুভাষের তথাকথিত চিতাভস্ম রাখা আছে। কিন্তু সেখানে দর্শকদের জন্য রক্ষিত খাতায় নেতাজি অথবা নেতাজির স্মৃতি সম্পর্কে কিছু লিখলেন না। শুধু লিখলেন: বুদ্ধের বাণী মানব সমাজে শান্তি আনুক।

এর কয়েক বছর বাদে জওহর সুভাষের দাদা সুরেশচন্দ্রকে এক চিঠিতে লেখেন: আপনি লিখেছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুর প্রমাণ আপনাকে পাঠাতে। আমি আপনাকে কোন সঠিক ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারব না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক যে-সব প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং (শাহ নাওয়াজ) অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি যে নেতাজির মৃত্যু হয়েছে (১৩মে ১৯৫৬)।

কিন্তু নিশ্চিন্তই যদি হবেন তবে আবার বছর দু'য়েকের মধ্যেই অমিয়নাথকে লিখবেন কেন যে 'নেতাজির মৃত্যুর ব্যাপারটার একটা চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার দরকার'?

তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনাতেই নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল—এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ জাগাবার মতো কিছু কিছু নথিপত্রের হদিশ এখন মিলছে। কিন্তু দেশের জন্য যিনি সর্বস্ব পণ করেছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক হিসেবে যাঁর নাম মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেই উচ্চারিত তাঁর শেষ পরিণাম কী হল, কীভাবে হল তা তাঁর দেশবাসীর কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গেল। আর সেই সুযোগে কত-না অসম্ভব অবাস্তব গল্পকথা কল্পকাহিনী পল্লবিত হয়ে উঠল তাঁকে ঘিরে।

জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে দোটানা, যে জটিলতা দুই নায়কের এই কাহিনীতে আমরা দেখতে

পাই তা শেষ পর্যন্তই বজায় থাকে। সেই কারণেই সুভাষের শেষ পরিণাম রহস্যাবৃতই থেকে যায়। সুভাষ সম্পর্কে জওহর অধিকাংশ সময়েই স্পষ্ট মনোভাব নিতে পারেননি। সুভাষের শেষ পরিণাম সম্পর্কেও তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলে গেলেন না। অথচ কেউ যদি কিছু বলতে পারতেন তবে পারতেন তিনিই।

এই রহস্য সমাধানে যে তিনি এগিয়ে আসেননি তাতে জওহরের সুনামের হানি হয়েছে। অনেক জনরব পল্লবিত হয়েছে। তাইহোকুর সেই বিমান দুর্ঘটনার পর সুভাষের কোন চিঠি কি জওহর পেয়েছিলেন? সেই চিঠি সুভাষ কি লিখেছিলেন রাশিয়া থেকে? অন্য কোন সূত্র থেকেও কি জওহর জানতে পেরেছিলেন যে সুভাষ সায়গন থেকে মাঞ্চুরিয়া হয়ে রাশিয়ায় পৌঁছেছিলেন? এই খবর পাওয়ার পর কি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট অ্যাটলিকে চিঠি লিখে জওহর বলেছিলেন, সুভাষকে আশ্রয় দেওয়া রাশিয়ার উচিত হয়নি? (খোসলা তদন্ত কমিশনের সামনে শপথ নিয়ে এই সব কথা বলেন এক সাক্ষী। ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের একটি রিপোর্টেও আভাস দেওয়া হয় যে সুভাষ রাশিয়ায় আছেন।)

এই ধরনের এবং আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনও পর্যন্ত রহস্যাবৃতই রয়ে গেল। সুভাষ যাঁকে রাজনীতিতে তাঁর "বড় ভাই" হিসেবে মেনে এসেছেন সেই জওহরলাল উদ্যোগী হলে এই রহস্যের উন্মোচন হতে পারত।

কিন্তু তা হয়নি।

হতে তো আরও অনেক কিছুই পারত।

তিরিশের দশকে গান্ধীজির পরই ছিল যে দুই নেতার স্থান, দেশের তরুণ সমাজের যাঁরা ছিলেন নয়নের মণি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সেই জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু যদি বামপন্থীদের সমবেত করে একত্রে চলতে পারতেন তবে তো স্বাধীনতা সংগ্রামের চেহারা ও চরিত্রই বদলে যেতে পারত, দেশের ইতিহাস বইতে পারত অন্য খাতে!

কিন্তু তা তো হয়নি। দু'জনের পথ হয়ে গেছে ভিন্ন। দৃষ্টিভঙ্গি আর মতাদর্শের অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও জওহর শেষ পর্যন্ত থেকে গেছেন গান্ধীজির অনুগামী এবং তারই জন্য পরিণামে পেয়েছেন পরম পুরস্কার: স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদ।

মতাদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধায় কোন ঘাটতি পড়েনি সুভাষের ("হে জাতির জনক! ভারতের মুক্তির এই পুণ্য সংগ্রামে আমরা চাই আপনার আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা"—মহাত্মার উদ্দেশে রেঙ্গুন থেকে বেতার ভাষণ, ৬ জুলাই ১৯৪৪)। কিন্তু তবু তিনি বেছে নিয়েছিলেন স্বতন্ত্র পথ।

মাইকেল এডওয়ার্ডসের ভাষায়: কংগ্রেসে বড় নেতাদের মধ্যে একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসুই ছিলেন ক্ষত্রিয়। সশস্ত্র আন্দোলনের পথে ইংরেজকে উচ্ছেদের প্রয়াসে ব্রতী হয়ে সুভাষ ক্ষত্রিয়দের নিজস্ব পন্থা গ্রহণ করেছিলেন।...একজন মাত্র অসাধারণ ব্যক্তিত্বই স্বতন্ত্র, সশস্ত্র আন্দোলনের পথ নিয়েছিলেন এবং এক হিসেবে অন্য কোন মানুষের চেয়ে ভারত তাঁর কাছেই বেশি ঋণী।

এডওয়ার্ডসের তাই মন্তব্য: ইংরেজরা গান্ধীজিকে ভয় করেনি; নেহরুকেও তাদের আর ভয় ছিল না।...কিন্তু ইংরেজদের ভয় ছিল সুভাষ বসুকে অথবা তিনি যে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতিভূ ছিলেন সেই সশস্ত্র সংগ্রামকে।

তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনা যে দিন ঘটল সেদিন নেতাজির বয়স আটচল্লিশ বছর ছ' মাস পেরিয়ে কয়েক দিন। জওহরের ছাপান্ন বছর ন' মাস পূর্ণ হয়েছে। দুই নায়কই তাঁদের জীবনের সেরা বছরগুলি নিয়োজিত করেছেন দেশের সেবায়। দুই সচ্ছল পরিবারের দুই সন্তান লোভনীয় পেশা ছেড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে বরণ করেছেন দুর্দশা দুর্ভোগ নির্যাতন। জওহর কারাবরণ করেছেন ন' বার। সুভাষ এগারবার, তার সঙ্গে ছিল দেশ থেকে নির্বাসন।

জওহর দেশের মানুষকে মুক্তির সংগ্রামে যে-ভাবে উদ্দীপিত করেছেন তার তুলনা বিশেষ মেলে না। তাঁর মতো জনপ্রিয় নেতাও

বিরল। কিন্তু পঁয়তাল্লিশ সালের শেষার্ধে কীর্তি ও জনপ্রিয়তায় সুভাষ তাঁকে ছাড়িয়ে চলে যান অনেক দূর। ইতিহাসকে সুভাষ যেভাবে রচনা করেছেন জওহর সেভাবে পারেননি। নেতাজির নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ ফৌজের আপাত ব্যর্থতার পরিণামই শেষ আঘাত হেনেছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বুকে, টলিয়ে দিয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রধান স্তম্ভ সেনাবাহিনীকে। বিমান বহর, নৌ বহরে বিদ্রোহ তারই পরিণতি। আজ্ঞাবহ সেনাবাহিনীর সামর্থ্য, মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরলে যে সরকারের শক্তিসামর্থ্যেও রীতিমতো আঘাত লাগে—ইতিহাসে এমন নজিরের অভাব নেই।

ভারতেও পুনরাবৃত্তি ঘটল সেই ইতিহাসের। মাইকেল এডওয়ার্ডসের ভাষায়ঃ ভারত সরকারের ধীরে ধীরে এই বোধোদয় হল যে, ব্রিটিশ শাসনের মেরুদণ্ড, ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্ভবত আর সেই রকম বিশ্বাসভাজন থাকবে না। হ্যামলেটের বাবার মতো সুভাষ বসুর প্রেতাত্মা লাল কেল্লার প্রাকারে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যে-সব সম্মেলনের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এল সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করল সুভাষের অকস্মাৎ বিশাল হয়ে ওঠা অবয়ব।

এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনি আর এক ইংরেজ লেখকের মন্তব্যেঃ যুদ্ধের শেষে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, সেই সঙ্গে ভারতীয় নৌ বহরে বিদ্রোহ থেকে মনে হল, ভারতকে ব্রিটিশ শাসনে রাখার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর আর বেশি দিন নির্ভর করা যাবে না। অন্য কোন কারণের চেয়ে এই উপলব্ধিই সম্ভবত ইংরেজের মনকে তৈরি করে ভারতের স্বাধীনতার অনিবার্যতা মেনে নিতে (অ্যালেস্টেয়ার ল্যাম)।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার অতঃপর ভারত ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে বাধ্য হল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তাক্ত দেশকে দু'টুকরো করে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল কিছু দিনের মধ্যে।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

তারপর তো শুরু হল অন্য কাহিনী।

॥ শেষ

জওহরলাল নেহরু
ঘটনাপঞ্জী

১৮৮৯ : ১৪ নভেম্বর এলাহাবাদে জন্ম

১৯০৫ : হ্যারো স্কুলে ভর্তি

১৯০৭ : ট্রিনিটি কলেজ, কেমব্রিজে ভর্তি

১৯১২ : বার অ্যাট ল। দেশে ফিরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু। বাঁকিপুর কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান

১৯১৬ : কমলার সঙ্গে বিয়ে

১৯২১ : অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবাস

১৯২৩ : জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক

১৯২৬ : আবার ইউরোপে

১৯২৭ : দেশে ফিরে মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগদান। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন

১৯২৯ লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি

১৯৩০ আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার

১৯৩৬ কমলার মৃত্যু। লখনউ কংগ্রেসে সভাপতি

১৯৩৭ ফৈজপুর কংগ্রেসে সভাপতি

১৯৩৮ আবার ইউরোপে। গৃহযুদ্ধের সময় স্পেন সফর

১৯৪০ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গ্রেপ্তার

১৯৪২ আগস্টে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে গ্রেপ্তার, সর্বশেষ ও নবম বার কারাবরণ

১৯৪৫ : কারাগার থেকে মুক্তি

১৯৪৬ : কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী

১৯৪৭ : স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

সুভাষচন্দ্র বসু

ঘটনাপঞ্জী

১৮৯৭ ২৩ জানুয়ারি কটকে জন্ম

১৯১৩ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি

১৯১৬ প্রেসিডেন্সি থেকে বহিষ্কৃত

১৯১৭ স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি

১৯১৯ বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কেমব্রিজে ভর্তি

১৯২০ আই সি এস পরীক্ষায় চতুর্থ

১৯২১ আই সি এস থেকে ইস্তফা, অসহযোগ আন্দোলনে গ্রেপ্তার

১৯২৪ : কলকাতা পৌরসভার চিফ একসিকিউটিভ অফিসার, গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে বন্দি (মান্দালয়, বর্মা)

১৯২৭ : জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক

১৯২৮ : কলকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

১৯৩০ : কলকাতার মেয়র, গ্রেপ্তার, কারাবাস

১৯৩১ : অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি

১৯৩৩ : গ্রেপ্তার, বন্দি, চিকিৎসার জন্য ইউরোপ যাত্রা, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে নিষেধাজ্ঞা

১৯৩৬ : স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, গ্রেপ্তার

১৯৩৮ : হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি

১৯৩৯ : ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত, কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা, ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন

১৯৪০ : ভারত রক্ষা বিধিতে গ্রেপ্তার, কারাবাস, অনশন ও মুক্তি

১৯৪১ : ১৭ জানুয়ারি ভারত থেকে মহানিষ্ক্রমণ, কাবুল হয়ে জার্মানিতে

১৯৪৩ : জার্মানি ছেড়ে সাবমেরিনে সিঙ্গাপুর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক, স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন (২১ অক্টোবর)

১৯৪৪ : বর্মা সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান। সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ (১৮ মার্চ), কোহিমা-ইম্ফল সীমান্তে জাপানের সেনা-বাহিনীর বিপর্যয় (জুন), ব্রিটিশ ফৌজের পাল্টা আক্রমণ (ডিসেম্বর)

১৯৪৫ : ব্রিটিশ ফৌজের উত্তর বর্মা দখল, আজাদ হিন্দ ফৌজের বর্মা থেকে পশ্চাদপসরণ, নেতাজির রেঙ্গুন ত্যাগ (২৪ এপ্রিল), শাহনাওয়াজ খান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যান্য অফিসার গ্রেপ্তার, নেতাজি রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্ককে (১৪ মে), ব্যাঙ্কক থেকে সিঙ্গাপুরে (১৮ জুন), জাপানের আত্মসমর্পণ (১৪ আগস্ট), নেতাজির সিঙ্গাপুর থেকে যাত্রা (১৬ আগস্ট), তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনা (১৮ আগস্ট)।

গ্রন্থপঞ্জী

জওহরলাল নেহরুর রচনাবলী

Soviet Russia
Letters from a Father to his Daughter
Glimpses of World History
Whither India
An Autobiography
India and the World
Eighteen Months in India
China, Spain and the War
The Unity of India
Discovery of India
A Bunch of Old Letters
Selected Speeches

সুভাষচন্দ্র বসুর রচনাবলী

The Indian Pilgrim and Letters 1912—1921
The Indian Struggle 1920—1942
Correspondence 1922—1926
Correspondence 1926—1932
Statements, speeches, prison notebooks 1923—1929
Crossroads
Fundamental Questions of Indian Revolution
Selected Speeches
তরুণের স্বপ্ন

অন্যান্য রচনা

Azad, Abul Kalam —India Wins Freedom

Bose, Asokenath —My uncle Netaji

Bose, Sisirkumar —A Sword Forever Unseathed

Bose, Sisirkumar, Werth, Alexander, Ayer, S. A., Editors —A Beacon Across Asia—a biography of Subhas Chandra Bose

Brecher, Michael —Nehru : a political biography

Chakraborty, Bidyut —Was Netaji a Fascist ? The Sunday Statesman, January 26, 1986

Chandra, Bipan —World War II Spurs Final Offensive (100 years of the Congress) The Telegraph, January 17, 1932

—Jawaharlal Nehru and the capitalist class, 1936. Economic and Political Weekly, August, 1932

Chand, Tara —History of Freedom Movement in India

Chatterjee, A. C. —India's Struggle for Freedom

Dasgupta, Hemendranath —Subhaschandra

Edwards, Michael —Nehru, a pictorial biography

—Last days of British India

Ghose, Sankar —Socialism and Communism in India

Gordon, Leonard —Brothers against the Raj—Subhas and Sarat Chandra Bose

—Bengal : the Nationalist Movement

Gopal, S. —Jawaharlal Nehru Vol. I

Guha, Samar —Netaji Dead or Alive

—The Mahatma and the Netaji-, two men of India's destiny

Hassan, S. —The Complex Nehru

Hough, Richard —Mountbatten; Hero of our Time

—Edwina, Countess Mountbatten of Burma

Iyer, Raghavan, Editor —The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi Vols. I and II

Jog, N. G. —In Freedom's Quest—a biography of Netaji Subhas Chandra Bose

Kripalani, J. B. —Indian National Congress—the resolutions passed by the Congress, All India Congress Committee and the Working Committee between February, 1938 and January, 1939

Lanshey, David M. —Bengal Terrorism and the Marxist Left

Mahajan, Sucheta —I.N.A. Trials Galvanize Nation (100 years of Congress) The Telegraph, January 31, 1939

Mazumdar, S. K. —Evolution of Netaji

Mazumdar, R. C. —History of Modern Bengal Vol. II

Mazumdar, R. C., Editor	—The History and Culture of Indian People Vol. XI (Struggle for Freedom)
Mitra, Aditya B.	—The Poet and his Prince. Times of India, November 11, 1939
Moraes, Frank	—Jawaharlal Nehru
Mookerjee, Girija K.	Europe at War (1938-46) : Impressions of War, Netaji and Europe
Mukerjee, Hiren	—The Gentle Colossus —A Bow of Burning Gold —Gandhi : a study
Mukherjee, Nanda	—Netaji through German Lens
Nanda, B. R.	—Nehru's Autobiography. Times of India, November 14-15, 1986
Nanda, B. R. and others	—Gandhi and Nehru
Norman, Dorothy	—Nehru : the First Sixty Years
Patil, V. T., Editor	—Studies on Nehru
Ray, Nishith Ranjan and others, editors	—Challenge—a Saga of India's Struggle for Freedom.
Roy, Dilip Kumar	Netaji the Man—Reminiscences
Sitaramyya, Pattabhi	History of the Indian National Congress
Tendulkar, D. G.	Mahatma
Toye, Hugh	The Springing Tiger—a study of Subhas Chandra Bose
Zaidi, A.	A study of Statecraft in India —a study of the political resolutions of Indian National Congress in its 100 years

অনিল রায়	—নেতাজির জীবনবাদ
অমিতাভ চৌধুরী	—ক্ষমাপ্রার্থী রবীন্দ্রনাথ
কালীপদ সরকার	—ইতিহাসপুরুষ নেতাজি
কৃষ্ণা বসু	—চরণরেখা তব
নন্দ মুখোপাধ্যায়	—সুভাষচন্দ্র ও ব্রিটিশরাজ
নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী	—নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ
নেপাল মজুমদার	—রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র
পবিত্রকুমার ঘোষ	—সুভাষচন্দ্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—কালান্তর
শংকরীপ্রসাদ বসু	—সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং
শিশিরকুমার বসু	—বসুবাড়ি
শৈলেশ দে	—আমি সুভাষ বলছি
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	—সুভাষচন্দ্র ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র
সুব্রত গুপ্ত	—সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তা

———